কোন পথে

প্রথম খণ্ড

১৯৫৬

হরিপুরা অভিভাষণ

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনে প্রদত্ত মূল সভাপতির বা প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ।

সভাপতি মহাশয় এবং বন্ধুগণ,

আগামী বৎসরের জন্য আমাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত করে যে সম্মান আমাকে অর্পণ করেছেন আমি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। এই বিপুল সম্মান-লাভের কোন যোগ্যতা আমার আছে, মুহূর্তের জন্যও এমন চিন্তা করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি মনে করি এই সম্মান আপনাদের মহত্ত্বের নিদর্শন এবং দেশের তরুণ সমাজের কাছে আপনাদের শ্রদ্ধার্ঘ; আমাদের জাতীয় সংগ্রামে তাঁদের দীর্ঘসঞ্চিত অবদান না থাকলে আজ আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে থাকতাম না। শঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আমি এই মঞ্চে আরোহণ করছি, যে-মঞ্চ, এর আগে, আমাদের জন্মভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা অলংকৃত করে গেছেন। আমি জানি আমার অক্ষমতা অসংখ্য, তাই আমি শুধু এইমাত্র আশা ও প্রার্থনা করি, যে উচ্চ আসনে আপনারা আমাকে আহ্বান করেছেন, আপনাদের সহানুভূতি ও সমর্থন সম্বল করে আমি যেন সামান্য মাত্রায়ও সেই আসনের প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হই।

প্রারম্ভে, শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহরু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে আমাদের গভীর মর্ম-বেদনার উল্লেখ করে আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করার অনুমতি চাইছি। শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহরু আমাদের কাছে কেবলমাত্র পণ্ডিত

মতিলালের সুযোগ্যা সহধর্মিণী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শ্রদ্ধেয়া জননীই ছিলেন না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর যে নিগ্রহ, স্বার্থত্যাগ ও সেবা তাতে যে-কোন ব্যক্তি গর্ববোধ করতে পারেন। স্বদেশবাসী হিসেবে আমরা তাঁর মৃত্যুতে শোকার্ত। পণ্ডিত নেহরুকে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের আর সকলকে আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জানাই।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে ভারত চিরদিন ঋণী থাকবে। তিনিই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান জগতে ভারতের জন্য সম্মানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মনেপ্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী আচার্য জগদীশ তাঁর জীবন শুধু বিজ্ঞানের সেবাতেই নয়, ভারতের সেবায়ও উৎসর্গ করেছিলেন। ভারত তা জানে এবং সেইজন্য কৃতজ্ঞও। লেডি বসুকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে ভারত তার সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম একটি তারকাকে হারাল। বহু বৎসর ধরে বাংলার ঘরে ঘরে সুবিদিত তাঁর নাম ভারতের সাহিত্য জগতেও ক[illegible] পরিচিত ছিল না। কিন্তু শরৎবাবু সাহিত্যিক হিসেবে যদি বড় হ[illegible] থাকেন, বোধ হয় দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি ছিলেন আরও ব[illegible] তাঁর মৃত্যুতে বাংলার কংগ্রেস আজ নিঃসন্দেহে দীনতর। আমরা [illegible] পরিবারের পরিজনদের কাছে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

অন্য কিছু বলার আগে আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যাঁরা ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে গ[illegible] এক বৎসরের মধ্যে দেশের সেবায় জীবন বলি দিয়েছেন। বিশেষ করে আমি তাঁদের কথা বলতে চাই, যাঁরা বন্দিদশায় বা অন্তরীণ অবস্থায় অথবা অন্তরীণ অবস্থা থেকে সদ্য মুক্ত হয়ে মারা যান। ঢাকা সেনট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র মুন্সীর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। এই সেদিন প্রায়োপবেশনে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। আমার হৃদয় এখনও ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলার মত অবস্থা আমার নেই। আমি কেবল আপনাদের ভেবে দেখতে বলব, যে-দেশে

যতীন দাস, সরদার মহাবীর সিং, রামকৃষ্ণ নামদাস, মোহিতমোহন মৈত্র, হরেন্দ্র মুন্সী ও তাঁদের মত প্রতিশ্রুতিভরা আনন্দোজ্জ্বল সন্তানদের জীবনের প্রতি আসক্তি নেই, যারা চায় জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে সে দেশে নিশ্চয় মারাত্মক কোন গলদ রয়ে গেছে।

মানব-ইতিহাসের চলমান বিশ্বপটের দিকে একবার তাকালে প্রথমেই আমাদের নজরে পড়ে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্ত্যে সাম্রাজ্যগুলি অনিবার্যভাবে এক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছিয়েছে, তারপরে ধীরে ধীরে নগণ্য অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, হয়তো বা কখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। এই নিয়মের জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত প্রাচীন যুগের রোমক সাম্রাজ্য এবং আধুনিক কালের তুর্কী ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য। ভারতের সাম্রাজ্যগুলিও—যেমন মৌর্য, গুপ্ত, মোগল সাম্রাজ্য— এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাসের এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কার এমন দুঃসাহস যে বলতে পারে, বিধির বিধান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নপ্রকার হবে? ওই সাম্রাজ্য আজ ইতিহাসের এক পথসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছে। হয় তাকে অন্যান্য সাম্রাজ্যের পথে বিদায় নিতে হবে, নয়তো স্বাধীন জাতিপুঞ্জের এক যুক্তরাষ্ট্রে তাকে রূপান্তরিত হতে হবে। দুদিকই তার কাছে খোলা আছে। জার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ১৯১৭ সালে, কিন্তু তারই ভগ্নস্তূপ থেকে জেগে ওঠে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন। রুশ ইতিহাস থেকে গ্রেট ব্রিটেনের এখনও শিক্ষা নেবার সময় আছে। সেই শিক্ষা কি তারা নেবে?

রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিজাতীয় এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এ এক বিচিত্র সমবায়, এর মধ্যে আছে স্বায়ত্তশাসিত দেশ, আছে আংশিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ও স্বৈরশাসিত উপনিবেশ। শাসনতান্ত্রিক কারসাজি ও মানুষের কূটবুদ্ধি এই জোড়াতালিকে কিছুকাল টিকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু চিরদিন পারবে না। আভ্যন্তরিক অসঙ্গতিগুলোকে সময় থাকতে যদি দূর করা না হয়, তাহলে বাইরে

থেকে চাপ না এলেও নিজেরই দুঃসহ চাপে এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু নির্ভীক নিশ্চিত এক পদক্ষেপে স্বাধীন জাতি-পুঞ্জের এক যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে কি সম্ভব ? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব ব্রিটিশ জনগণের। একটা কথা কিন্তু ঠিক। এই রূপান্তর একমাত্র তখনই সম্ভব যদি ব্রিটিশ জনগণ তাদের স্বদেশে স্বাধীন হয়—যদি গ্রেট ব্রিটেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়। গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীদের সঙ্গে বাইরের উপনিবেশগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়ে গেছে। লেনিন অনেক আগে বলে গেছেন, "কয়েকটি জাতির দাসত্ব গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করছে।" ব্রিটেনের অভিজাত ও বুর্জোয়াশ্রেণী যে টিকে আছে তার প্রধান কারণ শোষণ করার জন্য উপনিবেশগুলি ও সাগর পারের অধীনস্থ রাজ্যগুলি রয়েছে। নিঃসন্দেহে এদের মুক্তি গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানবে এবং তার পরিণতিতে সেদেশে কায়েম হবে সমাজতন্ত্রী সরকার। অতএব এ বিষয়ে যেন ধারণা স্পষ্ট থাকে যে, ঔপনিবেশিকতা বিলুপ্ত না হলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৌছনো অসম্ভব, এবং আমরা, যারা ভারতের সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়ত্তাধীন অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, পরোক্ষ-ভাবে আমরা ব্রিটিশ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যেও সংগ্রাম করে চলেছি।

সাম্রাজ্য মাত্রই যে 'বিভেদ ও শাসন' নীতির উপর নির্ভর করে—এ সত্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় গ্রেট ব্রিটেনের মত এমন দক্ষতার সঙ্গে, এমন নিয়মিতভাবে ও কঠোর হাতে আর কোন সাম্রাজ্য এই নীতি অনুসরণ করেছে কিনা। এই নীতি অনুযায়ী আইরিশ জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে আলস্টারকে অবশিষ্ট আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে প্যালেস্টিনিয়ানদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে আরবদের থেকে ইহুদীদের পৃথক করে দেওয়া হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরকে

অকার্যকর করার জন্য আভ্যন্তরিক বিভাগটা প্রয়োজন। এই বিভাজন নীতিই ভিন্নরূপে নতুন ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখা যাচ্ছে। এখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং প্রতিটি সম্প্রদায়কে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখার প্রয়াস। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একই সঙ্গে অবস্থান করছে স্বৈরতান্ত্রিক রাজন্যবর্গ এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা। নতুন শাসনতন্ত্র যদি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়, তা ব্রিটিশ ভারতের বিরোধিতার ফলেই হোক কিংবা রাজন্যবর্গের যোগদানে অসম্মতির দরুনই হোক, আমার কিন্তু সন্দেহ নেই, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ কূটবুদ্ধি ভারত বিভাগ করতে এবং এই উপায়ে ভারতবাসীর কাছে হস্তান্তরিত ক্ষমতা অকার্যকর করতে শাসনতান্ত্রিক অন্য কোন কৌশল আবিষ্কার করবেই। অতএব হোয়াইটহলের ছাপ মারা ভারতের যে কোন শাসনতন্ত্রকে যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

'বিভেদ ও শাসন' নীতির আপাত কিছু সুবিধা থাকলেও শাসকশক্তির কাছে কোনক্রমেই তা অবিমিশ্র সুখের হেতু হয় না। বস্তুতঃপক্ষে তা নতুন নতুন সমস্যা ও বিভ্রাট সৃষ্টি করে। মনে হয় গ্রেট ব্রিটেন তার 'বিভেদ ও শাসন' নীতি-সঞ্জাত রাজনৈতিক দ্বৈততার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। তা কি ভারতের মুসলমানদের খুশী রাখবে, না, হিন্দুদের? তা কি প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের, না, আরবদের অনুগৃহীত করবে?—ইরাকের আরবদের, না, কুর্দদের? তা কি মিশরের ওয়াফদ্‌-এর পক্ষ নেবে, না, রাজাকে সমর্থন করবে? সাম্রাজ্যের বাইরেও একই দ্বৈতনীতি লক্ষণীয়। স্পেনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ফ্রাঙ্কো ও আইনসঙ্গত সরকার, এই দুইয়ের মধ্যে কাকে সমর্থন করবে তাই নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। অনুরূপভাবে ইওরোপীয় রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। ব্রিটেনের পররাষ্ট্র নীতিতে এই যে বিরোধ ও অসঙ্গতি তা তার সাম্রাজ্যের বিষম গঠনের প্রত্যক্ষ পরিণাম। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ইহুদীদের

খুশী না করে পারে না, যেহেতু ইহুদীদের আর্থিক প্রতিপত্তিকে অগ্রাহ্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। অপরপক্ষে ইণ্ডিয়া অফিস ও পররাষ্ট্র দপ্তর আরবদের হাতে রাখতে চায়, তার কারণ নিকট-প্রাচ্যে ও ভারতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ। এই ধরনের বিরোধ ও অসঙ্গতির হাত থেকে গ্রেট ব্রিটেন একটিমাত্র উপায়ে পরিত্রাণ পেতে পারে, সেই উপায়—তার সাম্রাজ্যকে স্বাধীন জাতিপুঞ্জের যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। যদি তারা তা করতে পারে তাহলে ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক দৃষ্টান্ত রেখে যাবে। যদি অপারগ হয়, তাহলে তাদের মেনে নিতে হবে, যে-বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে একে একে খসে পড়বে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পরিণামের কথা ব্রিটিশ জনগণ যেন ভুলে না যায়।

বর্তমান মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কয়েকটি স্থানে বেশিরকম চাপ পড়ছে। সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যে পশ্চিমপ্রান্তে আছে আয়ার্ল্যাণ্ড এবং পূর্বপ্রান্তে ভারত। পাশাপাশি দেশ ইরাক ও মিশরকে নিয়ে মধ্যে রয়েছে প্যালেস্টাইন। সাম্রাজ্যের বাইরে ইটালি চাপ দিয়ে চলেছে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এবং জাপান দূর প্রাচ্যে। এই দুটো দেশই আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গীভাবাপন্ন। এই অস্থির পটভূমিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েত রাশিয়া, যার নিছক অস্তিত্ব প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কতদিন চারদিকের এই সম্মিলিত চাপ ও টানাটানি সইতে পারবে ?

নিজেকে "সাতসাগরের রানী" বলার মত অবস্থা ব্রিটেনের আজ নেই বললেই হয়। আঠারো ও উনিশ শতকে তার অত্যাশ্চর্য উন্নতি তার নৌশক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বিশ শতকে যদি তার সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে তবে তা ঘটবে বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন এক শক্তির আবির্ভাবের ফলে, তা বিমানবল। এই নব্যশক্তি, এই বিমানবল ছিল বলে উদ্ধত ইটালি ভূমধ্যসাগরে সুসজ্জিত ব্রিটিশ নৌবহরকে সাফল্যের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিল। স্থলে, জলে, আকাশে

ব্রিটেন তার সাধ্যমত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে পারে, আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে যুদ্ধজাহাজ এখনও টিকে যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে বিমানবলের স্থায়িত্বকে মেনে নিতেই হবে। দূরত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, এবং আত্মরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার বিমান-বিধ্বংসী ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইওরোপীয় মহাদেশের যে কোন স্থান থেকে লণ্ডনের উপর বোমা নিক্ষেপ করে যাওয়া যে কোন বোমারু-বহরের ইচ্ছাসাপেক্ষ। এককথায়, বিমানবল আধুনিক রণকৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, গ্রেট ব্রিটেনের বিচ্ছিন্নতা লোপ করেছে এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের দারুণ বিপর্যয় ঘটিয়েছে। বিশাল সাম্রাজ্যের গোড়াকার গলদ আজ যেমন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এর আগে কখনও তেমন দেখা দেয়নি।

বিশ্বশক্তিগুলির পারস্পরিক এই ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ভারত আগের থেকে বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ৩৫ কোটি লোকের বাসভূমি আমাদের এই দেশ বিরাট দেশ। আয়তনে ও জনসংখ্যায় আমাদের বিশালত্ব এতদিন পর্যন্ত আমাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ ছিল। আজ তাই আমাদের শক্তির উৎস, শুধু যদি আমরা মিলিত হয়ে সাহসে ভর করে আমাদের শাসকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। ভারতের ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যে বিভাগ তা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম। ভারত এক এবং ব্রিটিশ ভারতের ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাও একই প্রকার। আমাদের লক্ষ্য স্বাধীন ভারত, এবং আমার মতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো যেতে পারে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় যে প্রজাতন্ত্রের অংশীদার হবে। যাকে বলা হয় "ভারতীয়" ভারত, সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশীয় রাজ্যের প্রজারা যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস বারে বারে সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। হতে পারে, বর্তমান মুহূর্তে আমরা নানা ব্যাপার

নিয়ে এতই জড়িয়ে আছি যে, রাজ্যগুলিতে আমাদের স্বদেশবাসীদের জন্য কংগ্রেস বেশী কিছু করে উঠতে পারছে না। কিন্তু আজও ব্যক্তিগতভাবে কোন কংগ্রেস সভ্য যদি দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আদর্শকে সক্রিয় সমর্থন জানান এবং তাদের সংগ্রামে যোগ দেন, তাঁকে বাধা দেবার মত কিছু নেই। কংগ্রেসের মধ্যে আমার মত এমন অনেকেই আছেন যাঁরা চান কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলনে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক। ব্যক্তিগতভাবে আমি আশা করি, দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাঁরা আমাদের সহযোদ্ধা রয়েছেন তাঁদের সাহায্যের জন্য অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এগিয়ে আসা সম্ভব হবে। আমরা যেন না ভুলি আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি তাঁদের একান্ত প্রযোজন।

ভারতের ঐক্য প্রসঙ্গে এর পরেই যে সমস্যার কথা আসে তা সংখ্যালঘু সমস্যা। এই প্রশ্নে কংগ্রেস মাঝে মাঝে তার নীতি ঘোষণা করেছে। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা থেকে একেবারে সাম্প্রতিক ও প্রামাণিক ঘোষণা প্রচার করা হয়। ঘোষণাটি এইরূপ :

> ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে কংগ্রেস যথেষ্ট গুরুত্বের সহিত বারে বারে তাহার নীতি ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই সকল অধিকার রক্ষা করা এবং এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে এবং জাতির রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্পুর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য সম্ভবমত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করা কংগ্রেস তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত, যে ভারতে কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী বা সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের স্বার্থে অপরকে শোষণ করিবে না, এবং যেখানে ভারতীয় জনগণের সামগ্রিক মঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য জাতির সকলে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করিবে। সার্বজনিক স্বাধীনতায়

ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার এই লক্ষ্য কোনমতেই ভারতীয় জীবনচর্যায় বহুল বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক রূপভেদের অবদমন বুঝাইবে না। যাহাতে প্রতিটি ব্যক্তি তথা প্রতিটি গোষ্ঠী তাহার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী অবাধে বিকাশ লাভের সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইতে পারে সেইজন্য ওই বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক রূপভেদ রক্ষা করিতেই হইবে।

এই বিষয়ে যেহেতু কংগ্রেসের নীতিকে অপব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই নীতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কংগ্রেস তাহার মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে ঃ

(১) ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার, স্বাধীনভাবে সংঘবদ্ধ হইবার ও সমবায় গঠনের এবং আইন ও নীতিবিরুদ্ধ নয় এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইবার অধিকার থাকিবে ;

(২) প্রত্যেক নাগরিকের বিবেকের স্বাধীনতা থাকিবে, এবং সাধারণ শৃঙ্খলা ও সুনীতি সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে তাহার নিজস্ব ধর্ম প্রচার ও পালন করিবার অধিকার থাকিবে ;

(৩) বিভিন্ন ভাষাঞ্চলের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি সংরক্ষিত থাকিবে ;

(৪) ধর্ম, জাতি, বিশ্বাসনিরপেক্ষ এবং নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া গণ্য হইবে ;

(৫) ধর্ম, জাতি, বিশ্বাস বা নারী-পুরুষভেদের দরুন সরকারী কোন চাকুরিতে, সম্মান বা ক্ষমতান্বিত কোন পদে এবং কোন ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসরণে কোন নাগরিক অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(৬) জনসাধারণের ব্যবহারার্থে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক উৎসর্গীকৃত অথবা রাজ্য হইতে বা স্থানিক কোন তহবিল হইতে পরিপোষিত কোন কূপ, পুষ্করিণী, রাস্তা, বিদ্যালয় এবং সাধারণের গমনাগমনের স্থানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে ;

(৭) রাষ্ট্র সকল ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবে ;

(৮) সার্বজনিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট গ্রহণ করা হইবে ;

(৯) প্রত্যেক নাগরিক ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতে, তাহার যে কোন অংশে থাকিতে বা বসবাস করিতে, সম্পত্তি অর্জন করিতে এবং যে কোন ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিবে এবং ভারতের সকল অংশে ফৌজদারি মামলার ব্যাপারে এবং আইনের আশ্রয়ের প্রশ্নে প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি সমান আচরণ করা হইবে।

মৌলিক অধিকারের এই প্রকরণগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবেক, ধর্ম কিংবা সংস্কৃতির ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ সমুচিত হইবে না, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে কেহ তাহার ব্যক্তিগত আইনকে বজায় রাখিতে পারিবে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সেই বিষয়ে কোন পরিবর্তন আরোপ করিতে পারিবে না।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিষয়ে কংগ্রেসের বক্তব্য পর পর অনেক প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে এবং চূড়ান্তভাবে ব্যক্ত হইয়াছে গত বৎসরে প্রচারিত নির্বাচনী ইস্তাহারে। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিরোধী যেহেতু তাহা জাতীয়তাবিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী এবং ভারতের স্বাধীনতার ও ভারতীয় একতার বিকাশে প্রতিবন্ধক। এতৎসত্ত্বেও কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন কিংবা তাহা লঙ্ঘন কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট

পক্ষদের সম্মতি লইয়াই করিতে হইবে। পারস্পরিক মতৈক্য দ্বারা এইপ্রকার পরিবর্তন সাধনের যে কোন সুযোগকে কংগ্রেস সর্বদা স্বাগত জানাইয়াছে এবং তাহা গ্রহণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে।

ভারতের সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা ও উন্নতিসাধনের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য সার্বজনিক এক উদ্যোগে তাহাদের সহযোগিতায় ও শুভেচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইতে চায়।

এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য নবোদ্যমে চেষ্টা করার উপযুক্ত সময় এসেছে। আমার বিশ্বাস আমি সকল কংগ্রেস সদস্যের মনের ভাব প্রকাশ করছি, যদি এ কথা বলি যে, জাতীয়তাবাদের মৌলিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বসম্মত একটি সমাধানে পৌছতে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে আগ্রহী। কোন্ কোন্ প্রণালীতে সমাধান করা উচিত হবে সে সম্পর্কে আমার বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আগেকার কনফারেন্সগুলিতে এবং আলাপ-আলোচনায় প্রয়োজনীয় অনেক দিক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। আমি শুধু এইটুকু যোগ করতে চাই যে, অর্থনীতিতে বা রাজনীতিতে আমাদের যা সাধারণ স্বার্থ কেবলমাত্র তার উপর জোর দিয়েই আমরা সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধকে এড়িয়ে যেতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ধর্মীয় ব্যাপারে 'বাঁচো ও বাঁচতে দাও' নীতি গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে একটা বোঝা-পড়ায় আসা। যখনই আমরা সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করি, তখন, যদিও মুসলমানদের সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দেয় এবং এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব, তবুও আমাকে এ কথা বলতেই হবে যে, অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি বিশেষতঃ তথাকথিত যে সব অনুন্নত শ্রেণী সংখ্যায় অত্যন্ত বিরাট, তাদের প্রতিও সুবিচার করতে কংগ্রেস সমানভাবে আগ্রহী। ভারতে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকে আমি

নিস্পৃহভাবে বিবেচনা করে দেখতে বলছি, কংগ্রেসের কর্মসূচীকে কার্যকর করা হলে তাঁদের আশঙ্কার কোন কারণ থাকবে কিনা। সমগ্র-ভাবে ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্যই কংগ্রেস। যদি কংগ্রেস তার কর্মসূচী রূপায়িত করতে পারে, ভারতীয় জনগণের যে কোন অংশের মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও উপকৃত হবে। এর উপরে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর যদি সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পুনর্গঠন চলে—তাই যে চলবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ—তাহলে যারা "নেই" দলভুক্ত তারা "আছে" দল-ভুক্তদের ভাঙিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং ভারতের জন-সাধারণকে "নেই" শ্রেণীভুক্ত বলে ধরতে হবে। একটি প্রশ্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকতে পারে, তা ধর্ম এবং সংস্কৃতির সেই দিক যার ভিত্তি ধর্মের উপর। এই প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতি 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও'—বিবেক, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি, সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভাষাঞ্চলের জন্য সাংস্কৃতিক স্বয়ং-শাসনের নীতি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে মুসলমানদের তাই আশঙ্কার কোন কারণ নেই, অপরপক্ষে তাদের লাভবান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীগুলি যে সব সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খলে পঙ্গু সেই সব শৃঙ্খল মোচন করতে কংগ্রেস যে বিগত সতেরো বছর ধরে চেষ্টার ত্রুটি করেনি তা সুবিদিত, এবং আমার কোন সন্দেহ নেই, সেদিন সুদূর নয় যখন এই সব শৃঙ্খল অতীতের ঘটনা বলে পরিগণিত হবে।

আগামী দিনে কংগ্রেস কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে, সেই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামে তার কী ভূমিকা হবে সেই সম্পর্কে এখন আমি আলোচনা করতে চাই। আমি আগের থেকেও এখন আরও বেশি বিশ্বাস করি যে সেই পদ্ধতি হবে সত্যাগ্রহ অথবা ব্যাপকতম অর্থে অহিংস অসহযোগ, এবং তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইন অমান্য আন্দোলন। আমাদের পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না। সত্যাগ্রহ, আমি যতটা বুঝি, কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

নয়, তা সক্রিয় প্রতিরোধও, যদিও সেই সক্রিয়তাকে অবশ্যই অহিংস হতে হবে। আমার দেশবাসীকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন আছে যে, সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগের পন্থা আবার আমাদের নিতে হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা যেন মনে না করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপ নিছক নিয়মতান্ত্রিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে। জোর করে যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে দেওয়ার তীব্র বিরোধিতায় আমাদের আরেকটি বিরাট আইন অমান্য আন্দোলনে নামতে হতে পারে, এমন সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দুটি পন্থার যে কোন একটি নিতে হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত আমরা পূর্ণ স্বরাজ না পাই ততদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং লড়াই চলাকালে আমাদের হাতে যে ক্ষমতা আসবে তা ব্যবহার করতে রাজী না হওয়া। অপর পন্থা, পূর্ণ স্বরাজের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যেতে নিজেদের অবস্থা ক্রমে মজবুত করে তোলা। নীতির দিক থেকে উভয় পন্থাই সমান গ্রহণযোগ্য এবং আমাদের দিক থেকে এ ব্যাপারে আগে থেকে ভাবিত হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রত্যেক পর্যায়ে আমাদের সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে, আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে কোন্ পন্থা অধিকতর উপযোগী হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রগতির চরম লক্ষ্য হবে ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। যখন সেই বিচ্ছেদ ঘটবে এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের চিহ্নমাত্রও থাকবে না, তখনই আমরা সেই অবস্থায় আসব যখন উভয়পক্ষের স্বেচ্ছাকৃত এক মৈত্রীচুক্তি মারফত গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক আমরা নির্ণয় করতে পারব। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি রকম হবে বা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে এখনও কিছু বলার সময় হয়নি। তা খুব বেশিমাত্রায় নির্ভর করে ব্রিটিশ জনসাধারণের মনোভঙ্গির উপর। এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার মনোভাব আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্টের

মত আমিও বলতে চাই, ব্রিটিশ জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা লড়াই করছি গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে এবং তার সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কী হবে তা নির্ণয় করার পুরো স্বাধিকার আমরা চাই। কিন্তু একবার সত্যকার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পেলে, ব্রিটিশ জনগণের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক না হওয়ার কোন কারণ নেই।

আমার আশঙ্কা হয়, কংগ্রেসের অনেক সদস্যের কাছে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। আমি জানি এমন অনেক বন্ধু আছেন, যাঁরা মনে করেন, কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করলে পর, যেহেতু কংগ্রেস পার্টি তার লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে গিয়েছে সেইজন্য কংগ্রেস পার্টির টিকে থাকার আর প্রয়োজন নেই। এইপ্রকার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যে পার্টি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবে সেই পার্টিই যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করবে। ক্ষমতা যারা জয় করে আনতে পেরেছে একমাত্র তারাই সেই ক্ষমতার সমুচিত ব্যবহার করতে পারে। যদি এমন লোকদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়, যাদের সেই আসন জয় করায় কোনই অবদান নেই, বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কাজে যে শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও আদর্শবাদ অপরিহার্য তাদের মধ্যে সে সবের অভাব দেখা যাবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অত্যন্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কাজের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা গিয়েছে তার কারণও এই।

না, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস পার্টির অস্তিত্ব লোপ পাবে, এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। অপরপক্ষে, এই পার্টিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তার পুনর্গঠনের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। একমাত্র তখনই পার্টি তার ভূমিকা পুরোপুরি পালন করবে। যদি পার্টি জোর করে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে তাহলে মহা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যুদ্ধপরবর্তী ইওরোপের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কেবলমাত্র সেইসব

দেশই সুশৃঙ্খলভাবে অব্যাহত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছে যেখানে যে-পার্টি ক্ষমতা দখল করেছে সেই পার্টিই পুনর্গঠন-কাজ হাতে নিয়েছে।

আমি জানি, কথা উঠতে পারে, রাষ্ট্রের পিছনে এইরকম অবস্থার মধ্যে পার্টির অস্তিত্বকে বজায় রাখলে সেই রাষ্ট্র টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রে পরিণত হবে ; আমি কিন্তু এই অভিযোগ স্বীকার করি না। রাষ্ট্র একদলীয় তখনই হতে পারে যখন একটিমাত্র পার্টির অস্তিত্ব থাকে— যেমন রাশিয়া, জার্মানি বা ইটালিতে হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সব পার্টি কেন নিষিদ্ধ হবে তার কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া এই পার্টির নিজস্ব একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকবে, যার বিপরীত, বলা যেতে পারে, "একনায়ক নীতি"র উপর প্রতিষ্ঠিত নাৎসী পার্টি। ভবিষ্যৎ ভারতীয় রাষ্ট্রকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেবে না একাধিক রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেস পার্টির গণতান্ত্রিক ভিত্তি। তাছাড়া, নেতাদের যে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তাদের নিচে থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে, পার্টির গণতান্ত্রিক ভিত্তিই তা সুনিশ্চিত করবে।

যদিও পুনর্গঠনের বিশদ পরিকল্পনা পেশ করার সময় এখনও আসেনি, ভবিষ্যতে সামাজিক পুনর্গঠনে যে সকল নীতি অনুসৃত হবে তার কোন কোন নীতি নিয়ে আমরা আপাততঃ বিবেচনা করতে পারি। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূর করা সম্পর্কে, সেইসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক উপায়েই যে কার্যতঃ সমাধান করা যেতে পারে এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে পুনর্গঠনের ব্যাপক এক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা। এই পরিকল্পনার দুটি অংশ থাকবে—একটি অব্যবহিত কার্যসূচী এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী। প্রথম অংশটি তৈরি করার সময় তিনটি আশু লক্ষ্যের দিকে নজর রাখতে হবে—প্রথমতঃ দেশকে আত্ম-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা ; দ্বিতীয়তঃ ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা ; এবং

তৃতীয়তঃ স্থানিক ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষ্য দুটি পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। জাতি হিসেবে আমাদের যা কিছু রাজনৈতিক মনীষা বা প্রতিভা, এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনে তার প্রয়োগ করতে হবে। দেশকে আমাদের একতাবদ্ধ করতে হবে যাতে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করে ভারত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার মারফত দেশকে একতাবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশগুলি, সেইসঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে সেজন্য সাংস্কৃতিক ও সরকারী ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে। বিদেশী আধিপত্যের বোঝা যখন অপসারিত হবে, তখন আমাদের জনগণকে একসঙ্গে ধরে রাখার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার দরকার হবে, কারণ বিজাতীয় শাসন আমাদের কিছু পরিমাণে নীতিচ্যুত ও বিশৃঙ্খল করেছে। জাতীয় একতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাষা ও একটি লিপি গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া এরোপ্লেন, টেলিফোন, রেডিও, ফিল্ম, টেলিভিশনের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করতে হবে, এইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এক সাধারণ নীতি অনুসরণ করে ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে একই মনোভাব আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের জাতীয় ভাষা প্রসঙ্গে আমার মনে হয় হিন্দী ও উর্দুর মধ্যে যে পার্থক্য তা নেহাতই কৃত্রিম। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক জাতীয় ভাষা হবে এই দুই ভাষার মিশ্রণ। বাস্তবিকপক্ষে দেশের ব্যাপক অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেই ভাষাই চলে, এবং এই সাধারণব্যবহার্য ভাষা নাগরি বা উর্দু যে কোন লিপিতে লেখা যেতে পারে। আমি জানি ভারতে এমন অনেকে আছেন যাঁরা এই লিপি দুটির একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণের পক্ষে উগ্র মত পোষণ করেন। আমাদের নীতি কিন্তু বর্জনের নীতি হবে না। দুই লিপির যে কোন লিপি ব্যবহার করতে আমরা

পুরোপুরি প্রশ্রয় দেব। একই সঙ্গে, আমার এ কথাও মনে হচ্ছে, এ সম্পর্কে শেষ সমাধান, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান এমন একপ্রকার লিপি গ্রহণের মধ্যে সম্ভব হবে যা আমাদের বাকি দুনিয়াব সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত করবে। হতে পারে, আমাদের কোন কোন দেশবাসী আতঙ্কে শিউরে উঠবেন যখন তাঁরা রোমান লিপি গ্রহণের কথা শুনবেন, কিন্তু আমি তাঁদের সানুনয়ে আবেদন করব, তাঁরা যেন সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করে দেখেন। যদি আমরা তা করি, আমরা তখনই বুঝতে পারব লিপিকে পরম পবিত্র বলে গণ্য করার মত কিছু নেই। যে নাগরি লিপিকে আমরা দেখছি তা বিবর্তনের বেশ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে আজ এই হয়েছে। তাছাড়া ভারতের প্রধান প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই নিজস্ব লিপি আছে। এর উপর উর্দু লিপি ব্যবহার করে থাকে ভারতের উর্দুভাষী জনসাধারণ এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মত প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা। এতরকম বিভিন্নতা আছে বলেই সারা ভারতের জন্য একই রকম লিপি স্থির করতে হলে তা করা উচিত পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে যাতে কোন রকম পক্ষপাত না থাকে। আমি স্বীকার করছি একসময়ে আমি ভাবতাম বিদেশী লিপি গ্রহণ করা হবে জাতীয়তাবিরোধী। কিন্তু ১৯৩৪ সালে তুরস্ক দেশে যাবার ফলে আমার মত বদলিয়ে যায়। তখন আমি প্রথম বুঝতে পারলাম বাকি দুনিয়া যে লিপি নিয়েছে সেই লিপি গ্রহণ করায় কি দারুণ সুবিধা। আমাদের দেশে জনসাধারণের দিক থেকে ভেবে দেখলে, যেহেতু শতকরা ৯০ ভাগের বেশি নিরক্ষর এবং কোন লিপির সঙ্গেই তাদের পরিচয় নেই, তাদের শিক্ষিত করার সময় কোন লিপি আমরা প্রবর্তন করি তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। এ ছাড়াও রোমান লিপি জানা থাকলে ইওরোপীয় ভাষা শেখা তাদের পক্ষে সহজ হবে। আমার দেশে রোমান লিপি এখনই চালাতে গেলে জনমত কী পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হবে সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন। তা সত্ত্বেও আমার দেশবাসীর কাছে

আমার নিবেদন, শেষ পর্যন্ত যে সমাধান সব দিক থেকে বিজ্ঞজনোচিত, সে সম্পর্কে তাঁরা যেন বিচার করে দেখেন।

স্বাধীন ভারতের দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী সম্পর্কে প্রথম যে সমস্যা নিয়ে বোঝাপড়া দরকার তা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। ভারতের জনসংখ্যা অত্যধিক কি না তত্ত্বগত এই প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে-দেশের সর্বত্র দারিদ্র্য, অনাহার ও ব্যাধি সে-দেশে এক দশকে যদি জনসংখ্যা তিন কোটি বেড়ে যায় তাহলে আমাদের পক্ষে তা সামলানো সম্ভব নয়। জনসংখ্যা যদি দ্রুত হারে বাড়তে থাকে, কিছুকাল থেকে যা দেখা যাচ্ছে, তাহলে আমাদের যাবতীয় পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে পারে। অতএব যতদিন পর্যন্ত যারা বেঁচে আছে তাদের খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা যোগান দিতে না পারি ততদিন আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই সমুচিত। আপাততঃ জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেবার আবশ্যকতা নেই, তবুও আমার অনুরোধ এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি যেন আকর্ষণ করা হয়।

পুনর্গঠন বিষয়ে আমাদের প্রধান সমস্যা হবে দেশ থেকে কিভাবে দারিদ্র্য দূর করা যায়। তার জন্য ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার, সেই-সঙ্গে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ আবশ্যক। কৃষিঋণিতার অবসান দরকার এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য সস্তায় ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদক ও ক্রেতাদের সুবিধার জন্য সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ভূমিজাত উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কৃষিপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির উন্নতিসাধনই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য। দেশে বিজাতীয় শাসন এবং বিদেশে ব্যাপক হারে শিল্পোৎপাদনের ফলে প্রাচীন যে শিল্পব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে তার স্থলে নতুন এক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্ল্যানিং

কমিশনকে সযত্নে বিবেচনা করে স্থির করতে হবে, আধুনিক কলকারখানার প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও কোন্ কোন্ কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বৃহৎ উৎপাদন-শিল্পকে উৎসাহদান করা উচিত। আধুনিক শিল্পায়নকে আমরা যতই না কেন অপছন্দ করি এবং সেই সূত্রে যে সব কুফল দেখা দেয় তার নিন্দা করি, আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা আর শিল্পপূর্ব যুগে ফিরে যেতে পারব না। অতএব আমাদের পক্ষে শিল্পযোজন মেনে নেওয়াই ভাল, অবশ্য দেখতে হবে যাতে তার কুফল কমিয়ে আনা যায়। কলকারখানার অনিবার্য প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে সব কুটীর শিল্পের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব, তাদের যাতে বাঁচিয়ে তোলা যায়, একই সঙ্গে সেই দিকেও প্রযাস চালাতে হবে। ভারতের মত দেশে কুটীর শিল্পের অফুরন্ত ক্ষেত্র পড়ে রযেছে, বিশেষতঃ যে সব শিল্পের সঙ্গে কৃষির যোগ আছে —যেমন চরকা ও তাঁত।

পরিশেষে প্ল্যানিং কমিশনের উপদেশ অনুযায়ী উৎপাদন ও উপযোজনের ক্ষেত্রে সমগ্র কৃষি ও শিল্পব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সমাজীকরণের জন্য সর্বাত্মক এক পরিকল্পনা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে হবে, তা আভ্যন্তরীণ বা বাহিরিক ঋণ মারফত হোক কিংবা মুদ্রাস্ফীতি দ্বারাই হোক।

শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশকে বাধা দেওয়া বা বিরোধিতা করা এখন প্রায় অসম্ভব, যেহেতু কংগ্রেস পার্টি এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে সরকারী দাযিত্ব গ্রহণ করেছে। এর ফলে এখন একমাত্র যা সম্ভব তা হল, কংগ্রেসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং শক্তিশালী করা। আমি তাদের একজন যারা কংগ্রেসের সরকার গঠনের সপক্ষে ছিল না, তার কারণ এই নয় যে তা মূলতঃ অন্যায়। এও নয় যে, এই নীতির ফলে ভাল কিছুই হবে না, তার কারণ ছিল এই আশঙ্কা যে, সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের কুফল তার সুফলকে ছাড়িয়ে যাবে। আজ আমি কেবল এইটুকু আশা করতে পারি যে আমার আশঙ্কা যেন অমূলক হয়।*

আমাদের মন্ত্রীরা যখন সরকারী ক্ষমতায় রয়েছেন তখন আমাদের পক্ষে কি করে কংগ্রেসকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা সম্ভব? প্রথম কর্তব্য হবে আমলাতন্ত্রের গঠন ও চরিত্রকে বদলানো। এ কাজ যদি না করা হয় তাহলে কংগ্রেস পার্টির বরাতে অনেক দুঃখ আছে। প্রত্যেক দেশেই মন্ত্রীরা আসে যায় কিন্তু স্থায়ী চাকরির লৌহ-কাঠামো রয়ে যায়। যদি আমলাতন্ত্রের গঠন ও চরিত্রকে বদলানো না যায় তাহলে সরকার-গঠনকারী পার্টি এবং তাদের মন্ত্রিসভা তাদের নীতি কার্যকর করতে গিয়ে সম্ভবতঃ ব্যর্থই হবে। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টির ক্ষেত্রে এমনই ঘটেছিল এবং সম্ভবতঃ ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে লেবার পার্টির ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। যে কোন দেশে আমলাতন্ত্রের স্থায়ী চাকুরিয়ারাই সত্যকার শাসন চালিয়ে যায়। ভারতে এইসব চাকরি ব্রিটিশের সৃষ্টি এবং উচ্চপদগুলি প্রধানতঃ ব্রিটিশরাই অধিকার করে রেখেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব না ভারতীয়, না জাতীয় এবং যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব জাতীয় না হচ্ছে ততদিন জাতীয় নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না। অবশ্য এ বিষয়ে মুশকিল আছে। স্থায়ী চাকরির মধ্যে উচ্চতর পদগুলি আইনবলে সরাসরি ভারত-সচিবের (সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) অধীনে, তাদের উপরে প্রাদেশিক সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। এই অবস্থায় এইসব পদের গঠন পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রদেশে অধিষ্ঠিত থাকাকালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদকবর্জন, কারাসংস্কার, সেচব্যবস্থা, শিল্প, ভূমিসংস্কার, শ্রমিক-কল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা প্রবর্তন করবেন, এইটিই কাম্য। এই বিষয়ে যথাসাধ্য প্রয়াস করতে হবে যাতে সারা ভারতের ক্ষেত্রে একটিমাত্র নীতি অনুসরণ করা হয়। নীতিগত এই সমতা দুটি উপায়ের যে কোন একটির দ্বারা সম্ভব। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজেরাই এক জায়গায় এসে জড়ো হয়ে—যেমন ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে কলকাতায় শ্রমমন্ত্রীরা জড়ো হয়েছিলেন—সর্বসম্মত

এক কার্যসূচী প্রণয়ন করতে পারেন। এ ছাড়াও কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, তার নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যেমন যেমন পরামর্শ পাবে তার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত প্রাদেশিক সরকারগুলির বিভিন্ন বিভাগগুলিকে যথোচিত নির্দেশ দিয়েও সাহায্য করতে পারে। এর ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা জানতে পারবেন প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস সরকার কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁরা প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তা কাম্য নয়। যেটুকু প্রয়োজন তা এই যে, তাঁরা যেন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকেন যাতে মোটামুটি নীতিগুলি তাঁরা স্থির করে দিতে পারেন। এই বিষয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এতদিন পর্যন্ত যা করে এসেছে তার থেকে অনেক বেশি কিছু করতে পারে, এবং যদি তা না পারে, আমি বুঝি না কি করে এই সংস্থা বিভিন্ন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে।

এখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আমি আরও কিছু বলতে চাই। আমার বিবেচনায় এই কমিটি জাতীয় মুক্তি যোদ্ধা-বাহিনীর কেবল চালকশক্তিই নয়, তা স্বাধীন ভারতের ছায়া-মন্ত্রিসভাও বটে এবং সেইভাবেই তার কাজ করে যাওয়া উচিত। এ কথা আমার নিজের মনগড়া নয়। অন্যান্য দেশে অনুরূপ যে সব সংস্থা জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে তাদের জন্যও এই ভূমিকা ধার্য হয়েছে। আমি তাদের একজন যারা স্বাধীন ভারতকে সামনে রেখে চিন্তা করে, যারা আমাদের জীবনের সীমিত স্বল্পায়ুর মধ্যেই দেশে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দেখে যাবার আশা করে। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি যাতে স্বাধীন ভারতের ছায়া-মন্ত্রিসভা হিসেবে কাজ করে এবং সেই দায়িত্ব বোধ করে সেইজন্য আবেদন করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার প্রজাতন্ত্রী সরকারও এমনই করেছিল যখন তা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যেতে পিছু হটছিল। সরকারে অধিষ্ঠিত হবার আগে মিশরের

ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির এক্সিকিউটিভ্‌ও এইভাবেই চলেছিল। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতে যেতে সেই সব সমস্যা নিয়ে অনুরূপভাবে এখন থেকেই অবহিত হতে হবে, যে সব সমস্যা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলে দেখা দিতে পারে।

কংগ্রেস সরকারগুলির ঠিকমত কাজ চালিয়ে যাবার প্রশ্ন থেকে আপাততঃ অনেক গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত অংশের প্রবর্তনকে কি করে বাধা দেওয়া যায় সেই সমস্যা। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে কংগ্রেসের যা মনোভাব তা ১৯৩৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সাবজেক্টস কমিটি কর্তৃক সেই প্রস্তাব বিবেচিত হবার পর প্রস্তাবটিকে এই কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত করা হবে।

প্রস্তাবটিতে বলা আছে :

কংগ্রেস নতুন শাসনতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যে, জনসাধারণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ভারতের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি কেবলমাত্র স্বাধীনতাই হইতে পারে এবং তাহা বৈদেশিক শক্তির বিনা হস্তক্ষেপে কন্‌স্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্‌ব্লির সহায়তায় কেবলমাত্র জনগণই রচনা করিতে পারে। প্রত্যাখ্যানের এই নীতিকে স্বীকার করিয়াও কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি প্রদান করিয়াছে যাহাতে তদ্দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিকে শক্তিশালী করা যায়। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাময়িকভাবে বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও এইপ্রকার কোন বিবেচনার কথা উঠে না, এবং এই যুক্তরাষ্ট্র আরোপ করা হইলে তাহা ভারতের সমূহ ক্ষতিসাধন করিবে এবং সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের অধীনে যে বন্ধনে ভারত আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা দৃঢ়তর হইবে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সরকারের অপরিহার্য কর্মাধিকারকে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্র হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার বিরোধী নয় কিন্তু দায়িত্বের প্রশ্ন বাদ দিলেও যথার্থ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয স্বাধীন অঙ্গরাজ্যদিগকে লইয়া, যাহারা কম-বেশি একই পবিমাণ স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং নিবাচন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ভোগ করে। যে সকল দেশীয় রাজ্য এই যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইবে, প্রতিনিধিমূলক সংস্থার প্রতিষ্ঠায়, দায়িত্বশীল সরকার গঠনে, নাগরিক স্বাধীনতার ব্যাপারে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় নির্বাচনের পদ্ধতিতে, এইসকল বিষয়ে তাহাদের প্রদেশগুলিকে অনুসরণ করা উচিত হইবে। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এখন যাহা চিন্তা করা হইতেছে তাহা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভেদের প্রবণতাকেই জাগাইযা তুলিবে এবং রাজ্যগুলিকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সংঘাতে লিপ্ত করিবে।

অতএব কংগ্রেস প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয কাঠামোর প্রতি তাহার ধিক্কার পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছে এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সেইসঙ্গে প্রাদেশিক সরকার ও মন্ত্রিমণ্ডলীকে ইহার প্রবর্তন প্রতিহত করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

জনসাধারণের বিঘোষিত অভিপ্রায় সত্ত্বেও ইহা চাপাইয়া দিবার প্রচেষ্টা করা হইলে এইপ্রকার প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করা হইবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি ও মন্ত্রিসভাগুলি তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে অবশ্যই অস্বীকার করিবে।

এইপ্রকার অবস্থার উদ্ভব হইলে, এমতাবস্থায় কী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর অধিকার ন্যস্ত করা হইতেছে এবং কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আপসহীন বৈরী মনোভাব তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অত্যন্ত আপত্তিকর দিকগুলির মধ্যে অন্যতম নতুন শাসনতন্ত্রে ব্যবসায়িক ও আর্থিক রক্ষাকবচ সম্পর্কিত দিকটি। দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে জনসাধারণকে ক্ষমতাহীন করেই শুধু রাখা হবে না, ব্যয়বরাদ্দ খাতের অধিকাংশ থাকবে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ১৯৩৭-৩৮ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট অনুযায়ী সামরিক খাতে খরচ হয়েছে ৪৪·৬১ কোটি টাকা (৩·৩৪৬ কোটি পাউণ্ড), যেখানে মোট খরচের পরিমাণ ৭৭·৯০ কোটি টাকা (৫·৮৪২ কোটি পাউণ্ড)—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৭ ভাগ। দেখা যাচ্ছে, গভর্ণর জেনারেল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যে সংরক্ষিত দিকটি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন সেই খাতে ব্যয় হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ। তাছাড়া, এরই মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ফেডারেল রেলওয়েজ অথরিটির মত সংস্থা গঠন করা হয়েছে এবং পরে আরও হবে, যারা স্বয়ংস্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে যাবে এবং তাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। রেলওয়ে নীতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে বর্তমানে বিধানসভার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা থেকে বিধানসভা বঞ্চিত হবে, এবং দেশের মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময় নীতির সঙ্গে দেশের অথনৈতিক বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও সেই নীতি নির্ধারণে বিধানসভার কোন হাত থাকবে না।

বহির্দেশীয় ব্যাপার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে সংরক্ষিত বিষয় বলে গণ্য হবে; এর ফলে ভারতীয় বিধানসভার বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে এবং কার্যতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত স্বয়ং-নির্ভরতা গুরুতরভাবে সংকুচিত হবে। ভারতীয় আইনসভার কাছে এখন যেমন ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তি উপস্থাপিত করার কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরও এইরকম বাণিজ্যচুক্তি অনুমোদনের জন্য বিধানসভার কাছে উপস্থাপনের শাসন-তান্ত্রিক কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। তথাকথিত রাজস্ববিষয়ক স্বয়ং-

নির্ভরতার প্রথাগত নিয়মের কোন অর্থই থাকবে না যদি এইরকম শর্ত না থাকে যে, ভারতের পক্ষে যে কোন বাণিজ্যচুক্তিতে ভারতীয় আইনসভার বিনা অনুমোদনে কোন পক্ষই স্বাক্ষর করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ভারতের পক্ষে জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এমন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি করা উচিত, যে সব দেশের সঙ্গে তার অতীতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভার সেই ক্ষমতা থাকবে না যাতে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে এই ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করতে পারে।

আইনে বাণিজ্যসংক্রান্ত অন্যায় ও অন্যায্য যে রক্ষাকবচগুলি রাখা হয়েছে তা ভারতীয় জাতীয় শিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কার্যকর যে কোন প্রচেষ্টা অসম্ভব করবে, বিশেষতঃ প্রায়শঃই যেমন হয়ে থাকে, যে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও শিল্পসংক্রান্ত স্বার্থের সঙ্গে তার বিরোধ থাকবে। পক্ষপাতিত্বমূলক আইনের বিধানগুলি যাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় সেই বিষয়ে গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্বের উপরে আরও একটি কর্তব্য থাকছে, ভারতে আমদানি করা ব্রিটিশ পণ্যের উপর যাতে কোনপ্রকার প্রভেদাত্মক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা। এইসব কড়া ও ব্যাপক বিধানগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যাবে যে, ভারত ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে এমন কোন পন্থাই অবলম্বন করতে পারে না যা গভর্ণর-জেনারেল বিধানিক ক্ষেত্রে বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কার্যতঃ নাকচ বা অগ্রাহ্য করতে না পারেন। এ দেশে এ-দেশীয়দের সঙ্গে বিদেশীয়দের সমান সমান শর্তে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে দেওয়া চরম অযৌক্তিক ব্যাপার এবং সত্যকার স্বরাজ বলে কিছুই হবে না যদি ভারতকে তার জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ণয় ও গ্রহণ করার ক্ষমতা, সেইসঙ্গে, তার স্বার্থের দিক থেকে যদি প্রয়োজন হয়, জাতীয় ও বিজাতীয়দের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করার অধিকার দেওয়া না হয়। ১৯৩১ সালের গান্ধী-আরউইন চুক্তির

অব্যবহিত পরে লেখা "দানব ও বামন" শিরোনামে ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত বিখ্যাত প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "ভারতীয় স্বার্থ এবং ইংরেজ বা ইওরোপীয় স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা হবে না, এ কথা বলা মানে ভারতীয় দাসত্বকে চিরস্থায়ী করা। একটা দানবের ও একটা বামনের একই রকম অধিকার বলতে কী বোঝায় ?" ভারতীয় মালিকানাধীন বা ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন জাহাজের জন্য ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্য সংরক্ষিত রাখার জন্য আইন প্রণয়নের যে সামান্য ক্ষমতা বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইনসভার এক্তিয়ারে আছে, তথাকথিত সংস্কৃত শাসনতন্ত্র তাও কেড়ে নিয়েছে। পোত-শিল্প একটি অত্যাবশ্যক শিল্প, দেশরক্ষার জন্য এবং অর্থনীতির দিক থেকে তা একান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই মৌল শিল্পটিকে প্রচলিত ও ন্যায়সঙ্গত কোন পদ্ধতিতেই, এমন কি যে সকল পদ্ধতি বিভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন অনুসরণ করেছে, সেই সব পদ্ধতিতেও বিকশিত করা এখন থেকে ভারতের পক্ষে অসাধ্য করা হয়েছে। "ব্যতিহার" ও "অংশীদারি"র যুক্তিতে আমাদের সার্বভৌমত্বের এরকম সীমানির্দেশকে যথোচিত প্রতিপন্ন করা আঘাত করার পর অপমানের সামিল। ভারতীয় স্বার্থে যখনই প্রয়োজন হবে, জাতীয় ও বিজাতীয়দের মধ্যে প্রভেদ করা ও পার্থক্য রক্ষা করার অক্ষুণ্ণ অধিকার ভবিষ্যৎ ভারতীয় পার্লামেণ্টের থাকা উচিত এবং আমরা কোনক্রমেই এই অধিকার ছেড়ে দিতে পারি না। এই প্রসঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। কতকগুলি বিষয়, যেমন, নির্বাচনপদ্ধতি, জনকল্যাণমূলক কাজে যোগদান, বাণিজ্যপোত আইন, বিমান, সেইসঙ্গে আরও বিশেষ যে সকল সুবিধা আইরিশ জাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত রাখা বিবেচিত হয়েছে, যেমন আইরিশ শিল্পের সহায়তার জন্য বিশেষ পন্থা মারফত সুবিধাদান, এই সকল ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের আইরিশ ন্যাশনালিটি অ্যাণ্ড সিটিজেনশিপ অ্যাক্টে বিশেষ ধরনের আইরিশ নাগরিকতার বিধান আছে। আইরিশ নাগরিক অধিকার, এককথায় বলতে গেলে, ব্রিটিশ নাগরিক

অধিকার থেকে স্বতন্ত্র। আয়ার রাষ্ট্রে (বা আয়ার্ল্যাণ্ডে) ব্রিটিশ নাগরিক ব্রিটিশ নাগরিকতার ভিত্তিতে সমান অধিকার দাবি করতে পারে না। ব্রিটিশ নাগরিক অধিকার আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বীকৃতও নয়। আমি বোধ করি ভারতেরও উচিত অনুরূপভাবে তার নিজস্ব বিশিষ্ট জাতীয় সত্তা গড়ে তোলার প্রয়াস করা এবং নিজস্ব নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

রাজস্ব সংক্রান্ত স্বয়ংশাসন ও বাণিজ্যিক রক্ষাকবচের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, সংক্ষেপে ভারতের পক্ষে সক্রিয় একটি বাণিজ্য-নীতির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করতে চাই। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যকে অনিয়মিত ও খাপছাড়াভাবে দেখা উচিত নয়। ব্রিটিশ শিল্পকে প্রয়োজনমত বা সাময়িক সুবিধার যোগান দেবার জন্য প্রায়ই তা করা হয়। এই বৈদেশিক বাণিজ্যকে দেখা উচিত সর্বাত্মকভাবে যাতে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে একদিকে তার বহির্বাণিজ্যের, অপরদিকে বাহিরিক বাধ্যবাধকতার যোগ থাকে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতিই এমন যে সেই দিক থেকে তার একটি জিনিস একান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডের সঙ্গে তার এমন কোন সীমানিয়ন্ত্রক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত হবে না, যাতে সাম্রাজ্যবহির্ভূত বিভিন্ন দেশ, যারা নানা দিক থেকে তার শ্রেষ্ঠ ক্রেতা, তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে, অথবা যাতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সরাসরি দরদস্তুর করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা রক্ষার জন্য এখনও কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং অটোয়া চুক্তির নোটিসের মেয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পরও এবং আইনসভা এই চুক্তিকে আর চালু না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তা চালু রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ ইস্পাত ও বস্ত্রের উপর পার্থক্যমূলক শুল্ক আরোপ করা ছাড়াও ওই অটোয়া চুক্তি ব্রিটিশ শিল্পের জন্য প্রচলিত সুবিধাগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি মাত্রই যে

অসম হতে বাধ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের এখনকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ এমনই যাতে ইংলণ্ডের স্বার্থের দিক বেশি করে দেখা হবে। ব্রিটিশ পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা যে মূলতঃ রাজনৈতিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং বাণিজ্যচুক্তির আওতায় এ দেশে কোন অভারতীয় লগ্নী-স্বার্থকে সংহত বা প্রতিষ্ঠিত হতে দেবার আগে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও অর্থনৈতিক ফলাফল আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। আমার বিশ্বাস, বর্তমানে ইন্দো-ব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তির যে আলোচনা চলছে তা, যখনই সম্ভব, অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের পথে অন্তরায় হয়ে উঠবে না, এবং ভারতীয় আইনসভা অনুমোদন না করা পর্যন্ত এইপ্রকার কোন বাণিজ্যচুক্তিতে ভারত সরকার স্বাক্ষর করবে না।

উল্লিখিত অংশ থেকে এ কথা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতার সঙ্গে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার ক্ষমতার কোন মিল নেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার গঠনও কিছু পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যা সারা ভারতের জনসংখ্যার মোটামুটি শতকরা ২৪ ভাগ। তৎ-সত্ত্বেও এইসব রাজ্যের রাজন্যবর্গকে, তাদের প্রজাদের নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নতর সভায় মোট আসনের শতকরা ৩৩ ভাগ আসন এবং উচ্চতর সভায় ৪০ ভাগ আসন দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায়, আমার মতে, কংগ্রেসের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে তাদের মনোভাব বদলানোর সম্ভাবনা কখনই নেই। ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসকে সাফল্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিহত করার উপরে আমাদের অব্যবহিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবকে সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে আমাদের বিরোধিতা করতেই হবে—কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পথেই আমরা চলব এমন কথা নয়—শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে যে চরম উপায় আছে, সর্বাত্মক সেই আইন অমান্যের পথও আমাদের নিতে হতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কমই আছে যে, ভবিষ্যতে

যদি এরকম আন্দোলন শুরু হয়, তা ব্রিটিশ ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়বে।

নিকট-ভবিষ্যতে সার্থক সংগ্রাম করতে হলে নিজেদের দিকটা আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার। গত কয়েক বছরে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা এমন বিপুল হয়ে উঠেছে যে আমাদের পার্টি সংগঠন সম্পর্কে নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। আজকালকার সভায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাবেশ নিতান্ত মামুলী ঘটনা। কখনও কখনও দেখা যায় এইসব সভা বা শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি আমাদের নেই। এইসব সাময়িক জনসমাবেশের কথা বাদ দিলেও, আরও বড় এক সমস্যা থেকে যায়, অভূতপূর্ব এই গণশক্তি ও উদ্দীপনাকে সুসংহত করা এবং সঠিক পথে তাদের চালিত করা। কিন্তু এই কাজ করার মত আমাদের কি সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আছে? জাতীয় সেবার জন্য কি আমাদের অফিসারদল আছে? সদ্য যারা নেতা হয়ে উঠছে, যে তরুণ কর্মীদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে, তাদের প্রশিক্ষণের জন্য আমরা কি কোন ব্যবস্থা করেছি? এই প্রশ্নগুলির জবাব এতই স্পষ্ট যে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। আধুনিক রাজনৈতিক দলের এইসব চাহিদা আমরা এখনও পূরণ করতে পারিনি। এখনই আমাদের তা করা দরকার। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারদের দিয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল এক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে ভবিষ্যতে আমরা আরও উৎকৃষ্ট ধরনের নেতা পেতে পারি। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি গ্রীষ্মকালীন স্কুল ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান মারফত এইপ্রকার প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করে। একদলীয় রাষ্ট্রগুলির বৈশিষ্ট্যই এই। আমাদের কর্মীরা, যাঁরা আমাদের সংগ্রামে গৌরবজনক অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েও আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের পার্টিতে আরও প্রতিভাস্ফুরণের ক্ষেত্র আছে। এই ত্রুটি অংশতঃ দূর করা

যেতে পারে, যে সকল তরুণের মধ্যে সম্ভাবনা আছে তাদের দলভুক্ত করে এবং অংশতঃ যাঁদের আমরা আগেই পেয়েছি তাঁদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রত্যেকেই নিশ্চয় লক্ষ্য করে দেখেছেন কিছু কিছু ইওরোপীয় দেশ এই সমস্যার কি ভাবে সমাধান করছে। যদিও আমাদের আদর্শ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তবু সব দিক থেকে বিবেচনা করলে এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিজ্ঞানসম্মত সর্বাত্মক প্রশিক্ষণ আমাদের কর্মীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু নাৎসীদের লেবার সার্ভিস কোরের মত প্রতিষ্ঠানকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। প্রয়োজনমত রদবদল করে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতের পক্ষেও হিতকর হতে পারে।

আমাদের নিজেদের পার্টির মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা প্রবর্তনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি সমস্যা বিবেচনা করতে হবে যে সমস্যা আমাদের অনেকেরই দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। আমি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণসভার মত প্রতিষ্ঠানের এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা বলছি। এই প্রশ্নে বিরুদ্ধ চিন্তার দুটি দল আছে—যাঁরা কংগ্রেসের বাইরেকার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে নস্যাৎ করে থাকেন এবং যাঁরা তাদের সমর্থন করেন। আমার নিজস্ব মত, অগ্রাহ্য করে বা ধিক্কার দিয়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আমরা বিলোপ করতে পারব না। তারা রয়েছে বাস্তব সত্য, এবং যেহেতু তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং বিলীন হয়ে যাবার কোন লক্ষণই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, তাদের পিছনে যে একটা ঐতিহাসিক আবশ্যকতা আছে সেইটেই প্রণিধানযোগ্য। এ ছাড়া, অন্যান্য দেশেও এই ধরনের সংগঠন দেখা যায়। আমরা চাই বা না চাই, এদের অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করে নিতেই হবে। একমাত্র প্রশ্ন, কংগ্রেস এদের সঙ্গে কি প্রকার আচরণ করবে। স্পষ্টতঃই এইসব সংগঠন—যে কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য গণসংগ্রামের মুখপাত্র—সেই জাতীয়

কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেবে না। অতএব তাদের উচিত কংগ্রেস আদর্শে ও পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা। যাতে তা সম্ভব হয়, বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মীর ট্রেড ইউনিয়নে ও কৃষক সংগঠনগুলিতে যোগ দেওয়া উচিত। ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, সহজেই এ কাজ করা যেতে পারে, এবং তার জন্য কোন বিরোধ বা অসঙ্গতির মধ্যে পড়তে হবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে অপর দুটি সংগঠনের সহযোগিতা সুগম করা যেতে পারে যদি শেষোক্ত সংগঠনগুলি শ্রমিক ও কৃষকদের মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে লিপ্ত থাকে এবং যারাই দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়াসী তাদের সবাকার সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কংগ্রেসকে মেনে নেয়।

এর থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক কৃষক সংগঠনগুলিকে সামূহিক-ভাবে সম্বদ্ধ করার বিতর্কিত প্রশ্নে আসতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এমন একদিন আসবে যখন কংগ্রেসের প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণা-ধীনে যাতে সমস্ত প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলিকে একত্রিত করা যায়, সেইজন্য সম্বদ্ধ করার অনুমতি আমাদের দিতে হবে। কি পদ্ধতিতে এবং কতখানি এই সম্বদ্ধীকরণ অনুমোদন করা যেতে পারে সে বিষয়ে অবশ্যই মতপার্থক্য থাকবে। অনুমোদন করার আগে এই ধরনের সংগঠনের চরিত্র ও স্থায়িত্ব পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রাশিয়ায় শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েতের যুক্তফ্রণ্ট অক্টোবর বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করে—কিন্তু, বিপরীতপক্ষে, গ্রেট ব্রিটেনে দেখি লেবার পার্টির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের উপর ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রভাব নিতান্তই পরিমিত। ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের ভালভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং কিষাণসভার মত সংগঠনগুলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে এবং আমরা এ কথা যেন ভুলে না যাই যে, প্রথমোক্ত সংগঠনগুলি প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগে যদি জড়িত না থাকে তাহলে তাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকারই সম্ভাবনা।

যাই হোক না কেন, সামূহিকভাবে সম্বদ্ধ করার প্রশ্ন বাদ দিলেও, জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা বিধেয় এবং এই লক্ষ্য সুগম হবে যদি শেষোক্ত সংগঠনগুলি প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে।

কংগ্রেসেব মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মত একটি পার্টি গঠনের প্রশ্নে বহু বিতর্ক হয়ে গেছে। আমি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির হয়ে কিছু বলছি না। আমি ওই পার্টির সদস্যও নই। তা সত্ত্বেও আমাকে বলতেই হবে যে, ওই পার্টির সাধারণ তত্ত্ব ও নীতির সঙ্গে গোড়া থেকেই আমি একমত। প্রথমতঃ, একটি পার্টির মধ্যে বামপন্থী-দের সংহত হওয়া সত্যই কাম্য। দ্বিতীয়তঃ বামপন্থী একটা ব্লক থাকার সার্থকতা তখনই, যখন তার প্রকৃতি হয় সমাজতান্ত্রিক। অনেক বন্ধু এইরকম ব্লককে পার্টি বলাতে আপত্তি করছেন, তবে আমার মনে হয় ওই ব্লককে গ্রুপ লীগ বা পার্টি, যাই বলা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে যে সীমা নির্দিষ্ট আছে তার মধ্যে একটি বামপন্থী ব্লকের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করা খুবই সম্ভব, সেক্ষেত্রে তাকে গ্রুপ লীগ বা পার্টি নিশ্চয় বলা যেতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বা ওই ধরনের অন্য যে কোন পার্টির ভূমিকা হওয়া উচিত বামপন্থী উপদলের মত। আমাদের আপাততঃ সমস্যা সমাজতন্ত্র নয়—তা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রস্তুত হতে সমাজতান্ত্রিক প্রচারের প্রয়োজন আছে। এবং সেইমত প্রচারের কাজ চালাতে পারে কেবলমাত্র কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মত পার্টি, যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্রের জন্য কৃতসংকল্প।

একটি সমস্যা আছে, যে সম্পর্কে কয়েক বৎসর ধরে ব্যক্তিগতভাবে আমি গভীর আগ্রহী এবং সে সম্পর্কে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই। আমার বক্তব্য ভারতের একটি বৈদেশিক নীতির ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে। আমি এই কাজের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করি কারণ আমার বিশ্বাস আগামী কয়েক বৎসরে

আন্তর্জাতিক পরিণতি ভারতে আমাদের সংগ্রামকে সহায়তা করবে। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং কিভাবে তার সুযোগ নেওয়া যায় তাও আমাদের জানতে হবে। দৃষ্টান্তরূপে আমাদের সামনে রয়েছে মিশরের শিক্ষা। মিশর বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে গ্রেট ব্রিটেনকে মৈত্রী সন্ধিতে আবদ্ধ করতে পারল, যেহেতু তার জানা ছিল, কি করে ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ইটালীয় মনকষাকষির সুযোগ নিতে হয়।

আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে প্রথমে যে পরামর্শ আমি দিতে চাই তা এই যে, কোন দেশের আভ্যন্তরিক রাজনীতি দ্বারা বা তার রাষ্ট্রের কী রূপ তার দ্বারা আমরা যেন প্রভাবিত না হই। সব দেশেই এমন নরনারী আমরা দেখতে পাব যাদের নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক, তারা ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল। এই বিষয়ে সোভিয়েত কূটনীতির কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সোভিয়েত রাশিয়া যদিও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে তার কূটনীতিবিদরা দ্বিধা করেনি এবং সহানুভূতি বা সমর্থন, যেখান থেকেই আসুক না কেন, ফিরিয়ে দেয়নি। অতএব আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত যেন প্রতিটি দেশে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নরনারীদের নিয়ে চক্র গঠন করা হয়। এই ধরনের চক্র গঠনও তার বিকাশ সাধন করতে বৈদেশিক পত্রপত্রিকা, ভারতের চলচ্চিত্র ও শিল্প-প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচার বিশেষ সহায়ক হবে। যেমন চীনেরা তাদের শিল্প প্রদর্শনী মারফত ইওরোপে নিজেদের দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছে। সবার উপরে, ব্যক্তিগত সংযোগেরও দরকার। ব্যক্তিগত সংযোগ না থাকলে অন্যান্য দেশে ভারতকে জনপ্রিয় করে তোলা কঠিন হবে। এই কাজে বিদেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র আছে তারা সাহায্য করতে পারে, অবশ্য ভারতে থেকে আমরা যদি তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে নজর রাখি। বাইরের ভারতীয় ছাত্ররা এবং দেশের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা উচিত। ভারতে তোলা সাংস্কৃতিক ও

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র আমরা যদি বাইরে পাঠাতে পারতাম, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি বাইরের লোকেরা ভারতকে ও তার সংস্কৃতিকে জানতে পারত এবং জেনে সমাদর করত। অন্যান্য দেশে যে সকল ভারতীয় ছাত্র ও বসবাসকারী ভারতীয় আছে এবং যারা এখন আমাদের বেসরকারী দূতের মত, এই ধরনের চলচ্চিত্র তাদের খুবই কাজে লাগবে।

প্রচার কথাটা আমার পছন্দ হয় না—কথাটায় একটা মিথ্যাভাব জড়িত আছে। কিন্তু আমি বিশেষভাবে বলতে চাই, ভারতকে ও তার সংস্কৃতিকে যাতে সারা দুনিয়া জানতে পারে সেদিকে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমি এ কথা বলছি, তার কারণ আমি জানি, এরকম প্রচেষ্টাকে ইওরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক দেশ স্বাগত জানাবে। এই কাজে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহলে বিভিন্ন দেশে আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রদূতাবাস ও বৈদেশিক প্রতিনিধির জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারব। গ্রেট ব্রিটেনকে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। এমনকি ও দেশেও স্বল্পসংখ্যক অথচ প্রভাবশালী একদল নরনারী আছেন যাঁরা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথার্থই সহানুভূতিশীল। যে তরুণ সমাজ সদ্য জাগছে তাদের মধ্যে এবং বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতি দ্রুত বাড়ছে। গ্রেট ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একবার ঘুরে দেখলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

এই কাজ সার্থকভাবে চালিয়ে যেতে হলে ইওরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায় এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি থাকা দরকার। দুঃখের কথা যে আমরা এতাবৎকাল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাকে অবহেলা করে এসেছি অথচ ভারত সম্পর্কে তারা গভীর আগ্রহী। আন্তর্জাতিক সংযোগ বর্ধনের কাজে কংগ্রেসের সহায়তা করতে পারে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ করছে এমন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপৃত ভারতীয় বণিক সভা (ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স)।

এ ছাড়া ভারতীয়দের অবশ্যকর্তব্য হবে প্রতিটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বা সম্মেলনে যোগদান করা ; এই সব সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফলে ভারতের পক্ষে যে প্রচার হয় তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুস্থ।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমার উচিত কারও কারও মনে যে সন্দেহ জাগতে পারে তা দূর করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা মানে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা নয়। আমাদের এইরূপ ষড়যন্ত্র করার কোন দরকার নেই, কারণ আমাদের যা কিছু কার্যপদ্ধতি সবই প্রকাশ্য। পৃথিবীব্যাপী ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলে আসছে তার সারমর্ম এই যে, ভারতবর্ষ একটি অসভ্য দেশ, এবং তাই থেকেই ধরে নেওয়া হয়, আমাদের সভ্য করার জন্যে ব্রিটিশের থাকা দরকার। এর জবাবে আমাদের দিক থেকে দুনিয়াকে জানানো দরকার, আমরা কী এবং আমাদের সংস্কৃতি কি রকম। আমরা যদি তা করতে পারি, আমাদের সপক্ষে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি এত বিপুল পরিমাণে আমরা গড়ে তুলতে পারব যে, দুনিয়ার দরবারে ভারতের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে—বিশেষতঃ জাঞ্জিবর, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয় ও সিংহলে—আমাদের দেশবাসীকে যে সকল সমস্যা, দুর্ভোগ ও দুর্বিপাকের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত। কংগ্রেস তাঁদের বিষয়ে সর্বদাই গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে। আমরা যদি তাঁদের জন্যে আরও বেশি কিছু না করে থাকি, তার কারণ আমরা স্বদেশে এখনও গোলাম হয়ে রয়েছি। স্বাধীন ভারত বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি সুস্থ ও প্রবল শক্তিরূপে দেখা দেবে এবং তখনই তা বিদেশে তার দেশবাসীদের স্বার্থ তদারক করতে সমর্থ হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে, যেমন পারস্য, আফগানিস্তান, নেপাল, চীন, বর্মা, শ্যাম, মালয় যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহলের সঙ্গে নিকটতর সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ গড়ে তোলা যে প্রয়োজন ও অভিপ্রেত সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছি।

তাঁরা যদি আমাদের আরও বেশি জানেন এবং আমরা যদি তাঁদের আরও বেশি করে জানি, আমাদের উভয়েরই তাতে ভাল। বিশেষ করে বর্মা ও সিংহলের সঙ্গে যুগযুগব্যাপী আমাদের যে পারস্পরিক সম্বন্ধ চলে এসেছে সেই কথা স্মরণ করে তাঁদের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত।

বন্ধুগণ, আমি দুঃখিত, প্রথমে আমি যতখানি সময় নেব ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি আপনাদের সময় নিয়ে ফেলেছি, তবে আমি আমার ভাষণের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও আছে যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—এটি রাজনৈতিক কয়েদী ও রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন, আজ যে প্রশ্ন সকলকে চঞ্চল করছে। সাম্প্রতিক অনশন ধর্মঘটের ফলে এই প্রশ্ন প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জনসাধারণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আমার বিশ্বাস, যখন আমি বলছি এঁদের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে মানুষের সাধ্যায়ত্ত যা কিছু সম্ভব সব করা হবে, তখন আমি কংগ্রেসের অন্ততঃ সাধারণ কর্মীদের মনের কথাই বলছি। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পর্কে এ কথা বলে রাখা ভাল যে, তাঁদের মধ্যে কারও কারও কাজের রেকর্ড সাধারণের আশানুরূপ হয়নি। তাঁরা যত শীঘ্র সাধারণের দাবি পূরণ করতে পারবেন, কংগ্রেসের পক্ষে এবং যে সকল প্রদেশের শাসনভার অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার উপরে, সেখানকার জনসাধারণের পক্ষে তত ভাল হবে। আমার পক্ষে এই প্রসঙ্গে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন এবং আমি মনেপ্রাণে আশা করি যে, নিকট ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে জনসাধারণের অনুযোগের কিছু থাকবে না।

জেলে ও অন্তরীণ অবস্থায় যে সকল রাজবন্দী ও রাজনৈতিক কয়েদীরা আছেন কেবলমাত্র তাঁদেরই কাহিনী দুঃখের নয়। যাঁরা ছাড়া পেয়েছেন তাঁদের ভাগ্যও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি আশাপ্রদ নয়। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে, যক্ষ্মার মত মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে প্রায়ই তাঁরা ঘরে ফিরে আসেন। তাঁদের সামনে নির্মম অনাহারের

বিভীষিকা, যারা তাঁদের আপনার জন, যারা প্রিয়জন, তারা হাসি-মুখে তাঁদের অভ্যর্থনা করে না, অভ্যর্থনা করে চোখের জল দিয়ে। যাঁরা দেশের সেবায় তাঁদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন এবং বিনিময়ে দারিদ্র্য ও দুঃখ ছাড়া কিছুই পাননি তাঁদের প্রতি আমাদের কি কোনই কর্তব্য নেই ? অতএব যাঁরা দেশকে ভালবাসার অপরাধে নিগৃহীত হয়েছেন, আসুন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জানাই এবং তাঁদের দুর্দশা লাঘবের জন্য আমরা সবাই সাধ্যমত সাহায্য করি।

বন্ধুগণ, আরেকটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আজ আমরা দারুণ এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। কংগ্রেসের ভিতরে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তা অগ্রাহ্য করে লাভ নেই। বাইরে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হুমকি, যার মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে। এই সংকটে আমাদের করণীয় কী ? এ কথা বলার কি দরকার আছে যে, আমাদের পথে ঝড়ঝঞ্ঝা যাই আসুক সবকিছুর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের শাসকদের যত কিছু কূটচাল সব আমাদের উপেক্ষা করতে হবে ? কংগ্রেস আজ গণসংগ্রামের একমাত্র মোক্ষম হাতিয়ার। এতে দক্ষিণ-পন্থী ব্লক, বামপন্থী ব্লক থাকতে পারে—তা সত্ত্বেও ভারতের মুক্তি-প্রয়াসী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যত সংগঠন আছে তাদের সবার সাধারণ মঞ্চ কংগ্রেসই থাকবে। অতএব, আসুন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে সারা দেশকে সমবেত করি। বিশেষ করে আমি দেশের বামপন্থী দলগুলির কাছে আবেদন জানাতে চাই, কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত করতে তাঁরা যেন যথাশক্তি ও যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করেন। এই আবেদন করার সময় আমি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মনোভাবে অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের পার্টির সাধারণ নীতির সঙ্গে, আমার মনে হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতির সঙ্গতি আছে।

পরিশেষে, আপনাদের মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে চাই, সারা ভারত মনেপ্রাণে আশা করে ও প্রার্থনা করে, আমাদের জাতির কাছে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি আগামী আরও অনেক অনেক বৎসর স্থায়ী হোক। ভারত তাঁকে এখন হারাতে পারে না, এই মুহূর্তে তো কিছুতেই না। আমাদের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যে আমাদের তাঁকে দরকার। আমাদের সংগ্রামকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের তাঁকে দরকার। ভারতের স্বাধীনতার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমাদের তাঁকে দরকার। এর চেয়েও বড় কথা—মানবতার আদর্শের জন্য আমাদের তাঁকে দরকার। আমাদের যে সংগ্রাম তা কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও, যার প্রধান স্তম্ভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আমরা তাই একমাত্র ভারতের জন্যই সংগ্রাম করছি না, বিশ্বমানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম। বিমুক্ত ভারত অর্থ মানবজাতির মুক্তি।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

লণ্ডন সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন

প্রশ্ন ও উত্তর

১৯৩৮-এর ২৪শে জানুয়ারি তারিখে লণ্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কারে' প্রকাশিত আর. পাম. দত্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন।

প্রশ্ন : এখানে জাতীয় সরকারের প্রবক্তারা বলছেন যে ভারতে নতুন শাসনতন্ত্র বড় রকম সাফল্য বলে গণ্য হয়েছে, এবং এর প্রমাণ কংগ্রেসের সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ। এই বক্তব্য সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের অভিমত কী?

উত্তর : সরকার গঠনের দায়িত্বগ্রহণ থেকে প্রমাণ হয় না যে, কংগ্রেস সব সময়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কাজ করে চলবে। যথেষ্ট সংশয় নিয়েই কংগ্রেস সরকারী দায়িত্ব নিয়েছে।

কংগ্রেসের দিক থেকে তা নেওয়ার উদ্দেশ্য দু রকম : প্রথমতঃ, তার নিজস্ব অবস্থাকে সুসংহত করা ; এবং দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিধিনিয়মের মধ্যে থেকে যে সত্যকার বড় রকমের কিছু বা লাভজনক কিছু পাওয়া সম্ভব নয় তা প্রতিপন্ন করা। যদি তা মিথ্যা প্রমাণ করে লাভজনক কিছু পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামে তা জনসাধারণের সংগঠনকে শক্তিশালী করবে।

প্রশ্ন : শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকে কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর : কংগ্রেস যেমন প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে সেইরকম যে শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশকেও মেনে নিয়ে কাজ করবে এবং এ বিষয়ে তার মনোভাব বদলাবে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই।

প্রশ্ন : আপনার মতে জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায় কী?

কৃষক অসন্তোষ ও শ্রমিক ধর্মঘটের আন্দোলন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ কথা কি সত্য ?

উত্তর ঃ জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায় হবে আরও দ্রুতগতিতে গণচেতনার বিকাশ। কংগ্রেসের পক্ষে সমস্যা হবে এই শক্তিকে সংহত করে ঠিক পথে চালিত করা।

এককথায় সমস্যা দাঁড়াবে পার্টি সংগঠনকে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। যদি আমরা তা পারি আমরা বুকে বল ও মনে আশা নিয়ে ভবিষ্যতে যে কোন সঙ্কটই আসুক না কেন সবার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারব। কংগ্রেস-পার্টি সরকার গঠন করার পর থেকে কিষাণবিক্ষোভ ও শ্রমিক ধর্মঘটগুলির মধ্যে দিয়ে বর্ধিত গণচেতনাই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সর্বাত্মক জাতীয় ফ্রন্ট রূপে জাতীয় কংগ্রেসের গণভিত্তিকে ব্যাপকতর করার জন্য শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে সামূহিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্বন্ধ করার পক্ষে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন ঃ ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টি বা ভবিষ্যৎ শ্রমিক সরকার কোন্ নীতি অবলম্বন করলে আপনার মনঃপূত হয় ?

উত্তর ঃ আমরা চাই ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সমর্থন করুক।

প্রশ্ন ঃ আপনার 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' বইয়ের শেষের দিকে ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ফ্যাসি-বাদের উপর আপনার অভিমত সম্পর্কে আপনি কি কোন মন্তব্য করতে চান ? ওই অংশেই কমিউনিজম সম্পর্কে আপনার সমালোচনা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তার উপরেও কি কোন মন্তব্য করতে চান ?

উত্তর ঃ তিন বছর আগে ওই বই লেখার পর থেকে আমার রাজনৈতিক ধারণা আরও পরিণতি লাভ করেছে।

আমি সত্যি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, ভারতে আমরা

চাই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তা লাভ করার পর, সমাজতন্ত্রের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। "কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয়ে"র উল্লেখ করে এই কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম। সম্ভবতঃ যে ভাষায় আমি তা প্রকাশ করেছি তা তেমন সন্তোষজনক হয়নি। তবে আমার দিক থেকে এ কথাও বলে রাখা উচিত যে, যখন আমি বইটি লিখছিলাম, ফ্যাসিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান তখনও শুরু করেনি এবং আমার কাছে তা মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদেরই একটা উগ্র সংস্করণ।

এ কথাও আমার বলা দরকার যে, ভারতে যাঁরা কমিউনিস্টপন্থী বলে জাহির করতেন তাঁদের কার্যকলাপ থেকে আমার মনে হয়েছিল তাঁরা জাতীয়তাবিরোধী, এবং এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যখন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রকাশ করেন। আজ অবস্থা যে মূলতঃ পালটিয়ে গেছে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

আমি আরও একটি কথা বলতে চাই। মার্কস ও লেনিনের লেখা থেকে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতি সংক্রান্ত সরকারী বিবৃতি থেকে যে কমিউনিজমকে জানা যায়, আমার বরাবর ধারণা এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, সেই কমিউনিজম জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং তা তার বিশ্ববীক্ষার অঙ্গাঙ্গী অংশ বলেই স্বীকৃত।

আজকের দিনে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে সংগঠিত করা উচিত এবং তার দুটি লক্ষ্য থাকবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

পৌর সমাজতন্ত্র

বোম্বাই কবপোবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ১০ই মে : ১৯৩৮

মেয়র মহোদয়, করপোরেশনের সদস্যগণ এবং বন্ধুগণ,

আজকের এই অপরাহ্নে আপনারা আমাকে যে বিরাট সম্মানে অভিনন্দিত করেছেন তার জন্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এতটা দাম্ভিক নই যাতে এই বিরাট সম্মানের যোগ্য বলে নিজেকে মনে করতে পারি। অপরপক্ষে আমি মনে করি আমি আমার সবকিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আজকের এই অপরাহ্নে নিছক একটি প্রতীকরূপে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এবং ভারতের জনসাধারণের সেবকরূপে আমি এখানে এসেছি।

মেয়র মহাশয়, আপনার মুখনিঃসৃত সহৃদয় বাণী আপনার অন্তঃকরণের মহানুভবতা ও উদারতার পরিচায়ক। আমি ধরে নিচ্ছি অন্তঃকরণের এই মহানুভবতা ও উদারতা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি এবং সেই আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবার প্রতি আপনার প্রকৃত মনোভাব জ্ঞাপন করছে। আমরা যুগান্তকারী সময়ের মধ্যে বেঁচে আছি। আপনি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর কথাও উল্লেখ করেছেন। সেদিন আর নেই যখন ভারত বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দেশ ছিল। আজকের দিনে, বৈজ্ঞানিক অবদানের দয়ায় এবং আমাদের জ্ঞানগত ও নীতিগত উন্নতির ফলে, সারা পৃথিবী একটি সত্তায় পরিণত হয়েছে। আজকের দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে যা ঘটে, সারা পৃথিবীময় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অতএব ভারতের একটি শহরে আমরা যা সম্ভব করি, তার গুরুত্ব কেবলমাত্র সেই শহরেই আবদ্ধ থাকে না, তাই বা কেন, কেবলমাত্র সেই দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আমার মনে হয়, সমস্ত মানবজাতির কাছে তার গুরুত্ব থাকে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারেই এ কথা সত্য নয়, পৌর ব্যাপারেও

সত্য। আমার মনে পড়ে, ইওরোপে যে কয়েক বছর আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল, সে সময় সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম যা আমার নজরে পড়েছিল তা ভিয়েনার সমাজতান্ত্রিক মিউনিসিপালিটির কীর্তি। আমার বিশ্বাস ঐ মিউনিসিপালিটির কিছু কার্যকলাপ দেখার যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা যে কোন জাতির হোন, তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি এই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যাননি যে, এখানে যা সম্ভব করে তোলা হয়েছে তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব পৌরকল্যাণে আগ্রহী যে কোন মানুষের কাছে খুবই বেশি। ভিয়েনা মিউনিসিপালিটি বারো বছরের মধ্যে কমপক্ষে ২,০০,০০০ লোকের বাসস্থানের সংস্থান করে এবং ২,০০,০০০ লোকের এই বাসের সংস্থান করতে অতিরিক্ত কর আরোপ করতে হয়নি এবং কর্জও করতে হয়নি। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছে রাজস্ব এবং সেই রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে আমোদ-প্রমোদের উপর কর ধার্য করে। আমরা জানি এদেশেও আমোদ-প্রমোদের উপর কর আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শহরগুলি সেই কর থেকে কোনভাবেই উপকৃত হয় না। আমাকে যা সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে তা এই ঘটনা, একটি শহরে এত বড় একটা ব্যাপার করা যেতে পারে অতিরিক্ত করের বোঝা না চাপিয়ে বা কর্জ না করে। এই জন্যেই আমি বলতে চেয়েছিলাম, একটি শহরে আপনারা যদি কিছু সম্ভবপর করে তুলতে পারেন, সারা দুনিয়ার কাছে তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব থেকে যাবে।

খুবই আনন্দের কথা যে, বোম্বাইয়ে আপনারা সীমিত ভোটাধিকার বিলোপ করেছেন, বয়স্কদের ভোটাধিকার দিতে চলেছেন এবং মনোনয়ন মারফত নির্বাচনকে বাতিল করেছেন। আবার আমি বলছি, এর তাৎপর্য কেবলমাত্র বোম্বাই শহরের কাছেই নেই, সারা ভারতের কাছেও আছে এবং সম্ভবতঃ ভারতের মত অবস্থাধীন অন্যান্য দেশের কাছেও আছে। আমি মনে করি, এই পরিবর্তন সূচনা করার জন্যে বর্তমান বোম্বাই সরকারকে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। আমরা সবাই আশা করি, অন্যান্য শহর, বিশেষতঃ ভারতের প্রধান

প্রধান শহরগুলি এই বিষয়ে বোম্বাইয়ের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং মনোনয়ন ব্যবস্থা বাতিল করে বয়স্ক-ভোটাধিকার প্রবর্তন করবে।

মেয়র মহাশয়, সমুদ্র-পরিবৃত বোম্বাই শহরের অবস্থান চমৎকার। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝখানে এই শহর অবস্থিত এবং বোম্বাইয়ের রাস্তাঘাট ইমারত—অন্ততঃপক্ষে সচ্ছল ও বর্ধিষ্ণু অংশের রাস্তাঘাট ইমারত—পৃথিবীর যে কোন শহরের সমগোত্রীয় হিসেবে তুলনীয়; কিন্তু তা এর একটি মাত্র দিক। আমরা ভুলতে পারি না এই শহরের দারিদ্র্যের কথা এবং যে সব বস্তিতে আমাদের গরীব দেশবাসীদের বাস করতে হয় তার কথা। অতএব, আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে যে অংশ দরিদ্রতর এবং কম ভাগ্যবান তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান দেশবন্ধু সি. আর. দাশ একদা বলেছিলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হওয়া উচিত সেই প্রতিষ্ঠানকে গরীবের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং কলিকাতার মেয়ররূপে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি দরিদ্রসেবার এক কর্মসূচী উপস্থাপন করেন। অনেক দিক থেকে কর্মসূচীটি আদর্শ কর্মসূচী ছিল এবং কলিকাতা করপোরেশনকেও পরোক্ষভাবে অন্যান্য পৌরসংস্থাকেও তা অনুপ্রাণিত করে। আমি মনে করি, অমাদের পৌরসংস্থাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে গরীবের প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করতে হলে আমাদের এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। বহু কাজ করার আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে দরকার দরিদ্রসেবার প্রেরণা, উৎসাহ ও অনুরাগ। এই উৎসাহ ও অনুরাগ চালকশক্তি হয়ে আমাদের সেবার পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে এবং পৌরসংস্থাগুলিকে দরিদ্রের করপোরেশনে পর্যবসিত করতে আমাদের সহায়ক হবে। মহাশয়, এই বোম্বাই শহরে আপনারা অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, অনেক কিছু করেছেন। শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনারা যা করেছেন তা বোম্বাই শহরবাসীদের অশেষ উপকার সাধন করেছে এবং অন্যত্র যাঁদের উপর পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব আছে

তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আশা করি, আপনারা এরই মধ্যে যা করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন না এবং আপনাদের মিউনিসিপাল করপোরেশনকে আদর্শ সংস্থায় পরিণত করার জন্য আপনারা দ্রুত সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবেন।

পৃথিবীর সর্বত্র পৌর প্রগতি যে লক্ষ্যের দিকে চলেছে তাকে বলা যেতে পারে মিউনিসিপাল বা পৌর সমাজতন্ত্র। "সমাজতন্ত্র" এমন একটি কথা যা অনেকের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কী করতে চায়, এবং বিশেষ করে পৌর সমাজ-তন্ত্রের উদ্দেশ্য কী তা যদি আমরা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কথাটা থেকে দূরে থাকার কোন কারণ থাকে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা পৌর সমাজতন্ত্রের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। আজকের দিনে একালের প্রত্যেক মিউনিসিপালিটি এমন অনেক দায়িত্ব বহন করছে, বিশ বা ত্রিশ বৎসর আগে যা চিন্তার অতীত ছিল। বলা যেতে পারে, এই সব সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্বের ক্ষেত্র দিনে দিনে প্রসার লাভ করছে। আজকালকার মিউনিসিপালিটিকে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, আলো ইত্যাদিরই ব্যবস্থা করতে হয় না, তাকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় এবং শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিসমস্যা, জলনিকাশ ও অনুরূপ যে সকল সমস্যার দায় তার উপর থাকে সে সব সম্পর্কে কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত মিউনিসিপালিটিগুলিকে চিন্তা করতে হত না। ভবিষ্যতে কোথায় যে সীমারেখা টানবেন বলা দুষ্কর। আপনারা হয়তো জানেন বার্মিংহাম মিউনিসিপালিটির জন্য একটি মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক আছে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে এমন মিউনিসিপালিটি আছে যারা যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, কয়েক দশক আগে তা কেউ শোনেনি এবং চিন্তার অতীত ছিল। এই কারণেই আমি বলছি আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পৌর সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পৌর সমাজতন্ত্র সমগ্র সম্প্রদায়ের সেবার জন্য সামগ্রিক প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের এই লক্ষ্য স্থির রেখে আমরা যদি

আমাদের করণীয় কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং সন্তোষজনকভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করি তাহলে আমরা কেবল আমাদের শহরগুলিকেই সেবা করব না, মানবতার আদর্শকেও সেবা করব। আমরা, যারা পৌর বিষয়ে আগ্রহী, আমরা কেবল নিজেদের মিউনিসিপালিটিগুলি থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করি না। আমরা ইওরোপে, আমেরিকায়, সুদূর প্রাচ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে সেখানকার পৌর সমস্যা সম্পর্কিত সংবাদ আহরণ করি ও বইপত্র পাঠ করি যাতে আমরা আরও দক্ষতার সঙ্গে ও সন্তোষজনকভাবে আমাদের শহরগুলিতে কাজ করে যেতে পারি। এই কারণেই আমি বিশেষ-ভাবে বলেছি যে, আপনারা বোম্বাই শহরে যা করতে পেরেছেন তা কেবল আপনাদের নাগরিক ভ্রাতাদের জন্যই করেননি, তার আরও ব্যাপক তাৎপর্য আছে।

পৌর সংস্থাগুলিতে যোগদান করে আমরা যে সকল সুযোগ পাই, যেমন পৌর সেবার সুযোগ, তাছাড়াও এই সংস্রবের ফলে আমরা সুনিশ্চিতভাবে একদিক থেকে লাভবান হতে পারি। তা এই, এই সংস্থাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের কাজ জনজীবনের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপকতর কর্তব্য পালনের জন্য যোগ্য করে তোলে। যতদূর মনে হয় ইংলণ্ডের রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের অন্যতম ব্রাইস বলেছিলেন, গণতন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষালয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। প্রফেসার লাস্কি ও আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করেন এবং পৌর বিষয়ে যাঁরা ছাত্র, আজ তাঁরা বোধ করছেন যে গণতন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষালয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। অতএব স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে আমরা দু রকমের সুবিধা অর্জন করি।

একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। বিদেশীদের কাছ থেকে প্রায়শঃই আমরা শুনতে পাই, এদেশে সামাজিক অগ্রগতির অন্যান্য প্রয়াসের মত পৌর উন্নয়নও পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ফল এবং ইওরোপের সঙ্গে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব হবার আগে পৌর-জীবনের অগ্রগতির দিকে যা

হয়েছিল তা যৎসামান্য। মহাশয়, এই অভিযোগ যে একেবারে মিথ্যা, এই সুযোগে আমি তা বলতে চাই। পৌর-প্রগতির ক্ষেত্রে আমরা শূন্য থেকে কিছু তৈরি করছি না, আমরা গড়ে তুলছি সুপ্রাচীন এক ভিত্তির উপর। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেও আমরা যেমন অতি প্রাচীন ভিত্তির উপর নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলছি, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষেত্রেও আমরা একই কাজ করে চলেছি। মহেঞ্জোদাড়োর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন এই প্রাচীন দেশে আমাদের পূর্বপুরুষরা পৌর-জীবনের কোন্ উচ্চ স্তরে উপনীত হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এবং মহেঞ্জোদাড়ো যুগের পরে যদি আপনারা মৌর্য সাম্রাজ্যে আসেন এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের বর্ণনা ও পুঁথিপত্র পাঠ করেন, আপনারা তাহলে দেখতে পাবেন, শহর পাটলিপুত্র কেবলমাত্র উন্নতির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছয়নি, শহরের পৌর-শাসনের উপর ছিল অনেক দায়িত্বভার, যার সঙ্গে আধুনিক যে কোন মিউনিসিপালিটির দায়িত্বের ভালমত তুলনা করা যেতে পারে। মেয়র এবং অন্যান্য আধুনিক পৌরবিষয়ক পরিভাষার মত প্রতিশব্দ আপনারা আমাদের প্রাচীন ভাষায় পাবেন। এককালে সেগুলির চল ছিল। তারপরে এল ভারত-ইতিহাসে যাকে বলা যেতে পারে অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার যুগে কেবলমাত্র পৌর-প্রগতিই প্রতিহত হল না, জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগও পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু এই অন্ধকার যুগের জন্য এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে, তার পূর্বে আমরা পৌর-বিষয়ে কোন উন্নতি লাভ করিনি। আমাদের দেশবাসীকে এই সব কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে, যেহেতু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুগ যুগ ব্যাপী দাসত্বের ফলে আমরা আমাদের নিজেদের অতীতের কথা ভুলে গেছি। আমাদের নিজেদের পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে গবেষণা করে আমাদের কাছে আমাদের নিজেদের যে বিস্মৃত অতীতকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, কেবলমাত্র তারই কল্যাণে আমরা এখন জানতে পারছি আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৌর-জীবনের ক্ষেত্রে

এককালে কী উন্নতি সাধন করেছিলেন। অতএব এ কথা আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে পৌর-প্রগতির দিক থেকে আমরা প্রাচীন ভিত্তির উপরেই নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলছি। এই তথ্য, আশা করি, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

মহাশয়, আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে বলে ভেবেছিলাম। ভয় হচ্ছে, তা একটা দীর্ঘ উপদেশের আকার নিয়েছে। উপদেশবাণী দেবার ইচ্ছা মোটেই আমার ছিল না। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম একটিমাত্র ইচ্ছা নিয়ে, আপনারা আমাকে যে বিপুল সম্মানে ভূষিত করেছেন, যে সম্মান, আমি মেনে নিচ্ছি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই প্রাপ্য, যার আমি সামান্য সেবক মাত্র, সেই সম্মানের জন্য আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রথমতঃ আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। সর্বান্তঃকরণে আমি আশা করব আপনার এই শহর দিনে দিনে পৌর-জীবনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করুক এবং এদেশের ও বিদেশের অন্যান্য পৌরসংস্থার কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে দুরূহ দায়িত্ব পালনে আপনি এবং আপনার করপোরেশন সাফল্য লাভ করুন, এই কামনা করি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

বসু-জিন্না পত্রালাপ

(মে-ডিসেম্বর ১৯৩৮)

১৪ই মে, ১৯৩৮, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এই লিপিটি মিঃ এম. এ. জিন্নাকে দেওয়া হয়েছিল।

গোপনীয়

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জিন্নার মধ্যে আলোচনার সময় মিস্টার জিন্না প্রস্তাব করেন যে, যদি কোন ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়, তা পৌঁছতে হবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের অবস্থা সম্যক উপলব্ধির ভিত্তিতেই। তিনি প্রস্তাব করেন নিম্নলিখিত ধারায় কথাবার্তা চালানো উচিত :

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় ও প্রামাণিক সংগঠন হিসাবে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমতাবলম্বী সুসংহত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ও প্রামাণিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস দুইটি প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য এবং হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মোকাবিলার জন্য এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত শর্তসমূহ মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

পুনর্বিবেচনার পর কিছুটা ভিন্ন বয়ান তিনি প্রস্তাব করেন, তা এই :

কংগ্রেস এবং ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রামাণিক সংগঠন অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ একটি চুক্তির মারফত হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত শর্তসমূহ মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংশোধনটি যদিও আরও সংক্ষিপ্ত, এতে যা বলা হয়েছে তা বাহ্যতঃ প্রথমেরই পুনরুক্তি—অর্থাৎ কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের।

কংগ্রেসের পক্ষে একটিমাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নিজেকে ভাবা সম্ভব নয় বা সেইভাবে কাজ করে যাওয়াও সম্ভব নয়, সেই সম্প্রদায় ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি হয় তবুও। সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য এর দরজা খুলে রাখতে হবে এবং এর সাধারণ নীতি ও পদ্ধতির প্রতি সমর্থন আছে এমন ভারতীয়মাত্রকে এই প্রতিষ্ঠান স্বাগত জানাবে। একটিমাত্র সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করার মত অবস্থা কংগ্রেস মেনে নিতে পারে না এবং তার ফলে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হতে পারে না। একই কালে অন্যান্য যে সকল সংগঠন সংখ্যালঘু স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে এবং সহযোগিতা করতে কংগ্রেস পুরোপুরি আগ্রহী।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, ভারতের মুসলমানেরা সমগ্র দেশের মধ্যে যদিও সংখ্যালঘু, তবুও তারা জনসংখ্যার অনেকখানি অংশই দখল করে আছে এবং ভারত সম্পর্কিত যে কোন পরিকল্পনায় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিশ্চয় বিবেচনা করতে হবে। এ কথাও সত্য যে, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ এমন একটি সংগঠন যেখানে মুসলমানদের বিরাট অংশের মত প্রতিফলিত। এই দিকটিও গ্রাহ্য করতে হবে। এই কারণেই কংগ্রেস লীগের মনোভাব বোঝবার প্রচেষ্টা করেছে এবং তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেয়েছে। অন্যান্য যে সকল মুসলমান সংগঠন অতীতে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে তাদের সঙ্গে কংগ্রেসকে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য দল বা সংখ্যালঘুর স্বার্থ জড়িত থাকলে এই সব স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও পরামর্শ করার প্রয়োজন হবে।

২৬ মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই
১৫ই মে, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

গত রাত্রে আমাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা সমেত একটি লিপি আপনাকে দিই। আপনি জানতে চেয়েছিলেন গঠনমূলক কী কী প্রস্তাব আমাদের দেবার আছে। আমি মনে করি, লিপিটিতে তার ব্যাখ্যা আছে। আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া কী তা জানবার পর, এখন, আমাদের মতে পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হওয়া বাকি, যথা, নিজ নিজ কমিটি নিয়োগ, যারা মিলিতভাবে নিষ্পত্তির শর্ত নির্ণয় করতে পারবে।

বশংবদ
সুভাষচন্দ্র বসু

লিট্ল্ গিব্স রোড
মালাবার হিল, বোম্বাই
১৬ই মে, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

কংগ্রেসের পক্ষে আপনি ১৪ই যে লিপি আমাকে দিয়াছিলেন আমি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আপনার ১৯৩৮-এর ১৫ই মে তারিখের পত্রেরও প্রাপ্তি এতৎসহ স্বীকার করিতেছি। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্‌সিকিউটিভ্ কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় বিষয়টি উপস্থাপিত হইবে এবং সভার সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব শীঘ্র আপনাকে জানানো হইবে।

বশংবদ
এম. এ. জিন্না

৬ই জুন, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

১৯৩৮ সালের ১৫ই মে তারিখে কংগ্রেসের তরফ হইতে যে লিপি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন সেই বিষয়ে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্‌সিকিউটিভ্‌ কাউন্সিল কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত অভিমত কথামত আমি এতৎসহ পাঠাইতেছি।

বশংবদ

এম. এ. জিন্না

১নং প্রস্তাব

১৯৩৮ সালের ১৪ই মে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট মিস্টার জিন্নাকে কংগ্রেসের তরফ হইতে উহার প্রেসিডেণ্ট মিস্টার সুভাষচন্দ্র বোস যে লিপি প্রদান করিয়াছেন তাহা, এবং ১৫ই মে তারিখে তাঁহার লিখিত পত্র, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্‌সি-কিউটিভ্‌ কমিটি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের প্রামাণিক ও প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন একমাত্র এই ভিত্তিতে ছাড়া কংগ্রেসের সহিত হিন্দু-মুসলিম মীমাংসার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা বা কংগ্রেসের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করা কখনই সম্ভব নয়।

২নং প্রস্তাব

১৯৩৮ সালের ২২শে মে তারিখে লিখিত মিস্টার গান্ধীর পত্রও কাউন্সিল বিবেচনা করিয়াছে এবং এই অভিমত পোষণ করে যে, কংগ্রেস কর্তৃক যে কমিটি নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে কোন মুসলিম তাহার অন্তর্ভুক্ত হউক, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়।

৩নং প্রস্তাব

এক্‌সিকিউটিভ্ কাউন্সিল ইহা স্পষ্টভাবে জানাইতে চায় যে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের ইহা বিঘোষিত নীতি যে, যাহাতে অপরাপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্ট হয় এবং যাহাতে তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করা যায় সেইজন্য তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা,উচিত এবং অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রয়োজন অনুযায়ী এবম্প্রকার সংখ্যালঘু ও সংসৃষ্ট অপর কোন স্বার্থের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিবে।

১৯৩৮ সালের ২১শে জুন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মিস্টার জিন্নাকে নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠানো হয়:

গতকাল ফিরিয়াছি। পত্র পাইলাম। ধন্যবাদ। প্রাপ্তিস্বীকারের বিলম্বে দুঃখিত।—

সুভাষ বসু

৩৮।২ এলগিন রোড, কলিকাতা
২৭শে জুন, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

মুসলিম লীগের এক্‌সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের প্রস্তাব সম্বলিত আপনার ৬ তারিখের পত্র যথাকালে কলিকাতায় পৌঁছিয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমি বাইরে ছিলাম, ২০ তারিখে ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আমার হস্তগত হয়নি। আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে পরের দিনই আমি তারবার্তা পাঠাই।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আগামী ৯ই জুলাই ওয়ার্ধায় মিলিত হবে। আপনার পত্র এবং মুসলিম লীগের প্রস্তাবসমূহ কমিটির কাছে উপস্থাপিত হবে এবং আমি তারপর যত শীঘ্র সম্ভব কমিটির সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাব। আমি ওয়ার্ধায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সদ্য ফিরেছি।

বশংবদ
সুভাষচন্দ্র বসু

ওয়ার্ধা
২৫শে জুলাই, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

আপনি ১৯৩৮ সালের ৬ই জুনের পত্রের সঙ্গে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের যে প্রস্তাবগুলি অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটি যতটা সম্ভব গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা প্রণিধান করেছে। লীগ কাউন্সিলের প্রথম প্রস্তাবে লীগের অধিকার নিরূপিত হয়েছে। যদি তার অর্থ এই হয় যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মীমাংসার শর্ত বিবেচনার জন্য আমরা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বেই কংগ্রেসকে উক্ত প্রস্তাবে বর্ণিত অধিকার স্বীকার করতে হবে, তাহলে তাতে স্পষ্টতঃই অসুবিধা দেখা দেবে। যদিও প্রস্তাবটিতে "কেবলমাত্র" বিশেষণ ব্যবহার করা হয়নি, প্রস্তাবের ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিশেষণটি উহ্য আছে। ইতিমধ্যেই লীগের একচ্ছত্র অধিকার যাতে স্বীকার না করা হয় সেই মর্মে ওয়ার্কিং কমিটিকে অনেকে সতর্ক করেছে। একাধিক এমন মুসলিম সংগঠন আছে মুসলিম লীগ থেকে স্বতন্ত্রভাবে যারা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কোন কোনটি কংগ্রেসের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। উপরন্তু এমন অনেক মুসলিম ব্যক্তি আছেন যাঁরা কংগ্রেসী এবং দেশে তাঁদের কারও কারও প্রভাব কম নয়। অতঃপর সীমান্ত প্রদেশের কথা উল্লেখ করতে হয়, সেখানে বিপুল-ভাবে মুসলিম সংখ্যাধিক্য অথচ তাঁরা পুরোমাত্রায় কংগ্রেস সমর্থক। আপনি বুঝুন, এইসব সুবিদিত তথ্য যখন রয়েছে তখন লীগ কাউন্সিলের প্রথম প্রস্তাব আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেসের নিকট যে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে, তা কংগ্রেসের পক্ষে প্রদান করা কেবল অসম্ভবই নয়, অযৌক্তিকও বটে। নিবেদন এই যে, কোন সংগঠনের অধিকার সেই অধিকার নিরূপিত করার ফলেই অর্জিত হয় না। তা আসে সেবা দ্বারা, যে সেবায় কোন সংগঠন সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। এতএব ওয়ার্কিং কমিটি আশা করে যে লীগ কাউন্সিল কংগ্রেসকে অসম্ভব কিছু করতে বলবে না। এ কি যথেষ্ট নয় যে, লীগের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ

সম্বন্ধ স্থাপন করতে এবং হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মত বহুবিতর্কিত প্রশ্নে সম্মানজনক একটি মীমাংসায় উপনীত হতে কংগ্রেস কেবলমাত্র ইচ্ছুক নয়, আগ্রহীও বটে। এই পর্যায়ে কংগ্রেসের দাবি কী, তাও হয়তো বলে রাখা ভাল। যদিও অগণিত কংগ্রেস সদস্যদের তালিকায় সর্বাধিক সংখ্যক নাম যাদের তারা হিন্দু, এ কথা মেনে নিলেও বহুসংখ্যক মুসলিম এবং বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত। যে সকল সম্প্রদায়, জাতি ও শ্রেণীর বাসভূমি এই ভারত, তাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব করা কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য। সূত্রপাত থেকে এই সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রায়ই অধিষ্ঠিত থেকেছেন প্রখ্যাত মুসলিমরা এবং তাঁরা কংগ্রেসের ও দেশের বিশ্বাসও অর্জন করেছেন। কংগ্রেস ঐতিহ্য বলে যে, যদিও কংগ্রেস সদস্য যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং যাতে তিনি লালিত হন তার থেকে সম্বন্ধচ্যুত হন না, ধর্মবিশ্বাসের বলে কেউ কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হন না। কংগ্রেসের রাজনৈতিক নীতি ও পদ্ধতিকে সমর্থন করেন বলেই তিনি অন্তরে বাহিরে কংগ্রেসী। অতএব কংগ্রেস কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। বস্তুতঃপক্ষে কংগ্রেস সর্বদা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে এসেছে কারণ বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথে তা অন্তরায়।

কিন্তু কংগ্রেস যদিও এই দাবি করে এবং কম-বেশি সাফল্যের সঙ্গে তদনুযায়ী চলতে সচেষ্ট, তবু ওয়ার্কিং কমিটি আনন্দিত হবে যদি আপনার কাউন্সিল কংগ্রেসের সঙ্গে এমন একটা বোঝাপড়ায় আসে যাতে আমরা জাতীয় অখণ্ডতা অর্জন করতে পারি এবং একই ভবিতব্যের জন্য সর্বান্তঃকরণে কাজ করে যেতে পারি।

কাউন্সিলের দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কুণ্ঠার সঙ্গে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে, তাতে যে অভিপ্রায় অভিব্যক্ত তা মেনে নেওয়া ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে সম্ভব নয়।

তৃতীয় প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটি বুঝতে অক্ষম। ওয়ার্কিং কমিটির দিক থেকে মুসলিম লীগ একটি বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক সংগঠন এই অর্থে

যে, তা মুসলিম স্বার্থেরই সেবা করে বলে মনে হয় এবং তার সভ্যপদও কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্যই উন্মুক্ত। ওয়ার্কিং কমিটিও বরাবর এইটেই বুঝে আসছে যে, লীগের যা স্বার্থ তাতে লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা চায় এবং তা ন্যায্যভাবেই চায়, তাতে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশ্ন জড়িত নেই। যদি অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে থাকে, কংগ্রেস নিজের দিক থেকে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বদা প্রস্তুত ; তার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতিধর্মনির্বিশেষে যেহেতু তা সর্বভারতের প্রতিনিধি সেইহেতু তা করা তার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

আশা করি যা বলা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মীমাসংয়া উপনীত হবার জন্য আমাদের আলাপ-আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে।

যেহেতু পূর্ববর্তী পত্রাবলী আগেই প্রকাশ করা হয়েছে, জনসাধারণকে এ বিষয়ে জানানো মনে হয় সুবিবেচনাসম্মত। অতএব আমাদের মধ্যে পরবর্তী যে পত্রবিনিময় হয়েছে তা প্রকাশ করবার প্রস্তাব করছি। আপনি সম্মত হলে, এই পত্রাবলী সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

বশংবদ

এস. সি. বোস

মালাবার হিল, বোম্বাই,

২রা আগস্ট, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

আমি আপনার ২৫শে জুলাই, ১৯৩৮ তারিখের পত্র অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এক্‌সিকিউটিভ্‌ কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত করিয়াছি।

আপনার নিকট ইতিপূর্বে প্রেরিত ১নং প্রস্তাবে যে অধিকারের দাবি করা হইয়াছিল তাহা হইতে এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলকে নিরস্ত হইতে আপনার পত্রে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন কাউন্সিল তাহা গভীরভাবে প্রণিধান করিয়াছে এবং সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছে।

আমাকে ইহা জানাইতে বলা হইয়াছে যে, স্বীকৃতি পাইবার কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কাউন্সিল তাহার অধিকার নিরূপণ করে নাই, যাহা গৃহীত সত্য কেবলমাত্র তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছে।

কাউন্সিল দৃঢ়নিশ্চিত যে মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রামাণিক ও প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে যখন কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হয এবং তদবধি ১৯৩৫ সালে জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনা চলাকালীনও ইহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় নাই। অতএব অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের পক্ষে কংগ্রেসের স্বীকৃতি বা অনুমোদন কিছুরই প্রয়োজন নাই, সেইমত বোম্বাইয়ে এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহারও সেই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেহেতু লীগের অবস্থা—বস্তুতঃপক্ষে লীগের অস্তিত্ব সম্পর্কে তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার এক বিবৃতিতে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তিনি দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, দেশে মাত্র দুইটি দল আছে, যথা, ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস, অতএব কিসের উপর ভিত্তি করিয়া এই দুইটি সংগঠনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে পারে তৎসম্পর্কে কংগ্রেসকে জানানো এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিল।

তাহা ছাড়া কংগ্রেস যে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আলোচনা চালাইতে মুসলিম লীগের দ্বারস্থ হইয়াছিল, ইহাতেই লীগের প্রামাণিক ও প্রতিনিধিমূলক চরিত্র স্বীকৃত এবং সেই সূত্রে ভারতের মুসলমানদের পক্ষে লীগের চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকারও স্বীকৃত।

কাউন্সিলের ইহা জানা আছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কোআলিশন সরকার গঠিত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনেও কিছু কিছু মুসলমান আছে। কিন্তু কাউন্সিলের অভিমত এই যে কংগ্রেসের এই মুসলিমরা ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি নহে এবং হইতেও পারে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য এবং কংগ্রেসের সদস্যরূপে তাহারা মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা কহিবার বা প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার হারাইয়াছে। ইহা যদি না হইত, কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে আপনার পত্রে যাহা কিছু দাবি করিয়াছেন সবই ভূমিসাৎ হইয়া যাইত।

"অপরাপর মুসলিম সংগঠন" সম্পর্কে, যাহাদের কথা আপনার পত্রে আছে অথচ যাহাদের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই, কাউন্সিল মনে করে তাহাদের সম্পর্কে কোন উল্লেখ না করাই অধিকতর সমুচিত হইত। ভারতের মুসলমানদের পক্ষে তাহাদের মিলিতভাবে বা এককভাবে কথা কহিবার মত অবস্থা যদি থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং মিস্টার গান্ধী মুসলিম লীগের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেন না।

মুসলিম লীগ সম্পর্কে যতটুকু বলা যায়, ইহার জানা নাই আর কোন মুসলিম সংগঠন ভারতের মুসলিমদের পক্ষে কথা কহিবার বা আলাপ-আলোচনা চালাইবার দাবি কখনও করিয়াছে। অতএব ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আপনি এই প্রসঙ্গে "অপরাপর মুসলিম সংগঠনে"র কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

"বহুবিতর্কিত হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে"র একটি মীমাংসায় পৌঁছাইবার জন্য এবং তদ্দ্বারা একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া ত্বরান্বিত করিবার জন্য কাউন্সিলও সমান আগ্রহী। কিন্তু বেদনার সহিত লক্ষ্য করা যাইতেছে, মূল বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়া আলাপ-আলোচনার অগ্রগতিকে প্রতিহত করিবার জন্য সুবিধামত যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইতেছে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল বিশেষ করিয়া ইহাই জানাইতে চায় যে, কংগ্রেস কর্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হইবার কথা আছে মুসলমানদের তাহার অন্তর্ভুক্ত করা কাউন্সিল বাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচনা করে না। যেহেতু সেই কমিটির সভ্যগণ হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা ও সমাধানের জন্য মিলিত হইবেন, অতএব সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিক হইতেই তাঁহারা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহারও বিশ্বাসভাজন হইবেন না এবং তাঁহাদের অবস্থা হইবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। অতএব কাউন্সিল উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছে।

তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে, ১৯৩৮-এর ১৫ই মে তারিখের আপনার পত্রে যে কনফারেন্সের উল্লেখ ছিল ইহা তাহারই স্মারকলিপি। তাহাতে অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উল্লেখ ছিল এবং মুসলিম লীগ তাহার বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী আবশ্যক হইলে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।

এই পত্র সহ পত্রাবলী প্রকাশ করিবার যে অভিপ্রায় আপনি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে কাউন্সিলের কোন আপত্তি নাই।

বশংবদ
এম. এ. জিন্না

৩৮।২ এলগিন রোড, কলিকাতা
১৬ই আগস্ট, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

আপনার ২রা আগস্ট, ১৯৩৮-এর পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। উত্তর দিতে বিলম্বের জন্য আমি দুঃখিত। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী সভায় আপনার পত্রটি পেশ করতে ইচ্ছা করি। তারপরে আপনি আমার কাছ থেকে আবার সংবাদ পাবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন।

বশংবদ
সুভাষচন্দ্র বসু

দিল্লী

২রা অক্টোবর, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

আপনার ২রা আগস্ট, ১৯৩৮-এর পত্র ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করা হয়েছে। যথোচিত বিচার-বিবেচনার পর কমিটি নিম্নলিখিত উত্তর দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

যদিও আপনার পত্রে ভুলত্রুটি আছে, তার উল্লেখে কোনই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আপনার পত্রের সারমর্ম মনে হয় এই যে, লীগ প্রত্যাশা করে না ভারতের প্রামাণিক মুসলিম সংগঠন হিসাবে তার অধিকার কংগ্রেস পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নেবে। যদি লীগ এই অভিমত পোষণ করে, আমাকে তদুত্তরে এই কথা বলতে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, লীগ যে কমিটি নিযুক্ত করবে ওয়ার্কিং কমিটি মীমাংসার শর্তাবলী স্থির করবার জন্য তার সঙ্গে আলোচনা করবে। কনফারেন্সের সভায় ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য থাকবে।

যেহেতু পূর্বেকার পত্রাবলী প্রকাশের জন্য আগেই পাঠানো হয়েছে, এই পত্রটিরও প্রকাশের স্বাধীনতা গ্রহণ করছি।

বশংবদ

সুভাষচন্দ্র বসু

করাচি

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৮

প্রিয় মিস্টার বোস,

আমি আপনার ২রা অক্টোবর তারিখের পত্র পাইয়াছি। তাহা লীগের এক্‌সিকিউটিভ্‌ কাউন্সিলের সমক্ষে পেশ করা হইয়াছিল। উত্তরে আমাকে ইহা বলিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে যে, এক্‌সিকিউটিভ্‌ কাউন্সিল অত্যন্ত দুঃখিত যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং

কমিটি আমার ২রা আগস্টের পত্র সম্পূর্ণভাবে ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছে, অথচ তাহা খুবই স্পষ্ট ছিল এবং তাহা আরও ব্যাখ্যা করিবার বা আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল না। আমার উল্লিখিত পত্রে যে ভিত্তি নিরূপিত হইয়াছে সেই ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইতে মুসলিম লীগ এখনও প্রস্তুত এবং আপনার নিকট ইতোপূর্বে প্রেরিত ৫ই জুন তারিখের তিনটি প্রস্তাবে আমাদের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহারই ভিত্তিতে কংগ্রেস যে কমিটি নিযুক্ত করিবে তাহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য লীগ নিজস্ব প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করিবে।

বশংবদ

এম, এ. জিন্না

১৯৩৮-এর ১১ই হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় মিস্টার জিন্নার ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৮-এর পত্র বিবেচিত হয় এবং কমিটি প্রেসিডেন্টকে মিস্টার জিন্নার নিকট নিম্নলিখিত মর্মে পত্রাদি বিনিময়ের সমাপ্তিসূচক পত্র লেখবার অধিকার প্রদান করে :

প্রিয় মিস্টার জিন্না,

ওয়ার্কিং কমিটি আপনার ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৮-এর পত্র বিবেচনা করেছে এবং তাতে যে সিদ্ধান্ত আছে তা পাঠ করে ক্ষুব্ধ হয়েছে। যেহেতু কমিটি আলাপ-আলোচনার ভিত্তি সম্পর্কে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভবপর বলে মনে করে না এবং যেহেতু কাউন্সিলের মতে ভিত্তি সম্পর্কে ঐকমত্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে কোন আলোচনার পূর্বশর্ত, ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে লীগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে অধিকতর কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্বের দরুন আমি দুঃখিত, তবে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিষয়টি বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনি।

যেহেতু পূর্বেকার পত্রাবলী আগেই প্রকাশিত হয়েছে, এই পত্রটিও প্রকাশ করার স্বাধীনতা গ্রহণ করছি।

বশংবদ

সুভাষচন্দ্র বসু

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রসঙ্গে

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর নেতাজীর প্রথম বিবৃতি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে তুমুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিবৃতিটি করা হয় ওই বিষয়ে তাঁর মূল বক্তব্যের সপক্ষে।

১

৯ই জুলাই, ১৯৩৮

মাঝে মাঝে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিবৃতি বা বক্রোক্তি প্রকাশিত হচ্ছে যার মর্ম এই যে, কংগ্রেসের কিছু কিছু প্রভাবশালী নেতা ভারত সরকার আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উল্লেখ আছে তাই নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস, শেষ যে বিবৃতিটি আমার চোখে পড়ে তা ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েনের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। যখন কোন প্রমাণ নেই,

আমি বিশ্বাস করি না এবং বিশ্বাস করতেও পারি না যে, কোন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা কংগ্রেসের পশ্চাতে আপসে পৌঁছবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ কথা আমি বলতে চাই যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কোন মিল নেই এবং প্রদেশগুলিতে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকে কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করার পক্ষে পদক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো চাপিয়ে দেবার যে কোন প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তা সফল হয়, তার ফলে কংগ্রেস ভেঙে যাবে, কারণ আমি বুঝি না কি করে যারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী তারা তা মাথা নত করে মেনে নেবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ভারতের ইতিহাসের এই গুরুতর মুহূর্তে কংগ্রেস বা কংগ্রেসের কোন অংশ যদি দুর্বলতা প্রদর্শন করে, তাহলে তা ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের বিশ্বাস-ঘাতকতা বলে পরিগণিত হবে। আজ সর্বদিক থেকে এমন সুবিধা-জনক অবস্থায় আমরা রয়েছি যে আমরা যদি কেবল মিলিত হয়ে সমস্বরে নিজেদের কথা বলতে পারি তাহলে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আমাদের জাতীয় দাবির সবটাই আদায় করে নিতে সক্ষম হব। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আমাদের মনোভাবে সামান্যতম দুর্বলতা দেখা দিলে আমাদের তা দুর্বল করতে ও ব্রিটিশ সরকারকে সবল করতে বাধ্য।

আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি, যদি সেই অভাবনীয় অবস্থা দেখা দেয় যখন কংগ্রেসের সংখ্যাধিক সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেনে নেবে, সম্ভবতঃ তখন আমার কর্তব্য হবে পদাধিকারের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করা, যাতে আমি আমার মতে দেশের যা সর্বাধিক স্বার্থসঙ্গত,—যথা, উৎকট যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর খোলাখুলি, আপসহীন, ক্ষান্তিহীন বিরোধিতা—তার জন্য স্বাধীন-ভাবে কাজ করে যেতে পারি।

২

১৫ই জুলাই, ১৯৩৮

এই বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রের বাদপ্রতিবাদে অংশ নেওয়া আমার ইচ্ছাও নয়, কর্তব্যও নয়। যা করা আমি কর্তব্য বোধ করেছি আমি তাই করেছি, যথা, ১৯৩৫-এর ভারত-সরকার আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলা আছে তার প্রতি কংগ্রেসের যা মনোভাব সেই বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ৯ই জুলাই আমি যে বিবৃতি প্রচার করি তা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের যা অভিমত তার দৃঢ় পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সুস্পষ্টভাবে সেই অভিমতই ব্যক্ত করে এবং পরে গত ফেব্রুয়ারিতে, হরিপুরা কংগ্রেস সেই অভিমতকেই দৃঢভাবে সমর্থন করে।

সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ :

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে তাহাদের যৎপরোনাস্তি ধিক্কার ও সম্পূর্ণ বিরোধিতা পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছে এবং তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর যাবতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে প্রতিরোধ করার সংকল্পও ব্যক্ত করিতেছে। সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত জাতির অভিপ্রায় সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের কোন প্রয়াস ভারতের জনগণের নিকট যুদ্ধ-আহ্বানের সামিল হইবে। অতএব কমিটি প্রাদেশিক স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, তৎসহ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ও তাহাদের মন্ত্রিমণ্ডলীকে আহ্বান জানাইতেছে, তাঁহারা যেন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা, যাহা ভারতের সমূহ ক্ষতিসাধন করিবে এবং যাহা সাম্রাজ্যবাদী

আধিপত্য ও প্রতিক্রিয়ার অধীনে ভারতকে আবদ্ধ রাখিবার বন্ধন দৃঢ়তর করিবে, তাহা প্রবর্তনে বাধাদান করেন। কমিটি এই অভিমত পোষণ করে যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি যেন তাহাদের আইনসভাগুলিকে আবেদন করে, তাহারা যেন প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি এই বিরোধিতা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্ত করে এবং স্ব স্ব প্রদেশে তাহা প্রবর্তন না করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে যেন জানাইয়া দেয়।

অতএব কংগ্রেস প্রস্তাবিত যুক্ত কাঠামোর প্রতি তাহার ধিক্কার পুনরায় জ্ঞাপন করিতেছে এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, সেইসঙ্গে প্রাদেশিক সরকার ও মন্ত্রিমণ্ডলীকে ইহার প্রবর্তন প্রতিহত করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। জনসাধারণের বিঘোষিত অভিপ্রায় সত্ত্বেও ইহা চাপাইয়া দিবার প্রচেষ্টা করা হইলে, এই-প্রকার প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করা হইবে, এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি ও মন্ত্রিসভাগুলি তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে অবশ্যই অস্বীকার করিবে। এইপ্রকার অবস্থার উদ্ভব হইলে, এমতাবস্থায় কী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর অধিকার ন্যস্ত করা হইতেছে এবং কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

৯ই জুলাই তারিখে আমার বিবৃতিটি প্রচার করবার আগে আমার কাছে সংবাদ আসে যে, ব্রিটিশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনুকূলে কংগ্রেস সদস্যদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা করছে। অতএব হরিপুরা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী এই কূট অপপ্রয়াসকে যতশীঘ্র সম্ভব বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। যদি আমি তা না করতাম, আমি আমার পদের যথার্থ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতাম।

আমি বৈধভাবে দাবি করতে পারি, আমার বিবৃতির মূলে ছিল হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যবোধ। যদি আমি কঠিন ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করে থাকি, অংশতঃ তার কারণ ওই প্রশ্নে

আমার মনোভাবও কঠিন এবং অংশতঃ কারণ যেহেতু কংগ্রেসের নিজস্ব মনোভাবও কঠিন, যথা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে "সম্পূর্ণ বিরোধিতা" এবং "সর্বাত্মক ধিকারে"র মনোভাব। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ কথা বলে রাখা দরকার যে, হরিপুরায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে দ্ব্যর্থবোধের কোন ক্ষেত্র নেই এবং কোন কংগ্রেস সদস্যের পক্ষে, যত উচ্চ পদেই তিনি অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, এই বিষয়ে কংগ্রেসের আপসহীন মনোভাবকে তুচ্ছ করা ও কংগ্রেসের অধিকারকে খর্ব করা তার এক্তিয়ার বহির্ভূত। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনের পর থেকে এমন কিছুই ঘটেনি যার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র সংশোধন আবশ্যক হতে পারে।

বিপরীতপক্ষে, এমন একটা অনুকূল দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিণতি ঘটেছে যাতে হরিপুরায় আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তাতে অটল থাকা আমাদের আরও বেশি কর্তব্য।

এইরকম বিবৃতি প্রচার করার আবশ্যকতা সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে, এই বিবৃতি প্রকাশের পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই সে সন্দেহ সমূলে দূর হওয়া উচিত। এবং কিছুকাল যদি আমরা ধৈর্য ধরে থাকতে পারি, আমার বিশ্বাস, আমার বিবৃতি যে একদিনও আগে প্রচার করা হয়নি তা শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারব।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো জোর করে আমাদের গলাধঃকরণের চেষ্টার সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে, যদিও এ কথা চিন্তাতীত যে কংগ্রেস তার পূর্ববর্তী মনোভাব কখনও অস্বীকার করবে, তবুও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পক্ষে আগে থেকে বুঝে রাখা ভালো, কোনপ্রকার অঘটনের ফলে অভাবিত এই অবস্থার যদি উদ্ভব হয় তখন কী হবে। কংগ্রেসের বর্তমান মতিগতির কথা বিবেচনা করলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে, কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করলে ওই সংস্থায় অনিবার্যভাবে গুরুতর একটা ভাঙন দেখা দেবে। আমরা যদি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ হই, পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ পরিণতির দিকে আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না এবং আমরা

এই আশাতেও নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে পারি না যে, সংখ্যাধিক সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে নিয়েছে বলে বিরুদ্ধমতাবলম্বী সংখ্যালঘু বিনা প্রতিবাদে তা স্বীকার করে নেবে।

আমার বিবৃতির উপর যা সমালোচনা হয়েছে তার কিছু কিছু আমাকে অবাক ও মর্মাহত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করা ছাড়া যাতে আর কিছুই নেই তাকে শাসানি বলে অভিহিত করা নিতান্তই অযৌক্তিক। আমার সম্পর্কে এ কথা বলাও সমান অযৌক্তিক যে, কংগ্রেস যদি তার পূর্ববর্তী মনোভাব বদলায় আমি তাহলে ওই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে আসব। যে কংগ্রেস আমার প্রাণবায়ুর মত, কোন কিছু কখনই আমাকে সেই কংগ্রেস ত্যাগ করাতে পারবে না। আমার বিবৃতি সম্পর্কে শেষ ও সমান অযৌক্তিক সমালোচনা এই যে, যদি আমি দেখি যে সংখ্যাধিক সদস্যরা এমন পদক্ষেপ নিতে চলেছে যা জাতীয় "হারাকিরি"র সামিল, সেই অবস্থাতেও পদত্যাগ করার স্বাধীনতা আমার থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে কংগ্রেস যদি গ্রহণ করে, তা রাজনৈতিক আত্মহত্যা থেকে কোন অংশে কম হবে না এবং যদি অভাবনীয় এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে সংখ্যাধিক সদস্যরা তা মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই আত্মনিধন যজ্ঞে আমিও যে যোগ দেব, যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন আশা কি করে করা যায়? পরিশেষে, আমার আশা, বিশ্বাস এবং কামনা, কংগ্রেস সদস্যদের দিক থেকে আমাদের জাতীয় দাবিকে হেয় করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটুক। দিল্লী ও হোয়াইট্‌ হলের দরবারে অবাঞ্ছিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কিত সংশোধন পেশ করে আমরা যেন নিজেদের সংসদসর্বস্ব ব্যস্তবাগীশদের পর্যায়ে নামিয়ে না আনি। বিপরীতপক্ষে, আসুন, আমরা নিজেদের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াই এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসে যেন অটল থাকি যে, ঐক্যবদ্ধ ও নবজাগ্রত ভারতের জাতীয় দাবিকে অগ্রাহ্য করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না।

বিজ্ঞান এবং রাজনীতি

২১শে আগস্ট ১৯৩৮এ অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য এই অ্যাসোসিয়েশন তখনকার কংগ্রেস সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানায়। সভায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা নেতাজীকে কিছু প্রশ্ন করেন। এখানে সভার প্রাথমিক কিছু বিবরণ উদ্ধৃত হল।

প্রশ্ন : আমার জিজ্ঞাস্য ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ কি গ্রাম্য জীবনের গরুর গাড়ির দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করে, তার দ্বারা দাস্য মনোভাবকে জীইয়ে রাখবে, না, তার সমূহ জাতীয় সম্পদের বিকাশ ঘটিয়ে আধুনিক শিল্পোন্নত জাতিতে পরিণত হবে এবং দারিদ্র্য অজ্ঞতা ও দেশরক্ষার সব সমস্যার সমাধান করবে এবং বিশ্বজাতিসভায় সম্মানের আসন অধিকার করে সভ্যতার এক নতুন চক্রগতির সূত্রপাত করবে?

কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলী যদি শিল্পযোজন নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন, তাঁরা কি শিল্পযোজনের যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা রচনা করে একটি জাতীয় গবেষণা সংস্থা গঠন করবেন এবং দেশের বিজ্ঞানী-সমাজকে সেই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ করবেন? আমি এই প্রশ্ন করছি, তার প্রথম কারণ কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, দ্বিতীয় কারণ, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শিল্পযোজন সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর ধারণা রয়েছে।

উত্তর : ভারতীয় মুক্তি আন্দোলন এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে যখন স্বরাজ শুধু আর স্বপ্ন নয়—শুধু সুদূর ভবিষ্যতের একটা আদর্শমাত্র নয়। বিপরীতপক্ষে, ক্ষমতাদখল আমাদের নাগালের মধ্যে প্রায় এসে গেছে—ব্রিটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশ এখন কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর অধীন। এই

সকল সরকারের ক্ষমতা যদিও সীমিত, তবুও তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। এইসব সমস্যা আমরা কি করে সমাধান করব? সর্বাগ্রে এবং সর্বপ্রথমে আমরা এই দায়িত্বপালনে বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

কংগ্রেস এবং জাতীয় পুনর্গঠনের দায়িত্ব: আমি সব সময় এই মত পোষণ করে এসেছি এবং হরিপুরা কংগ্রেসে আমার সভাপতির অভিভাষণেও আমি এই কথা বলি যে, যে-পার্টি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, ক্ষমতা দখল করার পর সেই পার্টি নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে না। যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের দায়িত্বও সেই পার্টিরই নেওয়া উচিত। অতএব, আজকের যাঁরা কংগ্রেস সদস্য তাঁদের কেবল স্বাধীনতার জন্য প্রয়াসী হলেই চলবে না, তাঁদের চিন্তা ও সামর্থ্যের কিছুটা অংশ জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাতেও ব্যাপৃত রাখতে হবে। এবং জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব হবে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়েই।

আপনি যদি অনুমতি করেন জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যা সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা আপনার কাছে উপস্থাপিত করতে চাই। এদেশে শিল্পীয় পুনরুদ্ধার সম্ভব করার জন্য আজকাল অনেক পরিকল্পনার কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এই প্রদেশের একজন অফিসার সম্প্রতি বাংলাদেশের শিল্পীয় পুনরুদ্ধারের উপর প্রকাণ্ড এক বই লিখেছেন। আমাদের সামনে যে সমস্যা তা শিল্পীয় পুনরুদ্ধার নয়, তা শিল্পযোজন। ভারতবর্ষ এখনও বিবর্তনধারায় প্রাকশিল্পীয় স্তরে রয়ে গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কখনই সম্ভব হবে না যতদিন পর্যন্ত আমরা শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম না করি। আমরা চাই বা না চাই, এ সত্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতেই হবে যে, আধুনিক ইতিহাসের বর্তমান যুগ শিল্পীয় যুগ। শিল্পবিপ্লব থেকে কিছুতেই পার পাওয়া যাবে না। বড়জোর আমরা স্থির করতে পারি এই বিপ্লব, অর্থাৎ শিল্পযোজন, তুলনায় ধীরগতিতে হবে, যেমন গ্রেট ব্রিটেনে হয়েছে, অথবা জোর কদমে তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া

হবে, যেমন হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। আমার কিন্তু মনে হয়, এদেশে জোর কদমেই ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।

আমার কোনই সন্দেহ নেই, সারা দেশে আমাদের যখন জাতীয় সরকার হবে, সর্বপ্রথমে আমাদের যে কাজগুলি করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হবে সারা দেশের জন্য একটি জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন গঠন। বস্তুতঃপক্ষে সাতটি প্রদেশে আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলী এরই মধ্যে একই ধরনের শিল্পীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন বোধ করছেন। এই বিষয়ের কথা পূর্বাহ্ণে চিন্তা করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক বছর আগে, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হবার পরে পরেই, এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেস সরকারগুলিকে উপদেশ দেবার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই অভিমত ১৯৩৮-এর মে মাসে বোম্বাইয়ে আমার সভাপতিত্বে কংগ্রেস মুখ্য-মন্ত্রীদের যে কনফারেন্স হয়, সেখানে সমর্থিত হয়। সেই থেকে বিশেষজ্ঞদের কমিটি নিয়োগের বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনাধীন আছে এবং জুলাই মাসে কমিটির শেষ যে মিটিং হয়েছে তাতে কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে আমি কংগ্রেসশাসিত সাতটি প্রদেশের শিল্পসংক্রান্ত মন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে আহ্বান করব। আমরা পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য অপেক্ষা না করে যে অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি তা বোঝাবার জন্য আমি এইসব ঘটনার কথা বলছি।

যদিও কুটীর শিল্পকে আমি বাদ দিচ্ছি না, যদিও আমি মনে করি কুটীর শিল্পকে রক্ষা করার জন্য এবং যেখানে সম্ভব তা পুনরুদ্ধারের জন্য সব রকমের চেষ্টা করা উচিত, আমার কিন্তু অভিমত এই যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে বোঝাবে প্রধানতঃ ভারতের শিল্পযোজনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা। এবং আপনারাও নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, স্যার জন এণ্ডারসন আমাদের যতই বোঝাতে চান, ছাতার বাঁট ও কাঁসার থালা শিল্পের উন্নয়নই শিল্পযোজনা নয়।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, আপনার পত্রিকা সায়েন্স

অ্যাণ্ড কালচার শিল্পযোজনার সমস্যার দিকে এদেশের বিদগ্ধ চিন্তাকে আকৃষ্ট করতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন সংখ্যায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, নদীবিষয়ক পদার্থবিদ্যা, জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ।

জাতীয় পরিকল্পনা নীতির উপরে আমি কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই:

(১) শিল্পীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও পৃথিবীটা এক, তা সত্ত্বেও বিশেষ করে আমাদের প্রধান প্রধান চাহিদা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় স্বয়ম্ভরতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;

(২) আমাদের এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যার লক্ষ্য হবে মূল শিল্পগুলির বিকাশ ও উন্নয়ন, যেমন, শক্তি সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্র ও কারখানার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, অপরিহার্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত, পরিবহণ ও যোগাযোগ সংক্রান্ত শিল্প, ইত্যাদি।

(৩) টেকনিকাল শিক্ষা ও টেকনিকাল গবেষণার যে সমস্যা আছে তাও আমাদের সমাধান করতে হবে। টেকনিকাল শিক্ষা বিষয়ে জাপানী ছাত্রদের মত আমাদের ছাত্রদেরও নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠাতে হবে যাতে তারা দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার কাজে সরাসরি লেগে যেতে পারে।

টেকনিকাল গবেষণার বিষয়ে আমরা সবাই একমত হব যে তা সর্বপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে। একমাত্র এই হতভাগ্য দেশেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভার মোটা মাইনের সরকারী চাকুরেদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং আমাদের সবার ভালোমত জানা আছে তাতে কী ফললাভ হয়েছে।

(৪) স্থায়ী একটি জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল থাকবে;

(৫) পরিশেষে, জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বর্তমান শিল্পীয় পরিস্থিতির উপর একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা করতে হবে যাতে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

শিল্পযোজনা ও জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যা সম্পর্কে আমার যা ধারণা তার কিছু অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম এবং আমার বিশ্বাস, এদেশের বিজ্ঞানী নারীপুরুষ সকলেরই এতে সায় আছে। আমরা, যারা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ, আমরা আমাদের ধারণাগুলিকে রূপ দিতে আপনাদের, বিজ্ঞানীদের সাহায্য চাই। আমরা আমাদের দিক থেকে এই সব ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে পারি এবং যখন ক্ষমতার দুর্গ চূড়ান্তভাবে আমাদের করায়ত্ত হবে, এইসব ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করতেও সাহায্য করতে পারি। যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে সুদূরপ্রসারী সহযোগিতা।

অধ্যাপক সাহা তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবার সময় জানতে চেয়েছেন, শিল্পযোজনার সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব কী। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এই প্রশ্নে সব কংগ্রেস সদস্যের মত এক নয়। তা সত্ত্বেও কোনপ্রকার অতিরঞ্জন না করে আমি এ-কথা বলতে পারি যারা তরুণ তারা শিল্পযোজনার সপক্ষে এবং তা কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পযোজনার প্রয়োজন। যদিও বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ভূমির উৎপাদন বৃদ্ধি করবে, তবু প্রতিটি নরনারীর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে জনসংখ্যার ভালোমত একটি অংশকে ভূমি থেকে সরিয়ে শিল্পে নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, তরুণরা জাতীয় পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসেবে সমাজ-তন্ত্রের কথা চিন্তা করছে এবং শিল্পযোজনা হবার পরেই আসে সমাজতন্ত্র। তৃতীয়তঃ, আমাদের যদি বৈদেশিক শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়, শিল্পযোজনা একান্ত দরকার।

পরিশেষে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শিল্পযোজনা প্রয়োজন।

অধ্যাপক সাহা আরেকটি প্রশ্ন করেছেন, ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত কি একটি জাতিতে পরিণত হবে? এর উত্তরে আমি বলতে চাই, আমরা যারা কংগ্রেসের, আমরা ভারতীয় ঐক্য ও সংহতি

গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আমরা চীনের পথ অনুসরণ করতে চাই না, তুরস্কের পথে যেতে চাই। কিন্তু এ-কথাও ঠিক, স্বাধীন হবার পর আমরা যদি নিজেদের একতাবদ্ধ রাখতে চাই, আমাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। জাতীয় একতা ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য অনেক জিনিসের দরকার, যেমন, এক ভাষা, এক সাজ, এক খাদ্য ইত্যাদি। আপনারা জানেন কংগ্রেস এদেশের সর্বজন-গ্রাহ্য ভাষা হিসেবে হিন্দুস্থানীর কথা বলে আসছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৈদেশিক আধিপত্য যখন লোপ পাবে তখন সবচেয়ে বেশি করে যা দরকার তা হচ্ছে একটি জাতি হবার এবং একটি জাতিরূপে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ রাখার আকাঙ্ক্ষা। সেই কারণে, আমার মনে হয়, একতার সমস্যাটা প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে, তাদের নিয়মিতভাবে চালিত করতে হবে, যাতে তারা বোধ করে তারা এক জাতি। ভাষা, সাজ, খাদ্য ইত্যাদি ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু একতা গড়ে তুলতে পারে না। জাতিগত এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জাতীয় একতা ও সংহতি বজায় রাখতে আরও যা দরকার তা হচ্ছে সর্বভারতীয় একটি পার্টি। কংগ্রেস সেই পার্টি। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, প্রতিটি দেশ সেই দেশের জন-সাধারণকে একতাবদ্ধ করার জন্য একটি পার্টির জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মানিতে নাৎসী পার্টি, ইটালীতে ফ্যাসিস্ট পার্টি এবং তুরস্কে কামালের পার্টি। ওই পার্টিগুলি তাদের নিজ নিজ দেশে ঐক্যবদ্ধ করার যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, ভারতে কংগ্রেস পার্টিও সেই ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের ভালো দিক ও মন্দ দিক

১৯৩৮-এর আগস্ট সংখ্যা **মডার্ন রিভিউ**-এ স্বনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল প্রদেশে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী এবার যখন কংগ্রেসের সদস্যদের অনুমতিদানের সিদ্ধান্ত করেছেন, তখন আমাদের সামনে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকা আমাদের কর্তব্য। যদিও ব্রিটিশ-ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র ছটিতে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী হতে চলেছে (যুক্তপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সি), সারা ভারতের কংগ্রেস সদস্যদের ও সাধারণভাবে জনগণের মনোযোগ আগামী কিছুদিনের মত মন্ত্রিসভাগুলির ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির কার্যকলাপের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। নিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াবে এবং আইন অমান্যের মত অনিয়মতান্ত্রিক যে পদ্ধতিগুলি এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের হাতে প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ছিল, সেগুলি নেপথ্যে অপসৃত হবে। জনগণের মানসিকতায় মনস্তাত্ত্বিক একটা পরিবর্তন স্বভাবতঃই দেখা দেবে এবং অনেক কংগ্রেস সদস্যের মনে সরকারী পদাধিকারসূত্রে নানা সুযোগ-সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। যে "বিদ্রোহী মানসিকতা"কে কংগ্রেস বহু বৎসর ধরে লালন করে আসছে, তার জায়গায় আরেকবার দেখা দেবে আত্মপ্রসাদ ও জড়তা। আজকের দিনে যে সকল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

যারা মনে করে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ নীতিগতভাবে ভুল, আমি তাদের একজন নই। আইনসভায় যোগদান এবং সরকারী দায়িত্বগ্রহণের সঙ্গে নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ

গ্রহণ জড়িত। কিন্তু আমি বরাবরই এই প্রকার শপথকে নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক বলে গণ্য করে এসেছি। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে কংগ্রেস মহলে যখন আইনসভায় যোগদান করা নিয়ে জোর বিতর্ক চলেছিল, তখন বিরুদ্ধপন্থীরা যে যুক্তি দেখান, যেমন, যোগদান করলে ব্রিটিশ সম্রাটের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতেই হবে, সেই যুক্তি আমার মনে কোন সাড়া জাগায়নি। মিঃ ডি ভ্যালেরা যাতে ডয়েলে গিয়ে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ বাতিল করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্যের শপথ নেওয়াটাকে নীতিগতভাবে আমি মোটেই অন্যায় মনে করি না। এক্ষেত্রে যে প্রশ্ন জড়িত তা নীতির প্রশ্ন নয়, সুবিধার প্রশ্ন, এবং আমি যে দিক থেকে এইসব প্রশ্নের বিচার করি তা পুরোমাত্রায় বাস্তব ভিত্তিক।

আমাদের পৌর প্রশাসনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝি, প্রশাসনক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে খুঁটিনাটি অসংখ্য বিষয় আয়ত্ত করার সামর্থ্য থাকা দরকার। অতএব মনপ্রাণ দিয়ে প্রশাসনিক কাজে আত্মনিয়োগ করলে ব্যাপকতর বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকার মত অতিরিক্ত সময় বা শক্তি প্রায়ই থাকে না। ক্বচিৎ আমরা এইরকম লোকের সংস্পর্শে আসি যাঁরা প্রশাসনের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর রেখে একই কালে অধিকতর মৌলিক সমস্যা নিয়েও চিন্তা করতে পারেন। আমার অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে, ১৯২৪ সালে আমি যখন কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলাম, তখন কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই ছিল না, পৌর প্রশাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমাকে এত বেশি ডুবে থাকতে হত। কিন্তু আমি যখন এই কাজ গ্রহণ করতে যাই, কাজের দায়িত্বকে মেনে নিয়েই যাই, কারণ তখন আমার আশা ছিল, কংগ্রেসের কাজ অদম্য উৎসাহে চালিয়ে নিয়ে যাবার লোকের কোন অভাব নেই।

বরাবর আমি এই মত পোষণ করে এসেছি, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য

সংগ্রাম করেন স্বাধীনতা অর্জন করার পর "যুদ্ধপরবর্তী" পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে। "আমাদের অভীষ্ট কর্ম শেষ হয়েছে" —এই অজুহাতে দায়িত্ব এড়ানো যেতে পারে না। সেই কারণে জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পার্টিকে সামাজিক পুনর্গঠন ও প্রশাসনের কাজে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং তারই মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, তারা যেমন ধ্বংস করতে পারে তেমনি সার্থক সৃষ্টিও করতে পারে। কিন্তু সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করবার আগে পার্টিকে ভেবে দেখতে হবে সেই বহুপ্রতীক্ষিত লগ্ন সমাগত কিনা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ হয়েছে কিনা। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা এই—"১৯৩৫-এর ভারত-সরকার আইন কি আমরা যা চেয়েছিলাম তাই দিয়েছে? আপাততঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কথা যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলেও এই আইন থেকে কি আমরা প্রদেশগুলিতেও যথার্থ স্বায়ত্তশাসন পাচ্ছি?" এর সুস্পষ্ট উত্তর—"না"।

তর্কের খাতিরে এ-কথা অবশ্য বলা হবে, সামরিক সংগ্রামেও যেমন, রাজনৈতিক সংগ্রামেও তেমনই, আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার সময় সুবিধাজনক ঘাঁটি দখল করে নিজেদের অবস্থা সংহত করার প্রয়োজন আছে। খুব সত্য কথা। কিন্তু আমরা কি সুনিশ্চিত, ক্ষমতার আসনের মূল্য যতটুকুই থাক, সেই আসন দখল করার চেষ্টায় আমরা কি প্রশাসনের গোলকধাঁধায় নিজেদের হারিয়ে ফেলব না এবং যে "বিদ্রোহী মানসিকতা" থেকে যাবতীয় রাজনৈতিক অগ্রগতির সূচনা, তা কি পরিহার করতে শুরু করব না? স্পষ্টতঃই কংগ্রেস আজ উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন। যে স্বাধীনতা অর্ধেকও জয় করা যায়নি, সেই স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে কংগ্রেস তার প্রথম সারির কর্মীদের মন্ত্রিত্বের গদি দখল করার জন্য পাঠাতে পারে না। অপর-পক্ষে, যথার্থ প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি যদি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রী না হয়, আমরা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির যে আসনগুলি শাসনতন্ত্রের কাছ থেকে পেয়েছি তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারব না। ১৯২৫-

৩০ সালে ভারতীয় আইন সভার প্রেসিডেন্টরূপে স্বর্গত ভি. জে. প্যাটেলের মত প্রথম সারির রাজনৈতিক প্রতিভাই কেবল জনসাধারণের স্বার্থকে তুলে ধরে সংসদীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেন এবং সরকারী আসনের সদস্যদের তাঁদের আসনে নির্বাক করে রাখতে পারেন। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান ব্যক্তি নিশ্চিত ব্যর্থ হত। ভি. জে. প্যাটেলের পাশে ষণ্মুখম চেট্টিরা ও আবদার রহিমরা নগণ্য মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হয়।

সরকারী দায়িত্বগ্রহণের যাঁরা গোঁড়া সমর্থক তাঁরা এও বলবেন বা বলতে পারেন, যে-কোন রাজনৈতিক পার্টির পক্ষে প্রশাসনের অভিজ্ঞতা অপরিহায এবং নতুন শাসনতন্ত্র এই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিচ্ছে। এই যুক্তির দোহাই দিয়ে সহজেই বাড়াবাড়ি করা যেতে পারে। প্রশাসনের অভিজ্ঞতাও যা সংগঠনের অভিজ্ঞতাও তাই, তবে শেষেরটি যেমন যে-কোন পার্টির সম্পদ, প্রথমটি কিন্তু সহায়ক হওয়ার থেকে প্রতিবন্ধকই হয়ে ওঠে বেশী। সর্বকালে সর্বদেশে যা হয়ে এসেছে সেই ধারায় যুদ্ধপরবর্তী ইওরোপের যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রশাসক তাঁরা যখন তাঁদের পুরোগামীদের কাছ থেকে সরকারী শাসনভার গ্রহণ করেন, তুলনায় তাঁরা ছিলেন তরুণ এবং প্রশাসনেও ছিলেন অনভিজ্ঞ। আমার এই যুক্তির অকাট্যতা লেনিন, স্টালিন, হিটলার, মুসোলিনি, কামাল পাশার মত সার্থক প্রশাসকদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আসল কথা এই যে বিপ্লবের পরে (সহিংসই হোক, অহিংসই হোক) নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থক মোকাবিলা করবার জন্য নতুন প্রশাসনে দরকার হয় সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের নীতি ও কর্মকৌশলের এবং সেইসঙ্গে সাহস, কল্পনা ও উপায় উদ্ভাবনীশক্তির। "অভিজ্ঞ" প্রশাসকরা কি সোভিয়েত রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন, কিংবা তুরস্কে নতুন প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, কিংবা ইটালীর নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, অথবা বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি থেকে নতুন এক পারস্যের সৃজন করেছিলেন?

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রীয় দুর্গটি

(ভারত সরকার) এখনও ব্রিটিশ সরকারের করায়ত্ত রয়েছে এবং কেবলমাত্র ফাঁড়িগুলি অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারগুলি, আমাদের হাতে এসেছে—তাও পুরোপুরি নয়। এই অবস্থায় আমাদের পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিমগ্ন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে কি আমরা আমাদের সাবেকী উৎসাহ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে এবং আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব? এই প্রশ্নের পূর্বকল্পিত উত্তরের তেমন কোন মূল্য নেই এবং যথাকালে একমাত্র ঘটনাধারা থেকেই আমরা এর যথার্থ উত্তর পাব। তবে যাঁরা ক্ষমতা-গ্রহণের সপক্ষে, তাঁদের প্রত্যয় যদি সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহলে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হতে পারে এবং যার উল্লেখ প্রথম অনুচ্ছেদে করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আগে থেকে আমাদের সাবধান ও প্রস্তুত থাকতে হবে। যে প্রশ্নে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আজ সেই প্রশ্ন নতুন করে তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে নতুন শাসনতন্ত্র থেকে যথাসম্ভব সুবিধা আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শকে যদি আরও অগ্রসর করা আমাদের অভিপ্রায় হয়, তাহলে যে সব বিপদকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে, আমার উদ্দেশ্য, তার কয়েকটির ইঙ্গিত দেওয়া।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞকে প্রধান প্রধান যে সমস্যাগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে তা দারিদ্র্য, বেকারি, ব্যাধি ও নিরক্ষরতা। এই সব সমস্যার সার্থক সমাধান করতে পারে একমাত্র জাতীয় সরকার। অবশ্য প্রচুর সহায়সম্বল সেই সরকারের আয়ত্তাধীনে থাকা চাই। এই সব সমস্যার মোকাবিলা করার সঙ্কল্প একবার আমাদের ভিতর জাগলে আমাদের দরকার হবে সংগঠনের এবং সেই কাজ করার উপযোগী অর্থের। ব্যাপকভাবে জাতিগঠনের কাজ হাতে নেবার মত প্রয়োজনীয় সংগঠন ও অর্থের সন্ধান কি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পাবে? সংগঠন সম্পর্কে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ

করা যেতে পারে, সরকারী চাকরির উচ্চ পদগুলি অধিকার করে আছে প্রধানতঃ ব্রিটিশরা, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ঐতিহ্যের মধ্যে লালিত হয়েছে এবং তারা সব সময়ে মনেপ্রাণে চাইবে তাদের বেতন, পেনসন ও অন্যান্য পাওনা মন্ত্রীদের আওতার বাইরে শাসনতন্ত্রের রক্ষাকবচে যেন নিরঙ্কুশ থাকে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা স্বতঃই যে নতুন নীতি গ্রহণ করবে এই ধরনের অফিসাররা কি তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে ? যদি না চলে তাহলে মন্ত্রীদের অবস্থা কী হবে ? তাদের যতই সদিচ্ছা থাক না কেন, প্রতিবন্ধী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তারা কি সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে ? উচ্চতর চাকরির পদস্থবর্গকে অদলবদল করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে যেহেতু উচ্চপদাধিকারীরা "সংরক্ষিত" বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং মন্ত্রীদের সেই বিষয় স্পর্শ করার অধিকার থাকবে না। অতএব মন্ত্রীদের যতদূর সম্ভব তাদের সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে, যদিও তাদের প্রতিবন্ধী নীতির ফলে মন্ত্রীদের কাজ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই যাবে। উপরন্তু কয়েকটি প্রদেশে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, সরকার কংগ্রেসী, অথচ তা চালাচ্ছে প্রধানতঃ ব্রিটিশ অফিসাররা এবং তাদের প্রাক্তন পোষ্যরা।

অর্থসমস্যা এমন একটি সমস্যা যা আরও বেশি বিপত্তিকর। কংগ্রেস পার্টি এমন কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুত যা সরকারী রাজস্বের মূলে কুঠারাঘাত করবে এবং ব্যাপক হারে জাতিগঠনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য করে তুলবে। ভূমিরাজস্ব হ্রাস করার পর এবং আবগারি ব্যাপারে মাদকবর্জন নীতি চালু করার ফলে মন্ত্রিমণ্ডলী ঘাটতি বাজেটেরও সম্মুখীন হতে পারে। অন্য যে-কোন দেশে অর্থমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে লেগে যেত। ভারতীয় প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে উচ্চতর চাকরির বেতন ও অন্যান্য পাওনায় হাত দেওয়া যাবে না এবং বাকি যে সব পদ আছে তাদের বেতন এতই কম যে সেখানে মিতব্যয়িতার কোন অবকাশ নেই। ফলতঃ এই ক্ষেত্রে ছাঁটাই করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেনাবাহিনী, রেলওয়ে, ডাক ও তার, শুল্ক ইত্যাদি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়, এইসব

বিভাগে ছাঁটাই বা এইসব বিভাগ থেকে আয়বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে না। মুদ্রাস্ফীতি মারফতও অর্থসাচ্ছল্য করা কোন প্রাদেশিক সরকারের সাধ্যে নেই, যেহেতু মুদ্রা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়—ভারতের যে বিপুল স্বর্ণসঞ্চয় আছে সেদিক থেকে যদিও এ ব্যবস্থা গ্রহণ সহজেই সম্ভব। এই অবস্থায় একমাত্র বিকল্প পন্থা যা প্রাদেশিক সরকারের কাছে খোলা থাকবে তা এই, জাতিগঠনমূলক কার্যকলাপে অর্থের দায় পূরণ করতে মোটা অঙ্কের ঋণের জন্য জনসাধারণের দ্বারস্থ হওয়া। কিন্তু প্রাদেশিক আইনসভার অনুমোদনের জন্য এইপ্রকার ঋণ গ্রহণ গভর্নর কি সুপারিশ করবেন এবং লর্ড লিনলিথগোর প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকার এই ঋণকে কি স্বীকৃতি দেবে, যে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এই স্বীকৃতিলাভ প্রয়োজন ? যদি তা না করে, তাহলে মনে হয় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কপালে শূন্য হতাশা ছাড়া কিছু নেই।

এতক্ষণ যা পর্যালোচনা করা হল সেই দিক থেকে দেখা যাক কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যথার্থ ভালো কিছু করতে পারেন কিনা। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করতে পারেন, দমনমূলক আইন ও অর্ডিনান্সগুলি বাতিল করতে পারেন এবং জনসাধারণকে আরও স্বাধীনতার সুযোগ দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক প্রশাসনে তাঁরা নতুন এক উৎসাহের সঞ্চার করতে পারেন এবং সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর কাছে, বিশেষ করে পুলিসের কাছে জনসেবার এক নতুন মান তুলে ধরতে পারেন। তার ফলে বর্তমান সরকারী অফিসার ও কর্মচারীর কাছ থেকে তাঁরা আরও কাজ পেতে পারেন এবং প্রশাসনিক মান উন্নত করতে পারেন। তৃতীয়তঃ, যেখানে যেখানে সম্ভব সরকারী সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপকে জোরদার করতে পারেন। চতুর্থতঃ, সরকারী খাতে জিনিসপত্র কেনবার সময় আমদানী জিনিসের জায়গায় দেশী জিনিস পছন্দ করে তাঁরা স্বদেশী শিল্পকে এবং বিশেষ করে খাদিকে (হাতে কাটা সুতোয় হাতে বোনা কাপড়) উৎসাহ দান করতে পারেন। পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন, সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি)

তাঁরা জনহিতকর আইন প্রবর্তন করতে পারেন, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে এইপ্রকার আইন প্রণয়নের ফলে অতিরিক্ত ব্যয় হয় না। ষষ্ঠতঃ, অর্থানুকূল্য সতর্ক বণ্টনের ফলে তাঁরা দেশের জাতীয়তাবাদী অংশকে শক্তিশালী করে তুলতে পারেন, এবং প্রকারান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে কোণঠাসা করতে পারেন। সপ্তমতঃ, জনসাধারণের অর্থসম্পদ, তাদের করদানের সামর্থ্য এবং বেকারির পরিমাণ ঠিকমত জানবার উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলিতে তাঁরা সর্বাত্মক অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালাতে পারেন। অষ্টমতঃ, কোন কোন বিভাগে তাঁরা কিছু পরিমাণ ছাঁটাই করতে পারেন। নবমতঃ, কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রবর্তন বানচাল করার জন্য তাঁরা তাঁদের সরকারী পদমর্যাদার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। সর্বশেষে এবং শেষ বলে তুচ্ছ নয়, নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা অবশিষ্ট পাঁচটি অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

কিন্তু যতই হোক এগুলি সবই টুকরো টুকরো সংস্কার। কিছুদিনের জন্য জনসাধারণ তাতে খুশি থাকতে পারে কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। প্রথম বৎসর শেষ হবার আগেই মৌলিক সমস্যাগুলি—যথা, দারিদ্র্য, বেকারি, রোগ, নিরক্ষরতা ইত্যাদি—গুরুতর আকার নিয়ে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং আশু প্রতিকারের দাবি জানাবে। কেন্দ্রে যখন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এবং প্রদেশগুলির অর্থসঙ্গতিও যখন সীমিত, কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি কি এই দাবিকে সামাল দিতে পারবে? দারিদ্র্য ও বেকারির সঙ্গে মোকাবিলা করা যেতে পারে কেবলমাত্র কৃষির উন্নতি ও জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করে, তার সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে। রোগ দূর করার ব্যাপারে, একদিকে রোগ নিবারণ ও নিরাময়ের জন্য অন্যদিকে খেলাধূলা ও শারীরিক ব্যায়ামচর্চা বৃদ্ধির জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হবে। এবং নিরক্ষরতা দূর করার আগে ভাবতে হবে ছোটবড় সবার জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, যা সম্ভবপর হবে একমাত্র তখনই যখন মন্ত্রীদের হাতে

থাকবে খরচ করার মত বিরাট তহবিল।

আজকের দিনের অগ্রগণ্য জাতিগুলিও এইসব মৌলিক সমস্যার এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান করে উঠতে পারেনি। ভারত কেবলমাত্র তখনই সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে পারে যখন দিল্লীতে জনপ্রিয় সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে পুরোপুরি সহযোগিতা থাকবে। এ ছাড়াও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের মত অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে যখন অগ্রসর হতে হবে গোঁড়া রাজস্ববিজ্ঞানের রীতি বা নীতি অনুসরণ করে এই দেশের আর্থিক চাহিদা কখনও মেটানো যাবে না।

অতএব নিকট ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আমি প্রত্যক্ষ করতে পারছি যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তাঁদের আংশিক সংস্কারের কার্যক্রম নিয়ে বেশ খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর বুঝতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দিল্লীতে জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে এবং দেশের জন-সাধারণের কাছে ক্ষমতার সম্পূর্ণ হস্তান্তর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আরও অগ্রগতি সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা এ-কথা যেন না ভাবি যে এই পর্যায়ে আসা অবধি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছে সবকিছু অনায়াস ও নির্ঝঞ্ঝাট থাকবে। আগেই আমি দুটি প্রতিবন্ধকতার আভাস দিয়েছি যা সরকারী জীবনে তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিরস্ত করবে, তা অর্থের অনটন এবং উচ্চপর্যায়ের পদগুলির বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার। প্রথমটি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, দ্বিতীয়টি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই। একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ধরা যাক, যেমন, ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিস। আগেকার কাঠামোয় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ৩৮৬ জন ছিল ব্রিটিশ এবং ২৬৩ জন ভারতীয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশদের সংখ্যা একই রকম থাকবে, কিন্তু ভারতীয়দের সংখ্যা কমিয়ে করা হবে ১৯৮ এবং এই সংখ্যার মধ্যেও ৫৮ জন অফিসার থাকবে স্বল্পমেয়াদী সার্ভিস কমিশনে। আই. এম. এস অফিসারদের মূল

বেতন ভবিষ্যতে কমিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু যারা ব্রিটিশ তাদের ক্ষতির থেকে লাভই হবে বেশি ওভারসিজ ভাতা বৃদ্ধির ফলে, অবশ্য বলাই বাহুল্য, এই ভাতা এই চাকরিতে বহাল ভারতীয়দের দেওয়া হবে না। অতএব নতুন কাঠামোয় আই. এম. এস.-এর ব্রিটিশ সদস্যদের তুলনায় ভারতীয়দের অবস্থা এখনকার থেকেও শোচনীয় হবে। পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন করার জন্যই ব্রিটিশদের জন্য দেশের কয়েকটি সেরা সেরা জেলা এবং মেডিকেল কলেজের কয়েকটি সেরা চাকরি সংরক্ষিত রাখা হবে। যদিও এই অবস্থাবিপাকের জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীরা দায়ী হবেন না এবং ওয়াকিবহাল শিক্ষিত লোকেরা তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝবেন, তা সত্ত্বেও বড় বড় চাকরিতে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে না পারার জন্য এবং ওই সব পদস্থ ব্যক্তিদের অত্যধিক বেতন ও ভাতা কমাতে না পারার জন্য সাধারণ লোক কিন্তু প্রাদেশিক সরকারকে একেবারে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেবে না। ছটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়বেন, কারণ নামে যদিও তাঁরা আই. এম. এস. অফিসারদের ওপরওয়ালা হয়ে থাকবেন, অফিসারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার একটিতেও তাঁরা হাত দিতে পারবেন না। অন্যান্য শাখার উচ্চপদের অবস্থাও হবে আই. এম. এস-এর মতই।

ছটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রত্যাশা যদি এই হয় তাহলে যে পাঁচটি প্রদেশে বেশির ভাগ মন্ত্রীরা মেরুদণ্ডহীন, যাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা কোনক্রমে গদিতে টিকে থাকা সেই প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজের রেকর্ড কী হবে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। বাংলাদেশে যেমন, গত চার মাসে মন্ত্রিমণ্ডলী যা করেছেন, বরঞ্চ না করেছেন বলাই ভালো, ভবিষ্যতের তা পূর্বসূচনা ধরা যায়। যে কোন জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যতালিকায় যা প্রথম কর্তব্য, অর্থাৎ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, সেই কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হবার মত সাহস তাঁরা এখনও সঞ্চয় করতে পারেননি। যে পাট সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের উপর চার কোটি না হলেও কমপক্ষে তিন

কোটি লোকের সুখসাচ্ছল্য নির্ভর করে সেই দুরূহ সমস্যার মীমাংসার ব্যাপারে ওই মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছ থেকে তাহলে কী আশা করা যেতে পারে ?

আমার মনে পড়ে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি যখন ডাবলিনে ছিলাম, কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেকটা একই ধরনের সমস্যা নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল। যেমন, আইরিশ ফ্রী স্টেটে বিট্‌ চাষের সীমাবন্ধন, চিনি উৎপাদন শিল্পের চাহিদার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এবং সে-দেশে উৎপন্ন চিনির বিপণন। তখনই আমি বুঝেছিলাম বাংলাদেশের পাট সমস্যার সমাধান কত সহজ হত শুধু যদি দিল্লীতে ও কলকাতায় একটি জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকত। আমার বিশ্বাস, শাসনতন্ত্রের সীমার মধ্যে থেকেও বাংলাদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী পাট সমস্যার সমাধান করতে অনেক কিছুই করতে পারেন, অবশ্য কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত সাহস যদি তাঁদের থাকে ; তবে পাটচাষীদের অর্থসাহায্য করার জন্য যেখানে অতিরিক্ত তহবিলের দরকার সেক্ষেত্রে স্বভাবতঃ তাঁরা অনন্যোপায়। কিন্তু বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল এই মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছ থেকে, যাঁদের না আছে তেমন বুদ্ধি, না আছে তেমন সাহস, কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না।

তাহলে আমাদের কি এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, মন্ত্রিপদ গ্রহণের নীতি থেকে প্রকৃতপক্ষে কিছুই লাভ হবে না ? কখনোই না। যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য থেকে আমি ভিন্নমত এবং আমি আশা করি না যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সহায়তায় সুদূরপ্রসারী সংস্কারসাধন সম্ভব, তা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের নীতিকে পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেও ভারতীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই কাজে সার্থক হতে গেলে আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং আমরা কংগ্রেসকে সম্মান-প্রাপ্ত নরমপন্থীদের একটা সমিতিতে নেমে আসতে দিতে পারি না। কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত

চলতে পারলে নিয়মতান্ত্রিকতার অধিকতর আরামপ্রদ পন্থা গ্রহণ করতে চাইবেন।

সরকারী দায়িত্বগ্রহণের সবচেয়ে বড় লাভ এই হবে, এর দ্বারা জনসাধারণের মনে একটা বিশ্বাস সঞ্চারিত হবে যে, কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী এবং কালের পরিণতিতে ভারতের সমগ্র সরকারী যন্ত্রটা কংগ্রেস পার্টির হাতে চলে আসবে। এর ফলে নৈতিক দিক থেকে যা লাভ হবে তা অপরিমেয়, এবং আমি মনে করি, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দয়ায় বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার থেকে এর মূল্য অনেক গুণ বেশি। দ্বিতীয়তঃ, দুর্বলচিত্ত কংগ্রেস সদস্যদের ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষমতার আস্বাদন আরও বেশি দুঃখকষ্ট ও আত্মত্যাগ বরণ করার কাজে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হতে পারে এবং তাঁদের মধ্যে অধিকতর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে। তৃতীয়তঃ, এর ফলে কংগ্রেস কেবলমাত্র বাইরে থেকেই নয়, প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে দিয়েও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্তনের বিরোধিতা করতে পারবে এবং এই দ্বিমুখী বিরোধিতার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে যদি নস্যাৎ করা যায়, কংগ্রেসের জয়গৌরব আরও বাড়বে।

পরিশেষে যা বলতে চাই তা শেষ বলেই তুচ্ছ নয়। সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজেদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থেকে সারা ভারত ও দুনিয়ার কাছে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবেন যে, ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের সীমানার মধ্যে থেকে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ করার সামান্যই সুযোগ আছে। এই অভিজ্ঞতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে সমগ্র দেশকে এবং কংগ্রেসকে দিল্লী ও হোয়াইট হলের প্রতিক্রিয়া দুর্গের উপর চরম আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত করবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আশাতিরিক্ত খুশি হব যদি সরকারী দায়িত্ব-গ্রহণের থেকে এই চারদফা ফলপ্রাপ্তি হয়। কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা ভবিষ্যতের স্বীকৃত নীতি হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকতাকে সম্ভবতঃ

মেনে নিতে চাইছেন, এবং তাঁরা কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর দশ-সালা কার্যক্রমের গুজব চালু করেছেন। নীতিগতভাবে সরকারী দায়িত্বগ্রহণের উপর আমাদের মধ্যে যাঁদের আস্থা নেই অথচ প্রকৃত ঘটনা বলে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে, স্বদেশবাসীকে এই গুজব সম্পর্কে সতর্ক করার দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে।

সুখের কথা যে, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং তাঁদের মত প্রথম সারির নেতারা মন্ত্রিপদ এবং আইনসভা, এই দুইয়ের থেকে দূরে রয়েছেন। এর থেকেই ভরসা পাওয়া যাচ্ছে যে, সংসদীয় কার্যকলাপের জালে কংগ্রেস নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে এবং তার দ্বারা বিশুদ্ধ একটি নিয়মতান্ত্রিক সংস্থায় নিজেকে পরিণত হতে দেবে না (নিয়মতান্ত্রিক শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে আমি প্রয়োগ করছি।) কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যাতে নিজ নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত থেকে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নির্দেশ পালন করেন, এইসব নেতা সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সবার উপরে, মহাত্মা গান্ধী যে তাঁর সাময়িক অবসরগ্রহণ সত্ত্বেও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ঘটনাপ্রবাহের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন, তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই যে, যদি সেরকম অবস্থার উদ্ভব হয়, হবে বলেই সব দিক থেকে মনে হচ্ছে, তিনি আর একবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসকে নিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপ পরিহার করার আবেদন জানাতে দ্বিধা করবেন না এবং কংগ্রেস যাতে ভারতের "পূর্ণ স্বরাজ" জয় করার জন্য শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে সেইজন্য "গণ সত্যাগ্রহের" পতাকা উত্তোলন করবেন।

ভারতের শিল্প-সমস্যা

২রা অক্টোবর ১৯৩৮ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্পমন্ত্রীদের এক কনফারেন্সে প্রদত্ত সম্পূর্ণ ভাষণ।

অসুবিধা ও সময়ের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আপনারা যে আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই কনফারেন্সে যোগদান করেছেন এইজন্য প্রারম্ভে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রদেশে কংগ্রেস সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই ধরনের কনফারেন্স এই প্রথম। কংগ্রেস সদস্যদের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করতে অনুমতি দেবার পর থেকেই দেশে শিল্পের বিকাশসাধনের সমস্যা এবং ওই উদ্দেশ্যে আমাদের সহায়সম্বল সমন্বিত করার প্রশ্ন ওয়ার্কিং কমিটির গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে।

১৯৩৭-এর আগস্ট মাসে যে বৈঠক হয় তাতে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে :

জরুরী ও অত্যাবশ্যক যে সকল সমস্যার সমাধান জাতীয় পুনর্গঠন ও সমাজ উন্নয়নের যে কোন পরিকল্পনার পক্ষে আবশ্যক সেই সকল সমস্যা বিবেচনা করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির নিকট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের সুপারিশ করিতেছে। এই প্রকার সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইবে ব্যাপক সমীক্ষা, তথ্যসংগ্রহ এবং তৎসহ সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত সামাজিক লক্ষ্য। এইসব সমস্যার অনেকগুলিকেই প্রাদেশিক ভিত্তিতে সার্থকভাবে মীমাংসা করা যাইবে না। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির স্বার্থও তাহাদের সহিত জড়িত। সর্বনাশা বন্যা নিরোধ করিতে, সেচের জন্য জল ব্যবহার করিতে, ভূমিক্ষয় সমস্যা বিবেচনা করিতে, ম্যালেরিয়া দূর করিতে এবং জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার বিকাশ

ও অন্যান্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে একটি নীতি নির্ধারণের জন্য সর্বাত্মক নদী সমীক্ষার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র নদী উপত্যকায় সমীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাইতে হইবে, এবং ব্যাপক হারে রাজ্যপরিকল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে। শিল্পসমূহের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্যও কয়েকটি প্রদেশের মিলিতভাবে কাজ করিবার ও কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি এই নির্দেশ দিতেছে যে, যে-সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাদের সাধারণ প্রকৃতি বিবেচনা করিতে এবং কী প্রকারে ও কোন্ ক্রমে তাহাদের সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিতে প্রারম্ভে একটি আন্তর্প্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হউক। এইপ্রকার প্রতিটি সমস্যা পৃথকভাবে বিবেচনা করিবার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারগুলিকে মিলিতভাবে কাজ করা সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য এই বিশেষজ্ঞ কমিটি বিশেষ বিশেষ কমিটি বা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিতে পারে।

গত মে মাসে বোম্বাইয়ে আমি সাতটি কংগ্রেস প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রীদের একটি কনফারেন্স আহ্বান করি। তাতে ওয়ার্কিং কমিটির কিছু সদস্য ছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রী যোগদান করেন। সেই উপলক্ষে, আপনাদের মধ্যে কারও কারও হয়তো মনে আছে, আমরা শিল্প পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে এবং শক্তি-উৎসের ও শক্তি-সরবরাহের বিকাশসাধন, সেইসঙ্গে কংগ্রেস প্রদেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও কাজের সমন্বয়সাধনের সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি। আমার যদি ঠিকমত মনে থাকে, তবে যাঁরা ওই কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন তাঁদের অভিমত এই ছিল যে, উল্লিখিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলিকে উপদেশ দেবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির দিক থেকেই বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রাথমিক প্রয়াস করা উচিত।

গত জুলাই মাসে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে :

একটি সারা ভারত শিল্প পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে ১৪-১৭ই আগস্ট, ১৯৩৭ ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তৎসূত্রে এই প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে যে, প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রেসিডেন্টকে অধিকার দেওয়া হউক যাহাতে তিনি সত্বর একটি দিন স্থির করিয়া শিল্প-মন্ত্রীদিগকে একটি কনফারেন্সে আহ্বান করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমান শিল্পগুলি সম্পর্কে এবং নূতন নূতন শিল্পের সম্ভাবনা ও চাহিদা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট চাহিয়া পাঠান।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী এই কনফারেন্স আহ্বান করা হয়েছে।

আমাদের আজকের জাতীয় জীবনে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা যখন এত বিরাট আকার ধারণ করেছে, আমার এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের যাবতীয় সহায়সম্বলকে জাতির সর্বাধিক উপকারে নিয়োগ করার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের কৃষিসমাজের নিদারুণ দুর্দশার অবসান ঘটানো এবং জীবিকার সাধারণ মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র কৃষির উন্নতিতেই তা সম্ভব হবে না। কৃষিপদ্ধতিতে অধিকতর নৈপুণ্য নিশ্চয় বাঞ্ছিত, তার দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে এবং সস্তায় আমরা খাদ্য পেতে পারি এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত জিনিসও পেতে পারি ঠিক, কিন্তু এই উপায়ে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কথাটা বিরুদ্ধার্থক মনে হতে পারে কিন্তু সামান্য বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, আরও বেশি নৈপুণ্যের অর্থ দাঁড়াবে এখনকার থেকে কম-সংখ্যক কৃষকদের দিয়ে একই পরিমাণ কৃষির উৎপাদন। তাই যদি হয়, বৈজ্ঞানিক কৃষির ফলে এখন বেকার-সমস্যার যা পরিস্থিতি তা আরও শোচনীয় হতে পারে।

এই দারুণ সমস্যাকে আমরা তাহলে কিভাবে আয়ত্তে আনব? আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেকে—নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে—যাতে

আরও ভালো পরতে পায়, আরও ভালো শিক্ষা পায়, বিশ্রাম ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য যথেষ্ট অবসর পায়। এই লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে হয় শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াতে হবে, অপরিহার্য কাজগুলিকে সংগঠিত করতে হবে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার বিরাট অংশকে শিল্পসংক্রান্ত নানা কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার সঙ্গতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। অফুরন্ত তার ধাতব সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্ভাবনা। দরকার দেশের সর্বাধিক স্বার্থে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিতভাবে আমাদের সেগুলিকে কাজে লাগানো। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ যারা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তারা পুরোমাত্রায় তাদের শিল্পবিকাশের মধ্যে দিয়েই তা হয়েছে। এখানে আমি একটিমাত্র দেশের কথা উল্লেখ করব। মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়ার অবস্থা ভারতের চেয়ে কোন অংশে ভালো ছিল না। সে দেশ ছিল প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ছিল কৃষক এবং আজকের আমাদের কৃষকরা যেমন প্রায় তেমনই ছিল তারা দুঃস্থ ও হতভাগ্য। শিল্প ছিল অনগ্রসর অবস্থায়, প্রাকৃতিক শক্তির উৎপাদন তেমন বিকাশলাভ করেনি এবং এই শক্তির ব্যবহার বিলাসিতা বলে গণ্য হত। দেশের শক্তি-সম্ভাবনা সম্পর্কে না ছিল জ্ঞান, না ছিল তেমন বিশেষজ্ঞ বা প্রয়োগকুশলী। কিন্তু গত ষোল বছরের মধ্যে নিরন্ন চাষীদের সেই দেশ সুপুষ্ট ও সুসজ্জিত শিল্পশ্রমিকদের এক দেশ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য, রোগ ও দুর্ভিক্ষের যে সমস্যা বিপ্লবের আগেকার কৃষিসমাজের উপর নিয়ত ভর করে থাকত সেই সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে সে দেশ বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। এর প্রধান কারণ দেশব্যাপী সুপরিকল্পিত শিল্পযোজনা, যার জন্য আগে থেকে ভাবতে হয়েছে বৈদ্যুতীকরণের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার কথা। যে রাজনৈতিক মতবাদের উপর রুশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তার কথা না ধরলেও, অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে রাশিয়ার চমকপ্রদ এই অগ্রগতি আমাদের সযত্ন অনুশীলন ও অভিনিবেশ দাবি করে। কেবলমাত্র রাশিয়ার যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার সঙ্গে

আমাদের দেশের মিল আছে বলেই সে-দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, সেইসঙ্গে এও দেখাতে চেয়েছি সুবিন্যস্ত শিল্পযোজনার পরিকল্পনা সর্বাত্মক সমৃদ্ধির পথে আমাদের কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ক্ষমতা দখল আমাদের দৃষ্টিসীমার ভিতরে এসে পড়েছে এবং স্বরাজ আর স্বপ্নমাত্র নয় যা সুদূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করবে, এই কথা বিবেচনা করে আমরা যারা কংগ্রেস-সেবক আমাদের কেবলমাত্র স্বাধীনতার প্রয়াস করলেই চলবে না। আমাদের চিন্তার ও সামর্থ্যের কিছুটা অংশ জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাতেও নিয়োজিত করতে হবে। জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব হবে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সহায়তায়। এ দেশে শিল্পীয় পুনরুদ্ধার সম্ভবপর করার জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়ে আজকাল অনেক অসংযত কথাবার্তা চলেছে। আমার মতে আমাদের প্রধান যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা শিল্পের পুনরুদ্ধার নয়, শিল্পযোজনা। বিবর্তনের ধারায় ভারতবর্ষ এখনও প্রাক্-শিল্পীয় স্তরে রয়েছে। শিল্পবিপ্লবের যন্ত্রণা আমরা যতক্ষণ না পার হয়ে যাচ্ছি, শিল্পে কোনপ্রকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিল্পবিপ্লব যদি অশুভ হয়, সেই অশুভ প্রভাব আবশ্যক। অন্যান্য দেশে শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে কুফল দেখা দিয়েছে, আমরা কেবল সাধ্যমত তা লাঘব করার চেষ্টা করতে পারি। এ ছাড়াও আমাদের স্থির করতে হবে এই বিপ্লব গ্রেট ব্রিটেনে যেমন হয়েছে তেমনই অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে হবে, না, সোভিয়েত রাশিয়ার মত জোর কদমে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার ভাবনা হচ্ছে, এ-দেশে জোর কদমেই তা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকের দুনিয়া যেভাবে গঠিত, যে-সমাজ শিল্পযোজনার প্রতিবন্ধক হবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।

এইখানে আমি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বলে রাখতে চাই, কুটীর-শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের বিরোধ হওয়ার কোন কারণ নেই। এরকম বিরোধ যদি থাকে, তার কারণ বোঝার ভুল। কুটীর-শিল্প উন্নয়নের যে প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী, যদিও সেইসঙ্গে

আমি এও মনে করি শিল্পযোজনার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করে নিতেই হবে। আমরা দেখেছি ইওরোপের প্রথম সারির শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও বহুসংখ্যক কুটীর শিল্প এখনও রয়েছে এবং ভালোভাবেই চলছে। আমাদের দেশেও আমরা এইরকম অনেক কুটীর শিল্পের কথা জানি—যেমন তাঁত শিল্প—যা ভারতীয় ও বিদেশী মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে এবং একটুও হটে আসেনি। অতএব শিল্প যোজনার অর্থ এই নয় যে আমরা কুটীর শিল্পের দিকে পিছন ফিরে থাকব। মোটেই তা নয়। এর অর্থ কেবল এই যে, আমাদের স্থির করে নিতে হবে কুটীর শিল্পের ভিত্তিতে কোন্ কোন্ শিল্পের এবং বৃহৎ শিল্পের ভিত্তিতে কোন্ কোন্ শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। ভারতে বর্তমানে যে অদ্ভুত ধরনের জাতীয় অর্থনীতি চালু রয়েছে সেই দিক থেকে এবং আমাদের দেশবাসীর সীমিত সামর্থ্যের কথা মনে রেখে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পের উন্নতিসাধন করতে পারলে আমরা সবচেয়ে উপকৃত হব।

শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—ভারী, মাঝারি এবং কুটীর শিল্প। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে বর্তমানে ভারী শিল্পের মূল্য যে সর্বাধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারী শিল্পই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দুর্ভাগ্যক্রমে এইদিকে আমরা বেশি অগ্রসর হতে পারছি না, অন্ততঃ যতদিন কেন্দ্রে আমরা ক্ষমতা দখল করে আমাদের রাজস্ব নীতি নিয়ন্ত্রণের পুরো অধিকার না পাচ্ছি। মাঝারি ধরনের শিল্পগুলি প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীরা সরকারের সহযোগিতায় ও সাহায্যে শুরু করতে পারে। কুটীর শিল্প সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি বৃহৎ শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে এইপ্রকার শিল্পের উন্নয়নের বিরোধ থাকার কোনই কারণ নেই।

জাতীয় পরিকল্পনার মূল নীতি সম্পর্কে আমি এখন কয়েকটি কথা বলতে চাই :

(ক) যদিও শিল্পের দিক থেকে সারা পৃথিবী একযোগে যুক্ত, তা সত্ত্বেও বিশেষতঃ আমাদের প্রধান প্রধান চাহিদা ও প্রয়োজনের

ক্ষেত্রে, জাতীয় স্বয়ংভরতাকে আমাদের লক্ষ্য বলে মেনে নেওয়া উচিত।

(খ) যাতে শক্তি সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোপকরণ তৈরি, মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত, পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্প, ইত্যাদি—এইসব মূল শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন হয় এইরকম নীতি আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

(গ) আমাদের টেকনিকাল শিক্ষা ও টেকনিকাল গবেষণা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। টেকনিকাল শিক্ষার ব্যাপারে, জাপানী ছাত্রদের বেলায় যেমন করা হয়, আমাদের ছাত্রদেরও একটি সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশে পাঠানো হবে যাতে তারা দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পগঠনের কাজে সরাসরি লেগে যেতে পারে। টেকনিকাল গবেষণার ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই একমত যে, সর্বপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে এই গবেষণাকে মুক্ত রাখা বিধেয়।

(ঘ) একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণা কাউন্সিল থাকবে।

(ঙ) পরিশেষে, তবে শেষ বলে তুচ্ছ নয়, জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে এবং জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান শিল্প-পরিস্থিতির উপর অর্থনৈতিক একটি সমীক্ষা হওয়া উচিত।

এই কনফারেন্সে আপনাদের বিবেচ্য হতে পারে এইরকম কয়েকটি সমস্যার প্রতি আমি এখন আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

(১) প্রতিটি প্রদেশে ঠিকমত অর্থনৈতিক সমীক্ষা করার ব্যবস্থা।

(২) কুটীর শিল্পের সঙ্গে বৃহৎশিল্পের সমন্বয়সাধন, যাতে উভয়ে একই ক্ষেত্রে ব্যাপৃত না থাকে।

(৩) আঞ্চলিকভাবে শিল্প বণ্টন করার যৌক্তিকতা।

(৪) আমাদের ছাত্রদের জন্য ভারতে এবং বিদেশে টেকনিকাল ট্রেনিং সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

(৫) টেকনিকাল গবেষণার যথোচিত ব্যবস্থা।

(৬) শিল্পযোজনার সমস্যা সম্পর্কে আরও পরামর্শ দেবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের যৌক্তিকতা।

যদি এই কনফারেন্সে এই সমস্যাগুলির সমাধানে আমরা প্রবৃত্ত হতে পারি, আজ অপরাহ্নে আমাদের এখানে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য যে তাতে সফল হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রথমেই আমি আপনাদের জানিয়ে রেখেছি, বিভিন্ন প্রদেশে যে সব শিল্প আছে তাই নিয়ে, সেইসঙ্গে নতুন নতুন শিল্পের চাহিদা ও সম্ভাব্যতার প্রশ্ন নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই কর্তব্য কেবলমাত্র তখনই আমরা করে উঠতে পারব যখন আমরা নানারকমের সমস্যার সমাধান করব, যার কিছু কিছু উল্লেখ আমি করেছি।

পরিশেষে, আমি আন্তরিক এই আশা প্রকাশ করছি যে, আপনাদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় এই কনফারেন্স সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং আমাদের দরিদ্র ও নির্যাতিত দেশের শিল্পজাগরণে তা শক্তিশালী এক প্রেরণা হবে।

ছাত্র আন্দোলন

১৯৩৮ সালের ২৯শে অক্টোবর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত উত্তর প্রদেশ ছাত্র কনফারেন্সে প্রদত্ত বাণী।

ভারতের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বরাবর ঘনিষ্ঠ এবং তার নানা কারণ আছে। আমার ছাত্র-থাকাকালীন অভিজ্ঞতার অনেক বছর আগে থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে, ছাত্ররা যদি আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় এবং মহান এক দেশের নাগরিকরূপে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তৈরি হতে চায় তাহলে তাদের নিজস্ব সংগঠন থাকা একান্ত দরকার। সংকীর্ণ অর্থে ছাত্র বলতে যা বোঝায় সেই ছাত্রাবস্থা যখন আমার শেষ হল তখন আমি নিজের মনে সংকল্প করি যে, যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে এবং যদি তা দেখা দেয় আগামী যুগের ছাত্রদের সাহায্যের জন্য আমার যতখানি সাধ্য আমি তাই করব।

সারা পৃথিবীতে যেখানে যত ছাত্র আছে তাদের মধ্যে জাতীয় ব্যবধান সত্ত্বেও তারা নিজেদের এক ভ্রাতৃসংঘের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং ঠিকই করে। এ শুধু কথার কথা নয় যে, আজকের ছাত্র কালকের নেতা এবং ছাত্ররাই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত প্রতীক। সচরাচর ছাত্ররাই জাতির সবচেয়ে আদর্শবাদী অংশের প্রতিনিধি এবং সহজাত এই আদর্শবাদের দরুনই দুনিয়ার সব ছাত্র বিরাট এক ভ্রাতৃসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেদের মনে করে। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে এই সংহতি বোধ জাগ্রত করা আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত, যাতে তাদের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনগণ চিরদিনের জন্য এক জাতি হয়ে গড়ে ওঠে।

স্বাধীন দেশের ছাত্ররা, স্বাধীন পুরুষ ও স্বাধীন নারী যে-অধিকার ভোগ করে, তারাও তাই ভোগ করে, কিন্তু আমাদের ছাত্রদের কথা অন্য। আমাদের ছাত্রদের বাধা-নিষেধ অনেক, পরাধীন জাতির লোকদের তা বিধিলিপি। ঘরে-বাইরে তাদের অভিভাবকদের চোখে

তারা নাবালক ; রাষ্ট্রের কাছে সাধারণতঃ তারা রাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজন। (কংগ্রেস সরকার হবার পর থেকে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।) এই অবস্থায় ছাত্রদের শিখতেই হবে নিজেরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বয়স্ক নারী-পুরুষের মত ব্যবহার পাবার জন্য তাদের জিদ করতে হবে এবং স্বাধীন জাতির লোকেরা যে সকল অধিকারে অধিকারী সেই অধিকার লাভের জন্য দাবি করতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রেই হোক, সরকারী পর্যায়েই হোক, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ নেহাত কম হয় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ সাধারণতঃ তখনই বাধে যখন ছাত্রদের ছাত্র-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে যখন তাদের নাগরিক-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই ছাত্ররা তখনই নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আশা করতে পারে যখন তারা ঠিকমত সংগঠিত। অতএব সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথমে যা করা কর্তব্য, তা সংগঠন। ছাত্রদের কনফারেন্স তখনই স্থায়ী উপকারসাধন করতে পারে যখন তা অনুপ্রেরণা যোগায়। ছাত্রদের অধিকার আদায় করার জন্য সংগঠনই কিন্তু সব নয়। দৈহিক, বুদ্ধিগত ও নৈতিক শিক্ষাদানও সংগঠনের লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে ছাত্ররা আরও উন্নত মানুষ ও আরও ভালো নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ছাত্র আন্দোলন মঞ্চ আরও ব্যাপকভিত্তিক হওয়া চাই এবং তা সবরকম মতের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। যদি কোন বিশেষ পার্টির, দলের বা মতাদর্শের ছাত্ররা অপর ছাত্রদের বাদ দিয়ে কর্তৃত্ব দখলের প্রয়াস করে তখনই সর্বনাশের সূচনা হবে। তাই যদি ঘটে, ছাত্র আন্দোলন ভেঙে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং একাধিক ছাত্র ফেডারেশনের আবির্ভাব ঘটবে। তোমাদের আলাপ-আলোচনায় স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রগতির আদর্শে তোমাদের দৃষ্টি সমুন্নত রেখো এবং সর্বদা মনে রেখো স্বাধীনতার অর্থ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি।

আমাদের প্রয়োজন এবং আমাদের কর্তব্য

ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট পত্রিকার ১৯৩৮ সালের অক্টোবর সংখ্যায় সম্পূর্ণ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

আজকের দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব ও শক্তির রহস্য কী তা যদি বিশ্লেষণ করি, আমরা তাহলে দেখব এর কারণ তিনটি :

(১) কংগ্রেসের বিপুল সভ্যসংখ্যা

(২) কংগ্রেসের সংগঠন এবং নিয়মনিষ্ঠা ; এবং

(৩) গত তিপ্পান্ন বছর ধরে অনুসৃত কংগ্রেসসেবীদের সেবা ও আত্মত্যাগের আদর্শ।

১৮৮৫ সালে পত্তন হবার পর থেকে কংগ্রেস অনেক পথ অতিক্রম করেছে এবং ভারতীয় জনগণকে তাদের স্বরাজ বা স্বাধীনতার লক্ষ্যের অনেক কাছে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। যদিও ক্ষমতা আমাদের গোচরের মধ্যে, আমাদের সামনে সংগ্রাম এখনও বাকি আছে। যদি আমরা স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতে যাত্রাপথের এই সংগ্রামকে শেষ বাধা বলে গণ্য করি, তাহলে আমাদের তিনটি কাজ করতে হবে। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা এমন বাড়াতে হবে যাতে আমাদের দেশবাসী বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসের আওতার মধ্যে আসে। আমাদের সংগঠনকে ও নিয়মানুবর্তিতাকে নিখুঁত করতে হবে এবং পরিশেষে, শেষ বলেই নগণ্য নয়, অনেক বেশি দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত তিনটি আবশ্যকতার প্রথমটি সম্পর্কে আমি প্রধানতঃ আলোচনা করতে চাই।

যে রাজনৈতিক সংগঠন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ না করে অহিংস পদ্ধতিতে দীক্ষিত, সেই সংগঠনে সংখ্যাগত প্রশ্নের গুরুত্ব অত্যধিক।

অহিংস সংগ্রামের চরম অস্ত্র সত্যাগ্রহ বা গণ আইন অমান্য, যার পূর্বশর্ত এক পতাকাতলে জনগণের সমাবেশ ঘটানো। কংগ্রেস যে অনুপাতে জনসাধারণকে তার আওতার মধ্যে টানতে সক্ষম হয়েছে, কংগ্রেসের প্রভাব ও শক্তি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে, সেই উপলক্ষে মাত্র জনকয়েক মধ্যবিত্ত ও বর্ধিষ্ণু শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সেখানে সমবেত হয়। এখন কংগ্রেসের অধিবেশনে যত পারা যায় তত লোকের সমাগম হতে পারে।

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, মহাত্মা গান্ধীই প্রথম নেতা যিনি কংগ্রেসকে এ দেশের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনেন। মহাত্মা গান্ধীর যে ব্যক্তিত্ব ও কার্যক্রম জনসাধারণকে কংগ্রেসের দিকে অভূতপূর্ব আকর্ষণে আকৃষ্ট করতে পেরেছে আমি তা বিশ্লেষণের প্রয়াস করতে চাইছি না। মহাত্মা গান্ধী যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছিলেন এখন তাকে যথার্থ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। কি করে তা সম্ভবপর হবে ? অসংখ্য ভ্রান্ত ও নগণ্য বিষয় অগণিত মূক জনমানবকে বিপথে চালিত করতে চাইছে, চাইছে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করতে ও শক্তিক্ষয়ী নানা প্রবণতায় ইন্ধন যোগাতে। এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার অস্ত্র দ্বিমুখী—রাজনৈতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক দিকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রলোভনকে প্রতিহত করতে আমাদের জাতীয়তার আবেদনের উপর জোর দিতে হবে।

দলগত বা সম্প্রদায়গতভাবে নয়, জাতিগতভাবে আমাদের সবাইকে অনুভব করতে ও চিন্তা করতে শিখতে হবে। সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে আমাদের নিরক্ষর দেশবাসীদের চোখ খুলে দিতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে, জাতি ধর্ম ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ এক এবং তার সমাধান হতে পারবে একমাত্র তখনই যখন আমরা স্বাধীন হব এবং জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিনিধি এক জাতীয় সরকার গঠিত হবে।

অর্থনৈতিক যে প্রশ্নগুলি সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বাধাকে অতিক্রম করে, সেই প্রশ্নগুলির উপর জোর দেওয়া একান্ত দরকার। দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতা ও রোগের সমস্যা, করভার ও ঋণদায়ের সমস্যা হিন্দু মুসলমান ও জনসাধারণের অন্যান্য অংশকে সমানভাবে উৎপীড়িত করে। জনসাধারণকে এ-কথা বোঝানো সহজ হবে যে, রাজনৈতিক সমস্যার পূর্ব-সমাধানের উপর, অর্থাৎ জাতীয়, জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপর তাদের সব সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

উপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে বিজ্ঞানসম্মত গণ-প্রচার যদি চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষকে তা স্বরাজের পতাকাতলে নিশ্চয় টেনে আনবে। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ যখন কংগ্রেসে যোগ দিতে আসবে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রভাবও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। একমাত্র সমস্যা তখন যা থেকে যাবে তা এই, এই বিপুল সদস্যসংখ্যাকে সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং স্বরাজলাভের জন্য ভবিষ্যৎ সংগ্রামে যে দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ করতে হবে তার জন্য প্রস্তুত করা।

প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই। বিজ্ঞান-সম্মত প্রচারকার্যের ফলে নতুন যে সব সভ্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা যেন তাড়া-খাওয়া বোবা মেষপালের মত না হয়। কর্মোদ্যমে ভরপুর তাদের জীবন্ত মানুষ হতে হবে। ব্যক্তি হিসেবে সভ্যদের মধ্যে উদ্যমের অভাব থাকলে তারা যে সব কমিটি গঠন করবে সেখানেও সক্রিয়তার অভাব দেখা দেবে। তাহলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র নির্ভর করবে ব্যক্তির উদ্যমের উপর এবং অধস্তন কংগ্রেস কমিটিগুলির সক্রিয়তার উপর। এই কর্মোদ্যম যদি নিচে থেকে না এসে, উপর থেকে আসে, তাহলে গণতন্ত্র প্রায় টোটালিটারিয়াজমে পর্যবসিত হবে। আমরা এই পরিণতির জন্য কাজ করে যাচ্ছি না। অতএব আমরা যেন এ-কথা মনে রাখি, ব্যক্তিগত উদ্যমকে সর্বদা উৎসাহ দিতে হবে, জাগিয়ে তুলতে হবে

এবং অধস্তন কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সদাসর্বদা সতর্ক ও সক্রিয় অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের প্রয়োজন ও আমাদের কর্তব্য বাস্তবিক সহজ। কিন্তু তা পূরণ এবং পালন করা দুঃসাধ্য প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে। নষ্ট করার মত সময় নেই; অতএব আসুন, এই গুরুদায়িত্ব পালনে সকলে কাঁধ লাগাই।

ইওরোপীয় সংকট—বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ

১৯৩৮ অক্টোবর সংখ্যায় **দি কংগ্রেস সোস্যালিস্টে** স্বাক্ষবিত সম্পূর্ণ প্রবন্ধ।

নানা লোকে নানা দিক থেকে সাম্প্রতিক ইওরোপীয় সংকটের পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। পাঠকদের কাছে এইরকম আরও একটি পর্যালোচনা এখানে নিবেদন করা হচ্ছে।

১৯৩৮-এর ১৯শে জানুয়ারি আমি যখন প্রাগের মধ্য দিয়ে যাই, তখন চেকোস্লোভাক রিপাবলিকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ডক্টর বেনেশ কর্তৃক সংবর্ধিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এর আগে তাঁর সঙ্গে আরও দু-বার সাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়েছে, তখন তিনি প্রেসিডেন্ট মাসারিকের অধীনে বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর এক ঘণ্টা কথা হয়, তারই মধ্যে তিনি আমাকে জানান, চেকোস্লোভাকিয়া সেই সময়ে যত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত বোধ করছিল আগে কখনও তা করেনি। সবারই মতে ডক্টর বেনেশ ইওরোপের সবচেয়ে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদদের মধ্যে একজন, এমনকি তিনিও বুঝতে পারেননি যে তিনি আগ্নেয়গিরির উপরে বসে আছেন। বাস্তবিকই, আমাদের মধ্যে যে অতি বুদ্ধিমান সেও মারাত্মক ভুল করে বসে। চেক মাজিনো লাইন এবং সদ্য-গড়ে-তোলা বিমানবাহিনী প্রেসিডেন্টকে নিরাপত্তা বোধে নিশ্চিন্ত করেছিল।

পরের দিন আমি ভিয়েনা অতিক্রম করি। অস্ট্রিয়ায় সাধারণতঃ যেমন থাকে, তেমনি সবই শান্ত। মনে হল চান্সেলাররূপে শুশনিগ নিরাপদেই অধিষ্ঠান করছেন এবং কালো সাজ পরা যাজক ও কালো সার্ট পরা ফ্যাসিস্টদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে বিনা ঝঞ্ঝাটে অস্ট্রিয়ার শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। সামান্যই তাঁর জানা ছিল যে কয়েক মাসের মধ্যে নাৎসীরা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করবে এবং তিনি যেমন শত শত

অস্ট্রিয়ান সমাজতন্ত্রীদের কারারুদ্ধ করেছেন, তাদের মত তাঁকেও বন্দী করা হবে।

এর আগে নাৎসীরা ভার্সাই চুক্তি ছিঁড়ে ফেলেছে এবং সামরিক দখলের জন্য রাইনল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছে। ফরাসী গুপ্তচর বিভাগ ফরাসী সরকারের কাছেএই মর্মে এক রিপোর্ট পাঠায় যে,রাইশ্‌ভেরের (জার্মান সেনা) কাছে হিটলারের নির্দেশ আছে, ফরাসী সেনাবাহিনী যদি জার্মানি আক্রমণ করে, রাইশ্‌ভের যেন পিছু হটে আসে এবং যুদ্ধে নিজেদের না জড়ায়। হিটলারকে তার চাল চালতে বাধ্য করানোর মত হিম্মৎ ব্লুম-এর ছিল না।

বৃহৎ শক্তিবর্গ অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গ্যারাণ্টি দিয়েছিল কিন্তু নাৎসীরা যখন অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে দখল করে নিল তখন সামান্য প্রতিবাদ জানাবারও সাহস কারও ছিল না। ১৯৩৪-এর জুলাইয়ে ডলফুসকে যখন হত্যা করা হয় তখন জার্মানরা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করলে ইটালী জার্মানি আক্রমণ করবে বলে শাসিয়েছিল। সেই ইটালীর ১৯৩৮এ একেবারে অন্য চেহারা।

মোটেই তাই আশ্চর্য হবার কথা নয় যে, জার্মানি অস্ট্রিয়াকে গ্রাস করে খুশী হয়ে না থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই সুদেতেনল্যাণ্ডকে তার অধিকারভুক্ত করতে চাইল। আবার হিটলার ভাবলেন তাকে তার চাল চালতে বাধ্য করার মত সাহস কারও নেই।

কোন ভরসায় হিটলার নতুন আক্রমণ চালাবার কথা ভাবলেন ? হিটলার আশ্বাস পেয়েছিলেন, ইটালী এতে আপত্তি করবে না এবং তিনি জানতেন বৃহৎ শক্তিবর্গ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না। তারা, বিশেষ করে ইংলণ্ড, যুদ্ধসরঞ্জামের আয়োজনে প্রস্তুত নয়। অতএব হিটলারের মূলমন্ত্র হল, 'হয় এখনই কর নইলে কখনো নয়'।

এ-কথা বলা হয়, চেম্বারলেন যখন হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য এরোপ্লেনে চেপে ছুটেছিলেন হিটলার তখন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করার মুখে। সত্যিই কি এরকম আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল, না, সবটাই ধাপ্পা ? আমার মত যদি জানতে চান, আমি বলব, একটা

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি জার্মানি কখনোই নিত না, যেহেতু সে জানত তাহলে গ্রেট ব্রিটেন তার বিরোধীপক্ষে যাবে। সেইজন্য, আমার মনে হয়, ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা হয় হিটলারের কাছে বোকা বনেছে কিংবা ইওরোপীয় ভূভাগের উপর জার্মান কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য স্বেচ্ছায় তাদের মদত দিয়েছে। হিটলারের কাছে ব্রিটিশের আত্ম-সমর্পণের অর্থ দাঁড়াল ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তির জায়গায় ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী কার্যতঃ বহাল হওয়া। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ফরাসী অনুগামী দলকে মন্ত্রিসভার জার্মান-অনুগামী দল উৎখাত করল।

কিন্তু ফ্রান্স কেন এই চোরাগোপ্তায় মাথা নোয়াল? এ এমন একটি প্রশ্ন যার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইওরোপীয় ভূখণ্ডে ফরাসীদের ছিল একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। রাতারাতি সেই কর্তৃত্ব লোপ পেল, এবং ফ্রান্স এখন ইওরোপের দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। আমি ভাবিনি, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা বিনা লড়াইয়ে এই অধঃপতনকে মেনে নেবে। আর ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা? তারাই বা কি বলে ওদের অনুগামী হতে স্বীকার করল? আমার যেন মনে হয়, ওরা হীনমন্যতায় ভুগছে। সেইজন্য হিটলারের সামনে তারা রুখে দাঁড়াতে পারেনি। যুদ্ধের সম্ভাবনায় ব্লুম্ এতই ভয় পেয়েছিলেন যে যা করা তাঁর উচিত ছিল তা তিনি করতে পারেননি।

কিন্তু ফ্রান্স চেকোস্লোভাকিয়াকে বাঁচাতে পারত এবং সেইসঙ্গে পারত যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে। ফরাসীরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটেন ও জার্মানিকে জানিয়ে দিত যে তারা চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে আছে, তাহলে রাশিয়াও এসে যোগ দিত। এবং যেহেতু রাইন এখন গ্রেট ব্রিটেনের সীমান্ত, ফ্রান্সকে সে কখনোই ত্যাগ করত না। আমার এক বন্ধু সদ্য ইওরোপ থেকে এসেছেন। তিনি বলছিলেন বেলজিয়মে যুদ্ধের সব আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল। তাহলে ১৯১৪-র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হত। নাৎসী জার্মানি সম্পর্কে আমি যা জানি তাতে এ-কথা বলতে পারি, ১৯১৪ সালের মত পরিস্থিতি দেখা দিলে নাৎসীরা দমে যেত।

আমার সুচিন্তিত ধারণা এই, ব্রিটেন যদি জার্মানিকে এই মর্মে জানিয়ে দিত যে ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে সে থাকবে, হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করার সবকিছু মতলব ত্যাগ করার পক্ষে তাই যথেষ্ট হত।

ফরাসী ও ব্রিটিশদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় চেকোস্লোভাকিযার করণীয় কী ছিল ? আমার কিন্তু মনে হয়, যদি সে জার্মান আক্রমণে টিকে থাকতে পারত, হয়তো সে ফ্রান্স ও রাশিয়াকে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনকেও যুদ্ধে নামিয়ে আনতে পারত। কিন্তু যতই হোক এ শুধু দূরকল্পনা। ডক্টর বেনেশ স্বচক্ষে দেখেছেন আবিসিনিয়ার ভাগ্যে কী ঘটেছে। হয়তো তিনি ভেবেছেন, বাস্তববাদী রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে নেগুসের পক্ষে হোর-লাভাল প্যাক্টের প্রস্তাব মেনে নিলেই ভালো হত। এইজন্যই তিনি জার্মানিকে সুদেতেনল্যাণ্ড ছেড়ে দেন এবং পোল ও হাঙ্গেরীয়দের খুশী করার পর তাঁর দেশের যতটুকু অংশ টিকে ছিল তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকেন।

এইমাত্র আমরা যা দেখলাম তা একটি নাটকের প্রথম দৃশ্য, সম্ভবতঃ তার পরিসমাপ্তি হবে চতুঃশক্তি এক চুক্তিতে, ফ্রান্সের জযে এবং ইওরোপীয় রাজনীতি থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার অপনয়নে। আসলে, সারা ইওরোপে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিজ্ঞদের মতলব এই। তারা কি সফল হবে ? কে বলতে পারে ?

একটি ব্যাপার মনে হয় স্পষ্ট। সোভিয়েত রাশিয়া যদি সগৌরবে ফিরে আসতে চায়, তাহলে তার দিক থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে, লাভাল যে সময়ে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত জোটের কথা প্রথম পেড়েছিলেন সেই সময়কার মতই তার সামরিক যন্ত্র দুর্ধর্ষ রয়েছে।

কামাল আতাতুর্ক প্রসঙ্গে

১৯৩৮-এর নভেম্বরে তুরস্কের নেতার মৃত্যুতে শ্রদ্ধার্ঘ

মহাযুদ্ধের ভিতর থেকে যে বিস্ময়কর চরিত্রগুলি বেরিয়ে এসেছিল তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে চমকপ্রদ, কামাল পাশা নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শিখরে ধূমকেতুর মত তাঁর উত্থান ইতিহাসে সত্যই বিরল। বিস্ময়কর চরিত্র বা রণজয়ী বীর হওয়ার থেকেও কামাল পাশা ছিলেন আরও অনেক বড়। একই কালে তিনি ছিলেন চতুর সমরকুশলী ও সূক্ষ্মবুদ্ধি কূটনীতিবিদ্ এবং জীবনে যে অভূতপূর্ব সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বহুবিচিত্র গুণাবলীর অনুপম এক সমন্বয় ছাড়া সম্ভবপর হত কিনা সন্দেহ। কামাল পাশা আনাতোলিয়ার রণক্ষেত্রেই শুধু বিপ্লবী ছিলেন না, জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিপ্লবী।

যাঁরা স্বাধীনতাকে সংগ্রাম করে জয় করে আনে যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের কার্যক্রমকে বাস্তব রূপদান করা তাঁদেরই কর্তব্য, এই বাক্যের চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। অসাধারণ তিনি সেনানায়ক হিসেবে, অসাধারণ তিনি কূটনীতিবিদরূপে, সমাজসংস্কারকরূপে অসাধারণ, অসাধারণ তিনি রাষ্ট্রবিশারদরূপে, আসাধারণ যোদ্ধা, অসাধারণ সংগঠক কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্ক নিঃসন্দেহে এই শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মুখবিবর থেকে দেশকে রক্ষা করার এবং বিগত তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপ থেকে পুনরুজ্জীবিত এক তুরস্ককে গড়ে তোলার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ আবার যদি এশিয়াকে বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করে, আমাদের ভূখণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে কামালের তুরস্ক সতর্ক প্রহরায় থাকবে। এইরকম অদ্বিতীয় এক ব্যক্তির তিরোধান সারা দুনিয়াকে,

বিশেষ করে আমাদের মত নির্যাতিত ও শোষিত জাতিগুলিকে বিচলিত না করে পারে না।

মানবতার ও স্বাধীনতার এই মহাপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা আমাদের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। অতএব আমি প্রস্তাব করি, আমরা আগামী ১৯শে নভেম্বর যেন "কামাল দিবস" পালন করি। ওই উপলক্ষে আমরা যেন সভা করে কামাল আতাতুর্কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি এবং তাঁর প্রিয় তুরস্কের মুক্ত জনসাধারণকে আমাদের বন্ধুত্বসূচক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের জাতীয় শোকে আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

জাতীয় প্ল্যানিং কমিটি

১৯৩৮-এর ১৭ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির প্রথম সভায় প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীসুভাসচন্দ্র বসু তাঁর বক্তৃতার প্রারম্ভে দেশের শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেন এবং সেইসঙ্গে একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখার জন্য কমিটিকে সবিশেষ অবহিত হতে বলেন। দেশের শিল্প-পুনরুজ্জীবনের জন্য কমিটি যা-কিছু প্রস্তাব দেবেন তাতে ক্ষুদ্রতর গ্রামীণ শিল্পগুলির স্বার্থ যেন পুরোপুরি সংরক্ষিত করা হয়। তিনি বলেন :

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি লক্ষ্য করেছি, ১৯২১ সাল থেকে নিখিল ভারত চরকা সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প সংঘের উদ্যোগে যথাক্রমে খাদি উৎপাদন ও কুটীর শিল্প উন্নয়নের যে আন্দোলন চলে আসছে তার উপরে শিল্প-পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের প্রচেষ্টার সম্ভাব্য ফল কী দাঁড়াবে সেই নিয়ে কোন কোন মহলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, দিল্লীতে উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, কুটীর শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। বস্তুতঃপক্ষে, তিনটি শ্রেণীতে আমি শিল্পকে ভাগ করি : কুটীর, মধ্যম পর্যায়ের ও বৃহৎ পর্যায়ের শিল্প এবং আমি এমন একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্য অবেদন করি যা এই শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটির কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেবে। শুধু তাই নয়, জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনেও আমরা নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্পসংঘের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধির জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করে রেখেছি। জাতীয় প্ল্যানিং কমিটিতেও অনুরূপ একটি আসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি এ-কথা বলা হয়, এমনকি যদি আশঙ্কাও করা হয় যে, জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের উদ্যোক্তারা কুটীর শিল্প পুনরুজ্জীবনের

আন্দোলনকে বানচাল করতে চান তাহলে আমাদের উপর দারুণ অবিচার করা হবে।

প্রত্যেকে জানে, না জানলেও প্রত্যেকের জানা উচিত, ইওরোপ ও এশিয়ার যে সব দেশ সবচেয়ে শিল্পোন্নত, যেমন, জার্মানি ও জাপান, সেখানেও প্রচুর কুটীর শিল্প আছে এবং তাদের অবস্থা বেশ ভালোই। তাহলে আমাদের দেশ সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা থাকবে কেন ?

এখন আমি কুটীর শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের ভিতরকার সম্বন্ধ নিযে দুচার কথা বলতে চাই। বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক শিল্পগুলি, কারণ তাদের উদ্দেশ্য উৎপাদনের উপায় প্রস্তুত করা। অনেক সস্তায় ও তাডাতাডি যাতে উৎপাদন সম্ভব করা যায় সেইজন্য মৌলিক শিল্প কারিগরদের হাতে দরকারী যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপকরণ পৌছিয়ে দেয়। যেমন, বারানসী শহরে দু পয়সা ইউনিট এই হারে বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে আমরা যদি বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত সরবরাহ করতে পারতাম, তাহলে বর্তমান উৎপাদনের হার থেকে পাঁচ-ছ গুণ বেশি হারে নানা ধরনের শাড়ি ও নকৃশাকাটা কাপড বোনা কারিগরদের পক্ষে সম্ভব হত, এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা এই ধরনের জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা সফল হতে পারত। ভালোমত একটি বিপণন সংস্থা এবং কাঁচামাল যোগান দেবার জন্য একটি সংগঠন থাকলে যে নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে এই কারিগররা আছে তার থেকে তাদের উদ্ধার করা যেতে পারে।

এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই যে আমি দেখাতে পারি তা নয়। যদি শক্তি-উৎপাদন শিল্প এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের শিল্প জাতির কল্যাণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, বাইসাইকেল, ফাউন্টেন পেন ও খেলনার মত বহু হালকা ধরনের শিল্প কারিগরশ্রেণীর লোকেরা তাদের নিজ নিজ পরিবারের লোকদের নিয়েই এ দেশে চালু করতে পারে। জাপানে ঠিক এইরকমই করা হয়েছে। তাদের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে একটি বিষয়ের উপর। শক্তি ও যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সস্তা এবং জাপানী

সরকার কাঁচা মাল সরবরাহ ও উপযুক্ত বিপণনের জন্য বোর্ড গঠন করেছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে তাঁত শিল্প ও রেশম শিল্প একমাত্র ওই উপায়েহ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

জাতীয় প্ল্যানিং কমিটিকে সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। একে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে মৌলিক শিল্পগুলির দিকে, অর্থাৎ সেইসব শিল্পে যা অন্যান্য শিল্পকে চালায়—যেমন শক্তি-উৎপাদন শিল্প, ধাতু-উৎপাদন শিল্প, ভারী রসায়ন, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোপকরণ এবং রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও রেডিওর মত যোগাযোগ সংক্রান্ত শিল্প।

অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশ শক্তি-উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চাৎপদ। বিশেষ করে বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে ভারত যে কতখানি অনগ্রসর তা বোঝা যায় এই তথ্য থেকে, বর্তমান সময়ে ভারতে আমাদের মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তি যখন মাত্র সাত ইউনিট, মেক্সিকোর মত অনগ্রসর দেশেও তখন মাথাপিছু হার ছিয়ানব্বই ইউনিট এবং জাপানে মাথাপিছু প্রায় পাঁচশো ইউনিট। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে সরকার অর্থের অপচয় করেছে। মাণ্ডি হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক স্কীমের কথা ধরুন। অন্যান্য দেশ এইরকম প্রয়াসে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে সরকার তার দশগুণ অর্থ খরচ করেছে। কত ভালো হত যদি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রোপকরণ উৎপাদনের উপর একটা অনুসন্ধান চালানো যেত, যাতে যুদ্ধ বা অন্যান্য কারণে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ যদি ব্যাহত হয় তাহলে ওইসব জিনিসের যোগান ঠিক থাকে। অন্যান্য যে মৌলিক শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করা দরকার তাতে পড়ে জ্বালানি শিল্প, ধাতু উৎপাদন এবং ভারী রাসায়নিক শিল্প। এইদিক থেকে দেশের সহায়সম্বল ঠিকমত অনুসন্ধান করা হয়নি। ছোটখাটো শিল্প যা আছে তা বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণাধীন, ফলে হয়েছে অসম্ভব অপচয়। জ্বালানি শিল্প সম্পর্কে এ-কথা বেশি খাটে।

শেষ মৌলিক শিল্প যানবাহন এবং যোগাযোগ শিল্প। এতে পড়ে রেল, নৌস্টীমার, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, রেডিও ইত্যাদি। বর্তমানে রেল আছে রেলওয়ে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে, এবং বোর্ড সম্পূর্ণরূপে ইওরোপীয়

পরিচালনাধীনে। রেলের চাহিদার সামান্য ভগ্নাংশমাত্র দেশে প্রস্তুত হয়। নৌপরিবহন সম্পর্কে উপকূলবর্তী নাব্য এলাকায় ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া, অভারতীয়দের অসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা থাকায় সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের হাতে। বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে চালান আসে। রেডিও সম্পর্কে আমি প্রস্তাব করতে চাই এর কী সম্ভাবনা আছে তাই নিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য একটা বিশেষ সাবকমিটি গঠন করা হোক।

পরিশেষে, আমাদের শিল্পযোজনার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও ঋণ যোগাড় করার অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় পরিকল্পনা কাগুজে নকশাই থেকে যাবে এবং আমাদের শিল্পপ্রগতির ক্ষেত্রে আমরা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারব না।

পর্ব ঃ ২য়

১৯৩৯

সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম কার্যক্রম

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৯, বোম্বাই থেকে প্রচারিত বিবৃতি

গত কয়েকমাস ধরে আমি যা বলে আসছি তার থেকে বেশি কিছু বিশেষভাবে আমার বলার নেই। আজ দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণপন্থীদের ভিতরে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে যেমন একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে বামপন্থীদের মধ্যেও তেমনি এসেছে দায়িত্বহীনতা ও অবিবেচনার দিকে ঝোঁক।

সরকারী দায়িত্বগ্রহণ নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে জাতীয় দুর্বলতার দিকগুলোকে প্রকট করে তুলতেও তা সাহায্য করেছে। আমি আজ দেখতে পাচ্ছি অনেকেই ভাবছেন এবং কল্পনা করছেন, আর কোন সংগ্রাম না করেই পূর্ণ স্বরাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

কংগ্রেসে এখন অন্য লোকেরাও আসতে শুরু করেছে যাদের নিজেদের স্বার্থের ধান্দা ছাড়া কিছু নেই এবং যারা কংগ্রেসকে বেশ একটা নিরাপদ সংগঠন বলে মনে করে। কয়েকটি প্রদেশে ভুয়ো সদস্যদের নাম লেখানোর যে হিড়িক দেখা যাচ্ছে প্রধানতঃ তার কারণ এই।

বামে দেখতে পাচ্ছি ছোটখাটো মতপার্থক্য নিয়ে দলাদলি করছে অসংখ্য দল উপদল। কংগ্রেসের বামপন্থীরা গত কয়েক মাসে প্রভাব বাড়ানো দূরের কথা, খুইয়েছে। কোন কোন উপলক্ষ্যে কিছু ব্যক্তি এমন আচরণ করেছে যাতে তাদের সমালোচকরা বলার সুযোগ পেয়েছে যে তারা সচেতন বা অচেতনভাবে হিংসার পোষকতা করছে।

আমার স্থির অভিমত এই যে, পূর্ণ স্বরাজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে

যাবার যে সুযোগ বর্তমানে আমাদের এসেছে তা নষ্ট হতে দেওয়া উচিত হবে না, কারণ এমন সুযোগ একটা জাতির জীবনে দুর্লভ। ওই এক উদ্দেশ্যে দক্ষিণের সঙ্গে বামের সহযোগিতা করা উচিত যতক্ষণ তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব। কিন্তু নিজেরা যখন এত অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল তখন কী সহযোগিতা তারা করতে পারে? যাঁরা বামপন্থায় বিশ্বাসী তাঁরা ভেবে দেখলে ভালো করবেন, বাঁধাধরা একটা কার্যক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরকার চরমপন্থীদের নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে সংগঠিত করার জন্য কী কী ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন। ওইভাবে নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যখন তারা সংগঠিত হবে তখনই তারা পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার কর্তব্যে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রথমে যা দরকার তা এই যে, সকল কংগ্রেসসেবী যেন একই কণ্ঠে কথা বলে এবং একই ঈপ্সিত লক্ষ্য যেন তাদের চিন্তা হয়। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, কিছু কিছু কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে কংগ্রেসের আপসহীন মনোভাবের প্রস্তাবটাকে খাটো করে দেখা। এ-কথা আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখতে চাই যে, কোন কংগ্রেসসেবীর তা করার অধিকার নেই। আশা করি ভবিষ্যতে এরকম প্রয়াস আর হবে না। এও আশা করি, এইরকম দায়িত্বহীন ব্যক্তিরা ব্রিটিশ সরকারকে যে অযাচিত উপদেশ দিয়েছে তাতে কেউ বিপথচালিত হবে না।

এ-কথাও আমি বলে রাখতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জোর করে যদি চালানো হয়, সব দিকে একটা লড়াই বাধবে এবং এরকম লড়াই যদি বাধে, আমি সুনিশ্চিত, তা ব্রিটিশ-ভারতের জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। আমরা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি যখন আসল সমস্যা এ নয়, কী করে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে লড়াই করব, সমস্যা এই, যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটাকে নিঃশব্দে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অথবা তা অনির্দিষ্টকালের জন্য

মুলতবী রাখা হয় তখন আমরা কী করব। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিকল্পনাকে নীরবে ধামাচাপা দেবার যে রীতিমত সম্ভাবনা আছে, এ কেবল আমারই অভিমত নয়, কদিন আগে লর্ড মেস্টনের কাছ থেকে এমনই মনোভাবের আভাস পাওয়া গেল। আশা করি ত্রিপুরি কংগ্রেস এই প্রশ্নের যথোপযুক্ত জবাব দেবে। এই বিষয়ে আমার নিজের বক্তব্য পরিষ্কার এবং আমি তা আগেই বলেছি। মনেপ্রাণে যাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিনা সংগ্রামে স্বরাজ লাভ করা যাবে না, কংগ্রেসের মৌলিক নীতি অনুযায়ী আগামী দিনের ঘটনা-সন্নিবেশের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়া তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। তার অর্থ আরও বেশি সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুতি, আত্মশুদ্ধি, সংকীর্ণ দলাদলির অবসান এবং সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম কার্যক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরকার সাম্রাজ্যবিরোধী শক্তিকে সংগঠিত করা। এই-রকম সংগঠন প্রয়াস একদিকে যেমন নিয়মতান্ত্রিকতামুখী প্রবাহকে রোধ করবে অন্যদিকে তেমনই দায়িত্বহীনতা ও অবিবেচনার প্রবণতাকেও প্রতিহত করবে।

ত্রিপুরির সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক

সুভাষচন্দ্র বসুর প্রথম বিবৃতি

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৯

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিজের নাম প্রত্যাহার করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিবেচনা করে এবং তিনি যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তা পাঠ করে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ব্যাপারে আমার দিক থেকে কিছু বলা অত্যাবশ্যক মনে করছি। এই আলোচনা প্রসঙ্গে মিথ্যা বিনয়ের দ্বিধাসংকোচকে স্থান দিলে চলবে না, যেহেতু বিতর্কের বিষয় ব্যক্তিগত নয়। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম উত্তরোত্তর শাণিতরূপ নেবার ফলে নতুন নতুন ধারণা, ভাবাদর্শ, সমস্যা ও কার্যতালিকার উদ্ভব হয়েছে। ফলতঃ জনসাধারণ এই মতকেই মেনে নিচ্ছে যে, অন্যান্য স্বাধীন দেশে যেমন হয় তেমনই ভারতবর্ষেও প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি সমস্যা ও কার্যতালিকার ভিত্তিতে, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিবাদের বিষয়-গুলিকে প্রাঞ্জল করতে পারে এবং জনমানসের চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তুলে ধরতে পারে। এই অবস্থায় একটা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছিত ব্যাপার হবে বলে মনে হয় না।

এখনও পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আমাকে সরে দাঁড়াবার জন্য কোন একজন ডেলিগেটও আমাকে উপদেশ দেননি বা সেরকম প্রস্তাবও করেননি। বিপরীতপক্ষে আমাকে না জানিয়ে বা আমার বিনা সম্মতিতে কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমাকে মনোনীত করা হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজতন্ত্রী ও সেইসঙ্গে অসমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ পাচ্ছি যাতে আমি সরে না দাঁড়াই। এ ছাড়াও মনে হয় সাধারণের মধ্যে একটা মনোভাব দেখা দিয়েছে

যে, আরও একটা মেয়াদ আমাকে পদস্থ রেখে সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। হতে পারে, আমার এ ধারণা ঠিক নয় এবং ডেলিগেটদের অধিকাংশ আমার নির্বাচন চান না। ২৯শে জানুয়ারি যখন ভোট গ্রহণ করা হবে একমাত্র তখনই তা যাচাই করা যাবে, তার আগে নয়।

কর্মীহিসেবে আমার কর্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। কোন্ পদাধিকারে আমি সেবা করব তা আমার বলার কথা নয়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন আমার দেশবাসীরা এবং এই বিশেষক্ষেত্রে আমার বন্ধু ডেলিগেটরা। কিন্তু কোন বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত থেকে সেবা করতে আমাকে যদি আদেশ দেওয়া হয় এবং যখন আদেশ দেওয়া হবে, সেই আদেশ অমান্য করার কোন অধিকার আমার নেই। প্রকৃতপক্ষে, আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নিতে আমি যদি দ্বিধা করি, আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করব। আন্তর্জাতিক সঙ্কট যেভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠছে সেদিক থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নববর্ষ হবে গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই এবং আরও অন্যান্য কারণে ডেলিগেটদের অধিকাংশ যদি দাবি করেন পদস্থ থেকে আমি সেবা করি, কোন্ যুক্তিতে আমি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াই, বিশেষ করে যে প্রশ্ন এতে জড়িত তা যখন মোটেই ব্যক্তিগত নয়? এতৎসত্ত্বেও যদি মৌলানা আজাদের মত সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাদের আবেদনের ফলে ডেলিগেটদের অধিকাংশ আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, আমি তাঁদের রায় মাথা পেতে নেব এবং সাধারণ সৈনিক হিসেবে দেশকে ও কংগ্রেসকে সেবা করে যাব। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে আমি না ভেবে পারছি না যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবার কোন অধিকার আমার নেই। অতএব অকপটভাবে আমি নিজেকে আমার বন্ধু ডেলিগেটদের হাতে সমর্পণ করছি। তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নেবেন তাই মাথা পেতে নেব

২৪শে জানুযারি ১৯৩৯ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিব দুই সদস্য বল্লভভাই প্যাটেল ও শবৎচন্দ্র বসুব মধ্যে টেলিগ্রাম বিনিময়।

(১) প্যাটেল : বসু

মনে করি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে সুভাষবাবুর বিবৃতির ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের প্রতিবাদ প্রযোজন। কমিটি এই বৎসর পুনর্নির্বাচন অপ্রয়োজনীয় বোধ করে। সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রস্তুত। ইহাতে বলা হইয়াছে, পুনর্নির্বাচন কেবলমাত্র অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য। সুভাষ-বাবুকে পুনর্নির্বাচনের পক্ষে বর্তমান অবস্থা সেরূপ নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে সুভাষবাবুর মতামত ইহা খণ্ডন করিয়াছে, বলিয়াছে, কার্যপদ্ধতি ও নীতি স্থির করে প্রেসিডেণ্ট নয়, কংগ্রেস বা ওয়ার্কিং কমিটি। প্রতিবাদ বিবৃতি ডক্টর পট্টভির নির্বাচন সুপারিশ করিয়াছে এবং প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে কংগ্রেসীদের বিভক্ত না করিতে সুভাষবাবুকে আবেদন করিয়াছে।

(২) বসু : প্যাটেল

টেলিগ্রাম আজ সকালে পাইয়াছি। সিলেট হইতে আসার পথে মৌলানার ও সুভাষের বিবৃতি পড়িয়াছি। আমার মতে মৌলানার প্রত্যাহারের পর ডক্টর পট্টভিকে দাঁড় করানো অবাঞ্ছিত। আগামী বৎসর সব দিক হইতে ১৯৩৭ তুলনায় আরও সংকটময় ও অস্বাভাবিক। দৃঢ় অভিমত, ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্যের সহকর্মীদের মধ্যে নির্বাচনদ্বন্দ্বে পক্ষগ্রহণ উচিত নয়। আপনার প্রস্তাবিত বিবৃতি দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে দলাদলি বাড়াইবে, যাহাতে না হয় তাহাই উচিত। আগামী সংগ্রামে ডক্টর পট্টভি দেশের আস্থা জাগাইতে অক্ষম। অনুগ্রহ, কংগ্রেসকে বিভক্ত করিবেন না।

(৩) প্যাটেল ঃ বসু

আপনার টেলিগ্রাম অবধারণ করিলাম। নিছক কর্তব্যবোধ বিবৃতি-দানে বাধ্য করিয়াছে। বিরোধ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, নীতিতে নীতিতে। নির্বাচনদ্বন্দ্ব অনিবার্য হইলে আশা করি তাহা হইবে বিনা তিক্ততায ও উদ্দেশ্য আরোপিত না করিয়া। দেশের স্বার্থে পুনর্নির্বাচন অনিষ্টকর বিবেচিত।

বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম, জে বি কৃপালনী, যমনালাল বাজাজ, শঙ্কররাও দেও এবং ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ সারা ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিবৃতি।

২৪ জানুয়ারি, ১৯৩৯

সুভাষবাবুর বিবৃতি যেরকম যত্নসহকারে পাঠ করা দরকার আমরা সেইভাবে পাঠ করিয়াছি। যতদূর আমরা জানি, অদ্যাবধি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হইয়াছে। সুভাষবাবু একটি নূতন নজির সৃষ্টি করিরাছেন যাহা করিবার অধিকার তাঁহার সম্পূর্ণ আছে। যে পন্থা তিনি অবলম্বন করিযাছেন তাহার ন্যায্যতা একমাত্র অভিজ্ঞতা দ্বারাই যাচাই হইবে। এই বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে পরিণত করিবার পূর্বে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অধিকতর সংহতি, সহনশীলতা এবং অপরের মতামতের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে পারিতাম। বিবৃতি সম্পর্কে কিছু না বলিলে যদি হইত আমরা তাহা হইলে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে আমরা যখন দৃঢ় অভিমত পোষণ করি, তাহা না বলিলে আমরা বোধ করি আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্যে অবহেলা করিব।

আমাদের নিকট ইহা গভীর দুঃখের বিষয় যে মৌলানা সাহেব

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিরত থাকা শ্রেয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি বিরত থাকিবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিলেন, তিনি আমাদের কয়েকজনের সহিত পরামর্শক্রমে ডক্টর পট্টভির নির্বাচন সমর্থন করেন। অনেক দিক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমরা মনে করি, অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়া একই প্রেসিডেন্টকে পুনরায় নির্বাচন না করার রীতিকে মানিয়া চলার নীতিই ঠিক।

সুভাষবাবু তাঁহার বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার বিরোধিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যই একই মত পোষণ করেন। ইহা কংগ্রেসেরই নীতি। তিনি ভাবাদর্শ, নীতি ও কার্যক্রমের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা মনে করি এই সব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিবার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নহে।

প্রেসিডেন্ট পরম্পরা কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত করেন না। যদি তাহাই হইত, গঠনতন্ত্রে ওই পদ এক বৎসরের জন্য সীমিত হইত না। কংগ্রেসের নীতি ও কার্যপদ্ধতি যখন কংগ্রেস নিজে স্থির করে না, তখন ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা তাহা নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রেসিডেন্টের স্থান চেয়ারম্যানের মত। অধিকন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে যেরূপ হইয়া থাকে প্রেসিডেন্ট সেইরূপ জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রতীক ও প্রতিনিধি। অতএব এই পদটিকে যথার্থভাবে অত্যন্ত উচ্চ সম্মানজ্ঞাপক পদ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে এবং সেই কারণে বাৎসরিক নির্বাচন দ্বারা জাতি তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানের মধ্যে যতজনকে সম্ভব এই সম্মানে ভূষিত করার প্রয়াসী। এই উচ্চ পদমর্যাদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই নির্বাচন সর্বদাই সর্ববাদিসম্মত হইয়াছে। এমন কি নির্বাচন প্রসঙ্গে নীতি ও কার্যক্রম লইয়াও কোনপ্রকার বাকবিতণ্ডা এই কারণে অবাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বাস করি ডক্টর পট্টভি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদের পক্ষে যথেষ্ট যোগ্য। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রাচীনতম সদস্যদের মধ্যে অন্যতম এবং দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন জনসেবার সুনাম তাঁহার রহিয়াছে। সুতরাং নির্বাচনের জন্য আমরা তাঁহার নাম

কংগ্রেস ডেলিগেটদের নিকট সুপারিশ করিতেছি। সহকর্মী হিসাবে আমরা সুভাষবাবুকেও বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন তাঁহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন এবং ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার নির্বাচনকে সর্ববাদিসম্মত হইতে দেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় বিবৃতি

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩৯

ওয়ার্কিং কমিটির আমার কোন কোন বিশিষ্ট সহকর্মীর সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে রত হওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক দায়িত্ব, কিন্তু ঘটনাপরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, এ ব্যাপারে আমার কোনই হাত নেই। গত ২১ তারিখে আমি প্রথম যে বিবৃতিটি প্রকাশ করি তা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের বিবৃতির অনিচ্ছাকৃত প্রত্যুক্তি এবং আমি এখন যা বলছি তা সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতাদের চ্যালেঞ্জ করা বিবৃতি দেওয়ার ফলে আমার অনিচ্ছাকৃত জবাব। এই প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা শুরু করার দায়িত্ব আমার নয়, এ দায়িত্ব আমার বিশিষ্ট সহকর্মীদের। ওয়ার্কিং কমিটির দুজন সদস্যদের মধ্যে নির্বাচনদ্বন্দ্বে অন্যান্য সদস্যরা সংগঠিতভাবে কারও পক্ষ সমর্থন করবেন আশা করা যায় না, যেহেতু স্পষ্টতঃ তা ন্যায়সঙ্গত নয়। সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতারা নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, ব্যক্তিগত কংগ্রেসসেবী হিসাবে করেন নি। আমি জিজ্ঞাসা করি, এটি ন্যায়সঙ্গত কিনা, বিশেষ করে যখন ওয়ার্কিং কমিটি এই বিষয় নিয়ে কখনও আলোচনা করেনি। ওই বিবৃতি থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারি ডক্টর পট্টভির নির্বাচনকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত অনেক বিচার-বিবেচনার পর গ্রহণ করা হয়েছে। না আমার, না ওয়ার্কিং কমিটির আমার কোন কোন সহকর্মীর এই বিচার বিবেচনা বা সিদ্ধান্তের বিষয় জানা ছিল, বা

সে-সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল। স্বাক্ষরকারীরা ভালো করতেন যদি তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে বিবৃতিটি প্রচার না করে ব্যক্তিগত কংগ্রেসসেবী হিসাবে প্রচার করতেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে যদি নিবাচন নামের যোগ্য হতে হয়, তাহলে নৈতিক চাপ ছাড়া ভোট দেবার স্বাধীনতা থাকা উচিত, কিন্তু এই ধরনের বিবৃতি কি নৈতিক চাপের নামান্তর নয়? প্রেসিডেন্টকে যদি ডেলিগেটদের নিবাচিত করতে হয় এবং তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের মনোনয়নে না হন, তাহলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য নেতারা তাদের প্রচারিত বিবৃতি কি প্রত্যাহার করবেন এবং ডেলিগেটরা তাঁদের খুশিমত যাকে ভোট দিতে চান তাঁদের উপরই তা ছেড়ে দেবেন? ডেলিগেটদের যদি খুশিমত ভোট দেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, নিবাচনদ্বন্দ্বের ফলাফল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে এই নির্বাচন ব্যবস্থার ইতি করে ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করলেই তো হয়।

আমার কাছে এটি একটি সংবাদ যে এমন একটি নিয়ম নাকি আছে যাতে অস্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়া একই লোককে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় না। যদি কেউ কংগ্রেসের ইতিহাস অনুধাবন করেন তাহলে তিনি দেখতে পাবেন বেশ কিছু ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার নির্বাচিত করা হয়েছে। আমি আরও এই মন্তব্য দেখে অবাক হচ্ছি যে অদ্যাবধি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সর্ববাদিসম্মত হয়ে এসেছে। বেশ কয়েকবার আমার মনে আছে আমিই একজনকে ভোট না দিয়ে আরেকজনকে দিয়েছি। সম্প্রতি কয়েক বছর মাত্র নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হচ্ছে।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর থেকে, ওয়ার্কিং কমিটি, অন্ততঃপক্ষে নিয়ম রক্ষার জন্য, প্রেসিডেন্টের মনোনয়নে হচ্ছে। ওই বৎসর থেকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদা আরও উঁচু স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। এতএব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর

নির্বাচনকে ঘিরে এখন নতুন প্রথা গড়ে উঠবে, এইটেই স্বাভাবিক। আজকের দিনে প্রেসিডেন্টের অবস্থা কোন সভার চেয়ারম্যানের মত আর নয়। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মত, যিনি তাঁর কেবিনেট নিজেই মনোনীত করেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে নিয়মতান্ত্রিক অধিপতির সঙ্গে তুলনা করা মোটেই ঠিক নয়। এ-কথাও আমি বলে রাখতে পারি যে, নীতি ও কার্যক্রমের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বহু আগেই এ-প্রশ্ন উঠত যদি না ১৯৩৪-এর কংগ্রেসের পর থেকে দক্ষিণপক্ষ ও বামপক্ষ, উভয়পক্ষের সমর্থনে একজন বামপন্থীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হত। এই বৎসর এই প্রথার ব্যতিক্রম এবং প্রেসিডেন্ট পদের জন্য একজন দক্ষিণপন্থীকে দাঁড় করানোর প্রয়াস মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। আগামী বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে একটা আপসরফার সম্ভাবনা আছে, অনেকেরই এই ধারণা। স্বভাবতঃ দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থী প্রেসিডেন্ট চান না, যেহেতু তিনি আপসরফার পথে কণ্টক হতে পারেন এবং আপস-আলোচনার পথে বাদ সাধতে পারেন। জনসাধারণের ভিতরে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেই জানা যায় এই ধারণা কতখানি ব্যাপক। এই পরিস্থিতিতে এমন একজনের প্রেসিডেন্ট হওয়া একান্ত দরকার যিনি অন্তরের অন্তস্তল থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী।

আমার কাছে বাস্তবিক এটি দুঃখের বিষয় যে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধবদের জানিয়েছিলাম, এই বৎসর বামপক্ষ থেকে নতুন একজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো উচিত হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা হল না এবং কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমার নাম প্রস্তাব করা হল। দেরিতে হলেও এখনও আমি নির্বাচনদ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত, যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সত্যকার বিরোধী, আচার্য নরেন্দ্র দেওয়ের মত কাউকে আগামী বৎসরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আমার

দৃঢ় ধারণা, এই বৎসরের মত গুরুত্বপূর্ণ বৎসরে প্রেসিডেণ্টের আসনে সত্যকার একজন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধীকে আমাদের দরকার। দক্ষিণপক্ষ যদি আন্তরিক জাতীয় ঐক্য ও সংহতি চান, তাহলে তাঁরা ভালো করবেন যদি একজন বামপন্থীকে প্রেসিডেন্ট করেন। যে কোন মূল্যে এবং অশোভন উপায়ে এমন একজন দক্ষিণপন্থী প্রার্থীকে দাঁড় করাবার জন্য তাঁরা উঠেপড়ে লোগেছেন যিনি অবসর নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন এবং তাঁর নাম প্রেসিডেন্টপদের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে শুনে যিনি নিজেই অবাক হয়েছেন। এর ফলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্তে দেশে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের অঙ্গ এবং সেইদিক থেকে আমরা এ বিষয়ে নির্বিকার হয়ে থাকতে পারি না। দেশের সামনে এখন আসল প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রতিহত করে বর্তমান সঙ্কটে জাতীয় সংহতিকে বজায় রাখায় বিশ্বাসী, যে প্রার্থী স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন জোর করে তাঁকে মনোনীত করে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরানো তাঁদের পক্ষে উচিত হবে না।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে ডেলিগেটদের ব্যাপার এবং তা তাঁদেরই কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপক্ষ, নিঃসন্দিগ্ধভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেরিতে হলেও তাঁরা এখনও বামপন্থী একজন প্রার্থীকে গ্রহণ করে বামপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারেন। আমি আশা করি আমার আবেদন ব্যর্থ হবে না।

পট্টভি সীতারামাইয়ার বিবৃতি

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩৯

প্রেসিডেণ্ট আসনের জন্য নির্বাচনদ্বন্দ্ব আপাততঃ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন উক্ত বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত নানা লেখায় যে কয়েকটি দিকের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমার পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি দেওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

১৭ই জানুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে আমি বর্দোলি ত্যাগ করি এবং ওইদিন সন্ধ্যাতে বোম্বাই পৌঁছাই; এবং সেই সময়ে আমার মনে যে ধারণা ছিল তাহা এই যে, কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নির্দিষ্ট রহিয়াছেন।

একাধিক কারণে এই অভিমত আমি নিজেও বরাবর পোষণ করিয়াছি। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টায় আমি আমার বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দেখিতে পাই মৌলানা আজাদের নিকট হইতে একটি টেলিফোন বার্তা আমার নিকট আগেই আসিয়াছে, তাহাতে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে তাঁহার সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিতে বলিয়াছেন। আমি তাহা করি এবং মৌলানা আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন।

আমি ভাবিয়া পাইলাম না তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান কেন, কিন্তু এই বিষয়ে চিন্তা না করিয়া আমি অবিলম্বে রাত্রের আহার সমাধা করি, যেহেতু আমার আগেই স্থির ছিল যে ওই রাত্রেই ১০টা ২০-র মাদ্রাজ মেলে আমি বোম্বাই ত্যাগ করিব। তৎপূর্বে মৌলানার সহিত দেখা করিয়া যাইব স্থির করি।

ইত্যবসরে সংবাদপত্রের কতিপয় বন্ধু আমার আবাসস্থলে ঘটনাচক্রে উপস্থিত হন এবং কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জানান যে, তিনজন প্রার্থী হইয়াছে তন্মধ্যে আমি অন্যতম। যেহেতু আমার বিশ্বাস করিবার

কারণ ছিল যে, প্রেসিডেন্টপদের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত মৌলানা একজন প্রার্থী, আমি তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়া একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রদান করি। টেলিফোন মারফত তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ করা হয়।

অতঃপর আমি মৌলানার বাসস্থানের দিকে রওনা হই এবং পথে বেজওয়াদায় যাইবার জন্য টিকিট ক্রয় করি। মৌলানার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কিছুটা তাড়াহুড়া করিয়া আমি তাঁহাকে যখন জানাই যে আমি আমার নাম প্রত্যাহার করিয়াছি, তিনি তখন বলেন তিনিও নাম প্রত্যাহার করিতেছেন এবং পরের দিন প্রাতে বর্দোলী যাত্রা করিতেছেন। তিনি আমাকে আমার প্রত্যাহারপত্র বাতিল করিতে পীড়াপীড়ি করেন।

ঐভাবে চিন্তা না করিবার জন্য তাঁহাকে কিছুকাল উপরোধ করিবার পর যখন আমি বুঝিলাম যে, অনাবিল আন্তরিকতা তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্তগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তখনই আমি টেলিফোন করিতে যাই এবং আমার প্রত্যাহার-বিবৃতি প্রত্যাহার করি।

পরদিবস সন্ধ্যায় আমি বোম্বাই ত্যাগ করি এবং ২১শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় মৌলানার নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাই। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, আমার সপক্ষে তিনি নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং এই আশা ব্যক্ত করিয়াছেন যে আমার নির্বাচন যেন সর্বসম্মত হয়।

ইহা সত্য যে আমার মনোনয়ন আমার অজ্ঞাতেই হইয়াছে, তবে এইমত প্রত্যাশা করিবার কারণ আমার ছিল, কারণ কিছুকাল হইতে সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের এবং বিশেষ করিয়া অন্ধ্রের জনসাধারণের মধ্যে সর্বসম্মত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছিল যে, এইবারে দক্ষিণাঞ্চলের তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া অন্ধ্রের কংগ্রেসসেবীদের মধ্য হইতেই কারও প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত।

আমি বরাবরই এইমত উচ্চাভিলাষ নিরুৎসাহিত করিয়াছি, তৎসহ আকাঙ্ক্ষাপূরণের পরিসরও সীমিত রাখিয়াছি।

কংগ্রেসের দিক হইতে প্রতিবৎসর এমন এক ব্যক্তির প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত যিনি কালোচিত প্রয়োজন মিটাইতে পারেন, এবং বিভিন্ন দাবিদার বা বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমানভাবে সম্মান বণ্টনের বিষয়রূপে প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন উচিত নয়।

অধিকন্তু আমি ১৯১৬ সালে চিকিৎসাব্যবসায় ত্যাগ করার পর হইতে জনসমাজে সর্বক্ষণের কর্মীরূপে কাজ করিয়া আসিতেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র সেবার আদর্শে আমি সর্বদা অনুপ্রাণিত হইয়াছি এবং কখনোই আমার মনের অন্তরতম কন্দরেও কোনপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি নাই। কিন্তু যখন মৌলানা তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিলেন, যখন কংগ্রেসসেবী ও অন্যান্যরা, শ্রদ্ধেয় গুরুদেব, গণ্যমান্য প্রধান ব্যক্তিরা, এককথায় বিভিন্ন মতাশ্রয়ী জননেতারা ব্যাপকভাবে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; যখন আবার মৌলানা নির্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার নাম প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে আমার সাফল্য কামনা করিয়া আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যখন আমি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইলাম, মৌলানার প্রার্থীপদের পরিবর্তে আমার নাম ওয়ার্কিং কমিটির আমার অনেক সহকর্মীর নিকট এবং অন্যত্র অনুমোদন লাভ করিবে, তখন আমার মনে হইল প্রার্থীরূপে আমার মনোনয়ন জনসমাজের দিক হইতে আমার প্রতি কর্তব্যের আহ্বান, যাহা আমার পক্ষে সহজে উপেক্ষা করা উচিত হইবে না।

অতঃপর আজিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আমার মনোভাব কী সেই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিতে আমি ইচ্ছা করি। গান্ধীবাদের আমি যে একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ইহা দেশে মোটামুটি সুবিদিত।

এই বিষয়ে এবং আজিকার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রশ্নের উপর আমি বহুবার বলিয়াছি এবং প্রচুর লিখিয়াছি। ১৯৩৫-এর ভারত-সরকার আইনের অন্তর্ভুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে দেশে অন্যের তুলনায় আমি কিছু কম করি নাই।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ও হরিপুরা অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে আমার

অধিকতর স্বাধীনতা ছিল এবং সেই স্বাধীনতার আমি সদ্ব্যবহার করিয়াছি যে-ভারতীয় শাসনতন্ত্র আমাদের উপর চাপাইয়া দিবার প্রয়াস হইতেছিল সেই শাসনতন্ত্রকে নস্যাৎ করিতে।

হরিপুরার পর হইতে মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া সংযত হইতে হইয়াছিল।

আমার যতদূর জানা আছে এবং যতদূর বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রশ্নে ব্রিটিশের সহিত আপসরফায় আসিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্যের দিক হইতে কোনপ্রকার প্রয়াস হয় নাই। সম্প্রতি আমি নিজে অভ্রান্তভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি যে, বড়লাটের বিবৃতিটি কংগ্রেসের নিকট হইতে সাড়া পাইবার জন্য মৃদু আহ্বান, এবং কংগ্রেসের তরফ হইতে তাঁহাকে যোগ্য জবাব কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নিজেই ইতোপূর্বে দিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যের বিষয়ে আমি সামান্য কিছু বলিতে চাই। বিগত তিন বৎসর যাবৎ আমি যে দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হইয়া এই বিষয়ে আগ্রহী, তাহা এই যে, যদি আমরা দেশের সাম্প্রদায়িক অঙ্গচ্ছেদে প্রস্তুত না থাকি, আঞ্চলিকভাবে দেশকে খণ্ডবিখণ্ড হইতে দিতে ততোধিক প্রস্তুত নই।

যুক্তরাষ্ট্র আমরা নিঃসন্দেহে চাই, কিন্তু ব্রিটিশ পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বিসদৃশ ও পঙ্গু করিতে বাধ্য—এমন একটি দেশে পরিণত করিবে, যাহার একদিক পরিপূর্ণ এবং অন্যদিক বিকল।

দেশীয় রাজ্যগুলির বিরাট জাগরণে কংগ্রেসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইতে পারে। যদি আমি নির্বাচিত হই আমার নির্বাচনকে দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে আমার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি বলিয়া গণ্য করিব।

আমি অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে কাজ করিতেছি। কংগ্রেস কর্মীদের ভিতর শৃঙ্খলা-ভঙ্গের দুর্নীতির দৃষ্টান্ত আমার নজরে আসিয়াছে। যদি নির্বাচিত হই আমি আমাদের নিজেদের গৃহের শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে আমার যথাশক্তি প্রয়োগ করিব।

একটি কথা এখনও বুঝাইয়া বলা হয় নাই। আমি মিস্টার সুভাষচন্দ্র বোসের পক্ষে আমার নাম প্রত্যাহার করিলাম না কেন? তাহা আমি পারি না যেহেতু আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের ইচ্ছাকে অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সানন্দে আমি সরিয়া দাঁড়াইতাম যদি আমার সহকর্মীদের সহিত আমি একমত না হইতাম যে, অস্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়া একই ব্যক্তির উপর্যুপরি নির্বাচন হওয়া উচিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে এই-প্রকার কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে নাই।

বল্লভভাই প্যাটেলের বিবৃতি

বর্দোলি
২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩৯

মিস্টার সুভাষ বোসের বিবৃতিটি অদ্ভুত। আসল ঘটনা এই। ১৯২০ সাল হইতে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটির কিছু কিছু সদস্য ঘরোয়াভাবে পরামর্শ করিয়া থাকেন। মিস্টার গান্ধী যখন ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন তিনি প্রেসিডেন্ট আসনে নির্বাচনের জন্য একটি নাম সুপারিশ করিয়া পাঠাইতেন, কিন্তু কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইবার পর হইতে তিনি এইপ্রকার নির্দেশ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন।

এতৎসত্ত্বেও, ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে সদস্যরা নির্বাচন সম্পর্কে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন। এই বৎসরও কয়েকজন সদস্যের সহিত আমার আলোচনা হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হইয়াছে একমাত্র মৌলানা আজাদই নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না।

বর্দোলিতে যে সপ্তাহে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলিতেছিল, সেই সময়ে মিস্টার গান্ধী মৌলানাকে আবেদন করেন যাহাতে তিনি

মনোনীত হইতে রাজী হন। কিন্তু তিনি অটল থাকেন। ১৫ই জানুয়ারি প্রত্যূষে তিনি কিন্তু মিস্টার গান্ধীর সমীপে আসিয়া তাঁহাকে জানান যে তাঁহার ইচ্ছা অমান্য করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং আমাদের নিশ্চিন্ত করিয়া তিনি নির্বাচনে দাঁড়াইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তখন আমরা জানিতাম যে ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়াকে অন্ধ্রের কিছু কিছু বন্ধু মনোনীত করিয়াছেন, এবং আমরা এও জানিতাম যে, মিস্টার সুভাষ বোসও মনোনীত হইয়াছেন। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে তাঁহারা উভয়েই নির্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন এবং মৌলানা সাহেব সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইবেন।

ইহার মধ্যে কোন এক পর্যায়ে একটি ঘরোয়া আলোচনা হয় এবং তাহাতে উপস্থিত থাকেন, পূর্বনির্দিষ্টক্রমে নয়, (দৈবক্রমে) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিস্টার ভুলাভাই দেশাই, আচার্য কৃপালনী, মিস্টার গান্ধী। আমিও সেখানে ছিলাম। সকলে একমত হন যে, যদি দৈবক্রমে মৌলানা তাঁহার আপত্তিতে অটল থাকেন, তাহা হইলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ডক্টর সীতারামিয়া নির্বাচনের জন্য একমাত্র প্রার্থী থাকিয়া যাইবেন, যেহেতু আমাদের সকলের সুস্পষ্ট অভিমত এই ছিল যে মিস্টার সুভাষ বোসকে পুনর্নির্বাচিত করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মনে বামপন্থী দক্ষিণ-পন্থীর কোন প্রশ্নই দেখা দেয় নাই।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গতবৎসর মিস্টার সুভাষ বোসের নিজের নির্বাচনে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল ঠিক তাহাই যে বর্তমানে অনুসরণ করা হইতেছে তিনি তাহা জানেন। তখন কেবল অন্যান্য প্রার্থীদিগকে নাম প্রত্যাহারে রাজী করাইতে আমাদের কোন বেগ পাইতে হয় নাই।

পূর্বপ্রসঙ্গে আসা যাক। যদিও মৌলানা সাহেব রাজী হইয়াছিলেন কিন্তু বোম্বাই পৌঁছিবার পর তাঁহার মন পুনরায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং উচ্চপদের গুরুভার বহন করিতে পারিবেন না চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার কথা বলিতে তিনি মিস্টার গান্ধীর নিকট

আবার ছুটিয়া গেলেন। মিস্টার গান্ধী মৌলানাকে আর পীড়াপীড়ি করিতে চাহিলেন না। পরবর্তী ঘটনার কথা দেশের সকলেই জানেন।

দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি যে মিস্টার সুভাস বোস (বর্দোলি বিবৃতির) স্বাক্ষরকারীদিগকে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি, ভারত-সরকার আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে চায় এমন কোন সদস্যের কথা আমার জানা নাই।

এবং যতই হউক, কোন একজন সদস্য, এমন কি কংগ্রেসের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পর্যন্তও, এইপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। একমাত্র কংগ্রেসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। অতএব, কংগ্রেস অধিবেশন যখন থাকে না, তাহা পারে সমগ্রভাবে ওয়ার্কিং কমিটি।

এমন কি ওয়ার্কিং কমিটিরও কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতির বাক্য বা অর্থ কোনটি হইতে বিচ্যুত হইবার ক্ষমতা নাই।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নীতি প্রবর্তন করিবার কোন ক্ষমতা আছে এই মত আমি একেবারেই সমর্থন করি না, যদি না তাহা ওয়ার্কিং কমিটির সম্মতি লাভ করে।

একাধিকবার প্রেসিডেন্টদিগের বিরোধিতা সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটি নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; অবশ্য প্রেসিডেন্টদিগের সপক্ষেও ইহা বলিতে হইবে যে তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটির ইচ্ছাকেই সর্বদা নতমস্তকে মানিয়া লইয়াছেন।

সকল সহকর্মী বর্দোলিতে না থাকায় এবং সময় স্বল্প হওয়ায়, আমি আমার সহকর্মীদের মতামত না লইয়াই মিস্টার সুভাষ বোসের বিবৃতির উত্তর দিবার স্বাধীনতা গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ অভিমত ইচ্ছামত দিতে পারেন।

আমার নিকট, এবং যাঁহাদের সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি তাঁহাদের নিকট প্রশ্নটি ব্যক্তির বা নীতির নহে,

বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীরও নহে। একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হইতেছে, দেশের সর্বাধিক স্বার্থসম্মত কী।

যাঁহারা মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমার মতে ডেলিগেটদিগকে পথনির্দেশ দিবার পুরোপুরি অধিকার তাঁহাদের আছে। আমি প্রায় প্রত্যহই ডেলিগেটদের নিকট হইতে পত্র বা তার পাই যাহাতে তাঁহারা নির্দেশ চান, এবং আমার মনে হয় অন্যান্য সহকর্মীরাও নিশ্চয় তাহা পান।

এই অবস্থায় অধিকার কর্তব্যও বটে। তবে পথনির্দেশ দিবার পর একমাত্র ডেলিগেটরাই যে ভাবে ভোট দেওয়া শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিবেন সেইভাবে ভোট দিবেন।

জহরলাল নেহরুর বিবৃতি

আলমোড়া
২৬শে জানুয়ারি ১৯৩৯

গত দশদিন আমি কুমায়ুন পাহাড়ে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছি। এখানে সংবাদপত্র দেরিতে পৌঁছায় এবং কখনো কখনো রেডিওর সংবাদ হইতে আমাকে খবর পাইতে হয়। এই অবস্থায় কোন বাদপ্রতিবাদে অংশগ্রহণ করিবার দায় আমার নাই এবং থাক বা নাই থাক আমার তাহা করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যতটুকু সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাতে আমার ধারণা হইতেছে, যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হইয়াছে সেইগুলি ঠিক নহে এবং প্রেসিডেন্ট সংক্রান্ত বাকবিতণ্ডা যে দিকে চলিয়াছে তাহা দুর্ভাগ্যজনক। অতএব জনসাধারণের সমক্ষে আমি সবিনয়ে এমন কয়েকটি বিষয় উপস্থাপিত করিতে চাই যাহা এই পরিস্থিতিকে সহজ করিতে সাহায্য করিতে পারে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের প্রথম বিবৃতিটি ছাড়া এতাবৎ যে সকল বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমি পাঠ করি নাই।

প্রারম্ভে আমি ইহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া রাখিতে চাই, আমি এই বিবৃতি প্রেসিডেন্টপদের জন্য কোন প্রার্থীর সপক্ষে বা বিপক্ষে দিতেছি না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঠিকই, তবুও তাহা গৌণ। তাহা হইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মপন্থা। অতীতে আমি দেখিয়াছি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এই নীতি নির্ধারণে বিশেষ তারতম্য ঘটায় না। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস বা এ. আই. সি. সিই নীতি নির্ধারিত করে। নীতিকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে অবশ্য প্রেসিডেন্ট তারতম্য ঘটাইতে পারেন, এবং আমার মতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কেবলমাত্র প্রবক্তা নন।

সবিনয়ে আমি ইহাও জানাইতেছি যে আমি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরোধী নই, বরঞ্চ আমি মনে করি, যখন সুনির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, নির্বাচনদ্বন্দ্ব সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ বাঞ্ছনীয় এবং সংঘর্ষের কারণ বুঝাইতে সহায়তা করে। এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোন্ কোন্ বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছে? ভারতবর্ষে অনেক গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উল্লেখ করা হইয়াছে, আমি ধরিয়া লইতেছি অন্যান্য বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কেই কি কোন মতবিরোধ আছে? আমার তাহা জানা নাই, এবং কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। ইংলণ্ডে আমি এই মনোভাব দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করি, এবং তাহা করিবার সময় আমি কেবল আমার নিজস্ব মতই প্রকাশ করি নাই, ওয়ার্কিং কমিটির অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছি। আমি যাহা বলিয়াছিলাম ও করিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও ওয়ার্কিং কমিটির নিকট যাহাতে পৌঁছায় সেইজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করি এবং আমি তাঁহাদের নির্দেশ চাহিয়া পাঠাই। আমাকে জানানো হইয়াছিল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আমি যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি তাহা ওয়ার্কিং কমিটির এবং গান্ধিজীর অনুমোদন লাভ করিয়াছে। সেই সময় হইতে দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট অনমনীয় হইয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়

কাঠামোর প্রশ্নে আপস-রফা করিবার কথা চিন্তা করা, মনে হয়, যে কোন কংগ্রেসসেবীর নিকট বীভৎস বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহে যে সংগ্রাম দানা বাধিয়া উঠিতেছে তাহা কি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সহিত আমাদের মিতালীর ভূমিকা? কি ভারতে, কি সারা পৃথিবীতে, আমরা দ্রুত একটি সঙ্কটের দিকে ধাবিত হইতেছি এবং এই সঙ্কটের দিকে দৃষ্টি রাখিযা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

আমার মনে হয় সময আসিয়াছে যখন আমাদের মন হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয কাঠামোর কথা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে, যেহেতু তাহা আমরা চাই না, অতএব তাহা আসিতে পারে না, এবং আন্তর্জাতিক কারণের কথা বাদ দিলেও আত্মনিযন্ত্রণের ভিত্তিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও সুনিশ্চিতভাবে আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। ব্রিটিশ সরকারের বৈদেশিক নীতি এমন ঘৃণ্য ও জঘন্য যে এই সরকারের সহিত আমার স্বদেশের কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকে আমি চাই না। সুতরাং এই নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো লইয়া বিরোধের কোন অবকাশ নাই। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অবশ্য অনেক বিরোধ রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনটিকেই এই নির্বাচন প্রভাবিত করিতেছে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সকল বিরোধ ও সমস্যার মীমাংসা চাই। আমাদের নিকট অত্যাবশ্যক প্রশ্ন, আসন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সঙ্কটে আমরা কিভাবে নিজেদের গঠিত করিব? আমাদের এমন কিছু করা হয়তো বিধেয় নয় যাহা নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিতে পারে এবং তাহার ফলে যে সময় আমাদের মিলিত শক্তির সর্বাধিক প্রয়োজন তখনই আমরা অশক্ত হইয়া যাইতে পারি।

দারুণ দুঃসময়ে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে এবং বেশ কয়েকবার আমি পদত্যাগের জন্য প্রায় প্রস্তুতও হইয়াছিলাম, কারণ আমি বোধ করিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসকে এবং আমাদের আদর্শকে পদাধিষ্ঠিত না হইয়াই আরও

ভালোভাবে সেবা করিতে পারিব। এই বৎসরও আমার কিছু কিছু সহকর্মী প্রেসিডেন্টপদের জন্য পুনরায় দাঁড়াইতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করি, কী কারণে করিয়াছি তাহা এখানে আলোচনা করিতে চাই না।

উল্লিখিত এবং আরও নানা কারণে সুভাষবাবুরও যে দাঁড়ানো উচিত হইবে না আমার নিকট তাহা সমান সুস্পষ্ট ছিল। আমার বোধ হইয়াছিল, এই পর্যায়ে তাঁহার এবং আমার কার্যকর কিছু করিবার সামর্থ্য এই পদ গ্রহণ করিলে হ্রাস পাইবে। সুভাষবাবুকেও আমি ইহাই বলিয়াছিলাম।

এই বৎসর প্রেসিডেন্টপদের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যে যথার্থ ব্যক্তি সে বিষয়েও আমার ধারণা ছিল সমান সুস্পষ্ট। সব দিক হইতে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলাম। আমাদের গুরুতর সমস্যাগুলির মধ্যে কিছু সমস্যার মোকাবিলা করিতে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। তাঁহার ছিল সেই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীল মন যাহা নিজের ছাড়াও অপরের মতামতকে অবধারণ ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তিনি কংগ্রেসের একজন প্রবীণ নেতা, সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ও আস্থাভাজন এবং আমাদের নানা দল ও মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার পক্ষে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। সবিনয়ে আমি আরও একটি কথা বলিতে চাই। বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমার তাঁহাকে জানার সৌভাগ্য হইয়াছে এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রেসিডেন্ট-পদের জন্য দাঁড়াইতে রাজী হইবার জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি এবং আরও অনেকেই করেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হইলেন না। তাঁহার দুর্বল স্বাস্থ্য, প্রচারবিমুখতা এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার অনিচ্ছা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল।

এই নির্বাচনে কোন নীতি ও কার্যক্রম জড়িত আছে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহা জানি না। আমি চাই না নির্বাচন শেষে বলা হোক একটি

নির্দিষ্ট কার্যক্রমকে বাতিল করা হইয়াছে, আসলে যখন তাহা বিরোধের বিষয়ই ছিল না। যে কেহই জয়ী হোক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা হারিবেই।

আমি এইটুকু ভরসা রাখি যে, যদি নির্বাচনদ্বন্দ্ব হয়ই আমাদের আদর্শের মহৎ মর্যাদার কথা সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে রাখিবেন এবং এমন কিছুই করা হইবে না যাহা সেই মহান সংগঠনকে হীনবল করিতে পারে যাহার সেবায় আমাদের মধ্যে কতজন তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্বসংঘর্ষে আচ্ছন্ন; ব্যক্তির কথা ভুলিয়া নীতি ও আদর্শের কথা স্মরণে রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সহিত তাহার সহিত যুঝিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

রাজেন্দ্র প্রসাদের বিবৃতি

পাটনা

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৯

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রশ্নে সুভাষবাবু এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের মধ্যে কল্পিত বিরোধের উল্লেখ করিয়া মতবিরোধের আসল কারণকে চাপা দেওয়া ঠিক নয়। ওই প্রশ্নে মতানৈক্য একেবারেই নাই। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাব সুস্পষ্ট এবং বিনা প্রতিবাদে ও সংশোধনেই তাহা গৃহীত হইয়াছে এবং অনেক পরে এ. আই. সি. সি.র শেষ সভায় পর্যন্ত প্রস্তাবটি পুনরায় অনুমোদিত হইয়াছে, একটিও বিরোধী কণ্ঠ শোনা যায় নাই। অন্যান্য বিষয়ে সুভাষবাবু এবং অন্যান্যদের সহিত যে মতবিরোধ আছে তাহা বোঝা সহজ। রাজনৈতিক অভিমত ও কার্যক্রম লইয়া এইপ্রকার মতবিরোধকে যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভিত্তি করিতে হয়, তাহা হইলে বিরোধের বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হওয়া উচিত এবং কাল্পনিক বিরোধকে সম্মুখে আনিয়া সেইগুলিকে অস্পষ্ট করা ঠিক নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসু বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫-এর ভারত-সরকার আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা রহিয়াছে তাহার বিরোধিতা করিতে কংগ্রেস যে পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা মোটামুটি কংগ্রেস রাজনীতির সাধারণ মূলনীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী হইবে, অর্থাৎ অসহযোগ হইবে। কোন কোন্ পর্বে এই অসহযোগ করা হইবে, যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাচন পর্যাযেই অসহযোগ হইবে, না, নির্বাচন পরে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের পর্যায়ে হইবে, তাহা কার্যকৌশল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার এবং তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী তাহা স্থির করা হইবে।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কি পদত্যাগ করিতে বলা হইবে, ইহার জবাবে তিনি বলিয়াছেন, আপাততঃ আমি শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, লড়াই যদি বাধে আমরা সর্বক্ষেত্রে বিরোধিতা করিব। যদি আমরা মনে করি, মন্ত্রীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিলে আমাদের সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি হইবে, তাহা হইলে ইহাও খুবই সম্ভব যে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে আমরা নাও বলিতে পারি। অপরপক্ষে যদি আমরা মনে করি, তাঁহারা পদত্যাগ করিলেই আমাদের সংগ্রাম অধিকতর শক্তিশালী হইবে, তাহা হইলে আমরা তাহাই করিতে বলিব।

'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় দেখা যাইতেছে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের প্রশ্নোত্তরে বেশ কয়েকটি "যদি" রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুইটি এই: যদি সংগ্রাম হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রতি আপসহীন মনোভাব অবলম্বন করা যদি কংগ্রেস নীতি হয় তবুও, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় নির্বাচনদ্বন্দ্বে আমরা বিরোধিতা করিব। প্রথম "যদি" হইতে এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে সংগ্রাম অনিবার্য নয়। দ্বিতীয় "যদি"তে ব্রিটিশের তৈয়ারি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি কংগ্রেস মনোভাব শেষ পর্যন্ত আপসহীন বিরোধিতার মনোভাব নাও হইতে পারে এইরূপ ধারণার অবকাশ থাকিয়া যায়।

আমি ভাবিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছি যে, ওয়ার্কিং কমিটির তথাকথিত দক্ষিণপন্থী কোন সদস্য ইহার মত কোন কিছু বলিয়াছেন কিনা। সুভাষবাবু নিজস্ব মত পোষণ করিবার অধিকারী নন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু অপরের মতামত কল্পনা করিয়া তাহাদের নস্যাৎ করা কেন, যখন নিজের মতামতই "যদিগুলি" বর্জন করিবার মত যথেষ্ট দানা বাঁধে নাই, যে "যদিগুলি"তে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক মারাত্মক অর্থের সন্ধান পাইয়াছেন।

নির্বাচনে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে চলিয়াছে, ডেলিগেটরা তাঁহাদের পছন্দমত ও স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী ভোট দিবেন। তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটির কোন কোন সদস্যের নির্দেশ অনুয়ায়ী ভোট দিবেন এইরূপ ইঙ্গিত করা তাঁহাদের বুদ্ধি ও দায়িত্ববোধকে অপমান করা। যদি তাঁহারা ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়াকে ভোট দেওয়াই সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে তাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা অন্যায়।

সুভাষচন্দ্র বসুর তৃতীয় বিবৃতি

১৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৯

ডক্টর পট্টভি এবং সর্দার প্যাটেলের বিবৃতির ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে আবার প্রকাশ্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। প্রথমোক্ত বিবৃতিদাতা বলেছেন যে সাধারণভাবে দক্ষিণভারতীয়দের এবং বিশেষ করে অন্ধ্রবাসীদের মধ্যে সর্ববাদি এই আকাজ্ক্ষা দেখা যাচ্ছে যে একজন অন্ধ্রবাসীর পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট হওয়া উচিত।

ভারতের কোন অংশের কংগ্রেসসেবী প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে চিন্তা করছেন, বিশ্বাস করা কঠিন। এছাড়া, এই মুহূর্তে আমার সামনে অন্ধ্রদেশ থেকে পাওয়া কিছু টেলিগ্রাম রয়েছে যাতে স্বেচ্ছায় আমাকে সমর্থনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তামিলনাদের কথা বলতে গেলে, আমি নির্বাচনদ্বন্দ্ব থেকে যাতে সরে না দাঁড়াই সেইজন্যে যাঁরা

সবচেয়ে বেশি আমাকে পীড়াপীড়ি করছেন, তাঁদের মধ্যে সেখানকার বন্ধুরা আছেন।

সর্দার প্যাটেলের বিবৃতিতে একটা প্রায় মারাত্মক স্বীকৃতি আছে। তিনি বলেছেন, 'ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচনা করেন এবং এক সিদ্ধান্তে পৌছন।' প্রেসিডেন্ট বা ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানেন না, ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক নয় কি?

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি একজন প্রেসিডেন্ট চান যিনি নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট হবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবেন। সাধারণের যে ধারণা, ওয়ার্কিং কমিটিকে চালিত করে তার ভিতরকার একটা গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সদস্যরা যাঁরা সেখানে আছেন দয়া করে তাঁদের রাখা হয়, উপরের স্বীকৃতিতে এই ধারণা বদ্ধমূল হল।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কিত কংগ্রেস প্রস্তাবে আপসহীন বিরোধিতার কথা বলা আছে, তবু কিছু কিছু প্রভাবশালী কংগ্রেস-নেতা যে গোপনে ও প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শর্তসাপেক্ষ গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে চলেছেন, তা না বললেও চলে।

এখনও পর্যন্ত দক্ষিণপন্থী নেতাদের তরফ থেকে এই ধরনের কার্য-কলাপকে নিন্দা করার মত বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি। প্রকৃত অবস্থার দিকে চোখ বুজে থেকে কোন লাভ নেই। আগামী বৎসরের মধ্যে বৃটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে আপসরফা হবে বলে সবার মনে যে নিশ্চিত ধারণা হয়েছে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে, ভুল হলেও তা আছে এবং তার অস্তিত্বকে কেউ নাকচ করতে পারে না। কেবল তাই-ই নয়। সাধারণের এমনও বিশ্বাস যে, "যুক্তরাষ্ট্রীয় কেবিনেটে যাঁরা মন্ত্রী হবেন তাঁদের নামের তালিকাও স্থির হয়ে গেছে।"

এইরকম পরিস্থিতিতে এটি স্বাভাবিক যে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী বা প্রগতিশীল ব্লক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রশ্নটিকে হালকাভাবে দেখতে

পারছে না এবং তাঁরা প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে চান যথার্থ একজন যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধীকে। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ঐ পদে যে কোন উপায়ে একজন দক্ষিণপন্থীকে বসাবার জন্যে যে রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাতে যাঁরা প্রগতিশীল তাঁদের সন্দেহ আরো বেড়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমস্ত গোলমালের মূলে আছে দক্ষিণপন্থীদের মনোভাব।

দেরিতে হলেও এখনও যদি তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী একজন প্রেসিডেন্টকে মেনে নেন তাহলে তাঁরা এখনই বাকবিতণ্ডার অবসান ঘটাতে পারেন এবং তার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদকেও এড়াতে পারেন। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি আগেই প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছি যে আসল বিরোধ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে। যদি যথার্থ একজন যুক্তরাষ্ট্রবিরোধীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাঁর সপক্ষে আমি সানন্দে সরে দাঁড়াব। আমার এই প্রস্তাব প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি এবং নির্বাচনের আগে পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

সুভাষচন্দ্র বসুর চতুর্থ বিবৃতি

২৮শে জানুয়ারী. ১৯৩৯

রবিবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি কেন প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে সম্মত হয়েছি তা বুঝিয়ে বলার জন্যে সংবাদপত্র মারফত কয়েকটি কথা জানাতে চাই। স্মরণ থাকতে পারে যে দেশের বিভিন্ন অংশের কংগ্রেসীরা গত চার-পাঁচ মাস হল ব্যক্তিগত ও সমষ্টি-গতভাবে আমার পুনর্নির্বাচনের পক্ষে প্রকাশ্যে দাবি জানাচ্ছেন। কয়েকটি প্রদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যখন আমার নামের প্রস্তাব করা হয়, তা আমাকে জানিয়ে বা আমার মত নিয়ে করা হয়নি। ঠিক হোক বা ভুল হোক কংগ্রেসের মধ্যে একটা বেশ বড় অংশ চেয়েছে আরও এক মেয়াদের জন্যে আমি নির্বাচিত হই। এখন দেখা যাচ্ছে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য এই মতে সায় দেন নি, কি

কারণে যে দেননি তা সহজবোধ্য নয়। তাঁরা যদি আমাকে ভোট না দেবার জন্যে নির্দেশ না দিতেন তাহলে আমার পুনর্নির্বাচন যে প্রকৃতপক্ষে সর্বসম্মত হত তাতে সন্দেহ নেই। এখন বোঝা যাচ্ছে এই অধমকে ছাড়া তাঁরা আর যে কোন লোককে মেনে নিতে পারতেন।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তা হৃদ্যতাপূর্ণ এবং কমিটিতে আমাদের কাজও হয়েছে মোটামুটি সহজভাবেই। এই পরিস্থিতিতে কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যদিও সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা আমারই পুনর্নির্বাচন চাইছেন, তবু ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য কেন আমার এত বিরোধিতা করছেন? আমার সম্পর্কে তাঁদের আপত্তির কারণ কি এই যে, আমি তাঁদের হাতের পুতুল হব না? অথবা তাঁদের আপত্তির কারণ আমার ধ্যানধারণা ও নীতি? এ পর্যন্ত যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বলা হয়েছে পুনর্নির্বাচন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এর পরিষ্কার জবাব এই যে, পুনর্নির্বাচন না করার কোন নির্দেশ গঠনতন্ত্রে নেই—কংগ্রেসের কয়েকজন প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট একবারের বেশি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে গেছেন—আগামী বৎসর একটি অস্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ বৎসর হতে চলেছে এবং আমার পুনর্নির্বাচন সাধারণে চাইছে।

সর্দার প্যাটেল শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর কাছে পাঠানো তাঁর তারবার্তায় আরও একটি যুক্তি দেখিয়েছেন, তা এই যে, পুনর্নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এই যুক্তি এমন হতবুদ্ধিকর যে এর খণ্ডন নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত নেতারা যদি আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ না করতেন এবং আমার প্রার্থীতার বিরোধীতা করে ফতোয়া জারি না করতেন, তাহলে কংগ্রেস ডেলিগেটদের আসল মত কী আমরা জানতে পারতাম এবং আমার কোনই সন্দেহ নেই যে সেই মত সর্দারের কাছে চরম বিস্ময় বলে প্রতিপন্ন হত।

কোন কোন মহলে ভুল কথা বলা হচ্ছে যে, এই বৎসরই সর্বপ্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে। একথা ঠিক গত কয়েক বৎসর

কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। এও ঠিক, এই বৎসর যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, আগেও নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তবে এই বৎসরকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য কারণে যে রকম চমকপ্রদ হতে চলেছে আগে সেই রকম হয়নি। অতএব ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরকার একটি দল যদি দাবি করেন, তাঁরাই প্রত্যেক বার প্রেসিডেণ্ট কে হবেন তা স্থির করে দেবেন, তাহলে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়। যদি আমরা চাই, ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরকার একটি দলের মনোনয়ন নয়, ডেলিগেটদের দিয়ে যথার্থ নির্বাচন হোক, তাহলে ডেলিগেটরা যাতে স্বাধীন ও অবাধভাবে তাঁদের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারেন তা একান্ত দরকার। এই মুহূর্তে কেবলমাত্র ফতোয়াই জারি করা হয়নি, ডেলিগেটরা যাতে সেই অনুযায়ী ভোট দিতে বাধ্য হন তার জন্যে নৈতিক চাপও দেওয়া হচ্ছে।

সর্দার প্যাটেল তাঁর বিবৃতিতে বলছেন, গত বৎসর যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল এই বৎসরও ঠিক তাই করা হচ্ছে। এ কথা মোটেই সত্য নয়। ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরকার প্রভাবশালী দল যদি সবার মনোমত কাউকে দাঁড় করাতেন তাহলে এ বৎসরেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত না। কিন্তু তাঁদের মনোনয়নে বা প্রস্তাবে যদি জনসাধারণের সম্মতি না থাকে ডেলিগেটরা নিজেরা যা ভালো বুঝবেন সেইমত ভোট দেবার স্বাধীনতা কি তাঁদের থাকবে না ? তাঁদের যদি এই স্বাধীনতার গ্যারান্টি না থাকে, তাহলে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র আর গণতন্ত্রসম্মত থাকবে না। কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র রাখার কোন অর্থ হয় না যদি ডেলিগেটদের তাঁদের ইচ্ছামত ভোট দেবার ও চিন্তা করার স্বাধীনতা না থাকে।

গণতন্ত্রের প্রশ্ন ছাড়াও বর্তমান নিবাচনে আরও অনেক প্রশ্ন এবং গুরুতর প্রশ্ন জড়িত। যদি কংগ্রেসের ভিতরে আমরা একতা ও সংহতি বজায় রাখতে চাই এবং দক্ষিণ ও বামপন্থীদের যদি ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য একসঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হয়,

তাহলে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের উভয়পক্ষের আস্থাভাজন হওয়া একান্ত দরকার। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই ভূমিকা চমৎকারভাবে পালন করেছিলেন। এবং সম্ভবত আমি বিনীতভাবে দাবি করতে পারি, আমার দ্বারাও, অনেক কম মাত্রায় হলেও, তা সাধিত হয়েছিল। এই কারণেই কংগ্রেসসেবীদের এক বিরাট অংশের সঙ্গে আমিও দাবি করি যে, আগামী বৎসরের জন্যে আমাদের এমন একজন প্রেসিডেন্ট হওয়া দরকার যিনি মনেপ্রাণে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী—যিনি কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থীর নয়, বামপন্থীদেরও শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন হবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে আসন্ন লড়াইয়ের জন্যেই শুধুমাত্র এটি দরকার নয়, আরও বেশি দরকার এইজন্যে যে কিছু কিছু দক্ষিণ-পন্থী নেতাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে সাধারণের মনে ব্যাপক একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মোটকথা, বর্তমান নির্বাচনে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত তা হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রশ্ন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আপসহীন বিরোধিতা করার প্রশ্ন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যক্তিগত কিছু নেই এবং আমি আমার বন্ধু ডেলিগেটদের অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরা যেন ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন ভুলে যান এবং সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। ঘটনা-চক্রে আমি একজন প্রার্থী হয়েছি, কেবলমাত্র এই কারণে যে, বামপন্থী দের ভিতর থেকে নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কেউ এগিয়ে এলেন না। এবং আগেও যেমন আমি একাধিকবার বলেছি, এখনও বলছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও এড়ানো যেতে পারে যদি দক্ষিণপন্থীরা এমন একজনকে প্রেসিডেন্ট বলে মেনে নেন যিনি বামপন্থীদের আস্থাভাজন। একান্তই যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, লেখবার এই মুহূর্তে যা মনে হচ্ছে অনিবার্য, তাহলে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ আনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে দক্ষিপন্থীদের উপরে এসে পড়বে। তাঁরা কি সেই দায়িত্ব স্বীকার করে নেবেন, না, এত দেরি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা প্রগতিশীল কার্যক্রমের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেবেন?[১]

১। ১৯৩৯-এর ২৯এ জানুয়ারি ভারতের সর্বত্র ডেলিগেটরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। সুভাষচন্দ্র বসু পট্টভি সীতারামিয়াকে ২০০-এর কিছু বেশি ভোটে পরাজিত করেন।—সম্পাদক

মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি

বর্দোলি

৩১শে জানুয়ারি ১৯৩৯

শ্রীসুভাস বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়া চূড়ান্ত জয়লাভ করিয়াছেন। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রথমাবধি আমি তাঁহার পুনর্নির্বাচনের ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। কি কারণে তাহা আমি বলিতে চাই না। তিনি তাঁহার বিবৃতিগুলিতে যে সব যুক্তি ও তথ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সহিত আমি একমত নই। আমি মনে করি তাঁহার সহকর্মীদের সম্পর্কে তাঁহার উক্তি অন্যায় ও অসংগত। এতৎসত্ত্বেও আমি তাঁহার জয়ে আনন্দিত; এবং মৌলানা সাহেব যখন তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিলেন তখন, যেহেতু ডক্টর পট্টভিকে প্রার্থী হিসাবে তাঁহার নাম প্রত্যাহার না করিবার জন্য আমিই উদ্যোগী হইয়া রাজী করাইয়াছিলাম, এই পরাজয় তাঁহার হইতে আমারই অধিক। এবং আমি কিছুই নই যদি আমার সুনির্দিষ্ট নীতি ও কার্যপদ্ধতি না থাকে। অতএব, ইহা আমার নিকট প্রাঞ্জল যে, আমি যে নীতিও কার্যপদ্ধতির পক্ষে, ডেলিগেটরা তাহা অনুমোদন করেন না। আমি এই পরাজয়ে উল্লসিত।

দিল্লীতে বিগত এ. আই. সি. সি. সভায় সংখ্যালঘুদের কক্ষত্যাগ প্রসঙ্গে লিখিত আমার প্রবন্ধে আমি যাহা প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা কার্যত প্রয়োগের সুযোগ ইহা হইতে আমি পাইয়াছি। সুভাষবাবু যাঁহাদের দক্ষিণপন্থী বলিয়া অভিহিত করেন তাঁহাদের অনুমোদনে প্রেসিডেন্ট না হইয়া এখন তিনি নির্বাচনদ্বন্দ্বে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। ইহাতে তিনি সমমতাবলম্বী কেবিনেট গঠন করিয়া বিনা বাধায় ও বিরোধিতায় তাঁহার কার্যক্রম বলবৎ করিবার সুযোগ পাইলেন।

লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল রহিয়াছে, তাহা কংগ্রেস সংগঠনের আভ্যন্তরিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখিবার একাগ্র আগ্রহ। হরিজন-এ প্রকাশিত আমার রচনাগুলিতে আমি দেখাইয়াছি যে, কংগ্রেস দ্রুত নীতিচ্যুত এক সংগঠনে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং তাহা এই অর্থে যে ইহার খাতাপত্রে বিপুল সংখ্যায় ভুয়া সদস্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া আমি এইসব খাতাপত্র ঢালিয়া সাজাইবার কথা বলিয়া আসিতেছি। এইসব ভুয়া ভোট-দাতাদের জোরে যে সকল ডেলিগেট নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পর আসনচ্যুত হইবেন সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমি এই প্রকার চরম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলিতেছি না। খাতাপত্র হইতে সমস্ত ভুয়া সদস্যদের নাম যাহাতে খারিজ করা হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ না হয় তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সংখ্যালঘুদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। যদি তাঁহারা কংগ্রেসের বর্তমান কার্যক্রমে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে তদনুযায়ী কাজ করা যাইতে পারে, তাঁহারা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু হোন, এমনকি তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে থাকুন বা বাহিরে থাকুন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। রদবদলের ফলে সম্ভবত একটি বিষয় প্রভাবিত হইতে পারে, তাহা সংসদীয় কার্যক্রম।

ভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক মন্ত্রীরা নির্বাচিত হইয়াছেন এবং কার্যক্রম স্থির হইয়াছে। কিন্তু, সংসদীয় কার্যক্রম কংগ্রেস কার্যক্রমের সামান্য অংশমাত্র। যাহাই হউক না কেন কংগ্রেসমন্ত্রীদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করিতে হইবে। কোন প্রশ্নে কংগ্রেস নীতির সহিত তাঁহাদের মতৈক্য হইলে তাঁহাদের যদি ফিরাইয়া আনা হয়, অথবা কংগ্রেসের সহিত মতানৈক্য হওয়ার দরুন তাঁহারা যদি পদত্যাগ করেন, তাহাতে সামান্যই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে।

যতই হোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য

দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহার নীতি ও কার্যক্রমই সর্বাধিক অগ্রগামী ও দুঃসাহসিক। সংখ্যালঘুরা কেবলমাত্র ইহার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতে পারে। তাঁহারা যদি ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন, তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। যদি তাঁহারা তাহা পারেন, তাহাতে সংখ্যাগুরুর শক্তিবৃদ্ধি হইবে। কোন কারণেই সংখ্যালঘু যেন বাধা সৃষ্টি না করেন। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে পারিবেন না, তাঁহারা যেন বিরত থাকেন। আমি সকল কংগ্রেসসেবীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন হইয়াও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে উহার বাহিরে রহিয়াছেন, তাঁহারাই উহার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অতএব যাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে থাকিতে অস্বস্তি বোধ করিতেছেন তাঁহারা কোন বিদ্বেষের মনোভাব না লইয়া, উপরন্তু অধিকতর সার্থকভাবে সেবা করিবার সুচিন্তিত উদ্দেশ্যে উহা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর পঞ্চম বিবৃতি

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

সাম্প্রতিক প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি যতখানি গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত আমি সেইভাবেই পড়েছি। মহাত্মা গান্ধী একে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে নিয়েছেন দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি। আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন, এই বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। ভোটদাতাদের, অর্থাৎ ডেলিগেটদের মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে বলা হয় নি। অতএব আমার মতে এবং অধিকাংশ লোকের মতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে স্পর্শ করছে না।

গত কয়েকদিনে কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের সম্পর্কে সংবাদপত্রে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। কিছু লোক নির্বাচনের ফলাফলকে বামপন্থীদের জয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আসল কথা এই যে, জনসাধারণের সামনে দুটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম. যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে, ডেলিগেটদের অবাধ ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ। ভোটদানে নিশ্চয় এই প্রশ্নগুলির প্রভাব ছিল বিরাট এবং ঐগুলি ছাড়াও প্রার্থীদের ব্যক্তিত্বও কিছুটা কাজ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়, এই নিবাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কল্পনার উপর নির্ভর করা বা এতে যা নেই তা আবিষ্কার করা আমাদের উচিত হবে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে নির্বাচনের ফল বামপন্থীদের জয় সূচিত করছে, তাহলেও আমাদের ভেবে দেখা উচিত বামপন্থীদের কার্যক্রম কী। অব্যবহিত ভবিষ্যতে বামপন্থীদের লক্ষ্য জাতীয় ঐক্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আপসহীন বিরোধিতা। এ ছাড়াও তারা গণতান্ত্রিক মূলনীতির পক্ষে। বামপন্থীরা কংগ্রেসের ভিতরে ভাঙন সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেবে না। যদি ভাঙন দেখা দেয় তা আসবে তাদের জন্য নয়, তাদের থাকা সত্ত্বেও।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে কংগ্রেস দলের মধ্যে ভাঙন ধরানোর কোন যৌক্তিকতাও নেই, কারণও নেই। অতএব আমি একান্তভাবে আশা করি, এখন বা নিকট ভবিষ্যতে তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে অসহযোগিতা করার কোন কারণ দেখা দেবে না। এ কথা আমার বলার দরকার হয় না যে, আমাদের সামনে ভাঙনের কোন সম্ভাবনা যদি কখনও দেখা দেয়, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব যাতে তা এড়ানো যায়।

আমাদের মত লোকেরা ভবিষ্যতে কী নীতি অনুসরণ করবে সে সম্পর্কে অনেকের মনেই কিছু পরিমাণ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। আমি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, সংসদীয় ক্ষেত্রে বা সংসদের বাইরে অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করা হবে না। সংসদীয়

কার্যক্রমের কথা বলতে গেলে, অতীতের থেকে আরও দ্রুতগতিতে আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞাগুলি ও সংসদীয় কার্যক্রম বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করব। সংসদের বাইরে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রতিরোধ করতে এবং "পূর্ণস্বরাজের" দিকে অগ্রসর হতে আমাদের সকল শক্তি ও উপায় সংহত করার চেষ্টা করব এবং আমরা অবশ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ীই কাজ করে যাব।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই। লৌকিক বিষয়ে কয়েক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যদিও আমি একমত হতে পারিনি, তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারও থেকে কম নয়। যদি আমি তাঁকে ঠিকমত বুঝে থাকি তিনিও চান সবাই নিজের মত চিন্তা করুক যদিও তাতে তাঁর সঙ্গে সব সময় একমত হওয়া নাও হতে পারে। মহাত্মাজীর আমার সম্পর্কে অভিমত কী আমার জানা নেই। তাঁর মতামত যাই থাক, আমার সবসময় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করা শুধুমাত্র এই কারণে যে, আর সবার বিশ্বাস অর্জনে সফল হয়ে আমি যদি ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবের বিশ্বাস অর্জন করতে না পারি আমার কাছে তা মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে থাকবে।

ত্রিপুরি অভিভাষণ

১৯৩৯এর মার্চ মাসে ত্রিপুরিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ।

কমরেড চেয়ারম্যান, ভগ্নী ও ভ্রাতৃস্থানীয় ডেলিগেটগণ,

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের আসনে আমাকে পুনর্নির্বাচিত করে যে বিরাট সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং এখানে ত্রিপুরিতে আমাকে যে রকম আন্তরিক ও সহৃদয় সংবর্ধনা জানিয়েছেন তারজন্যে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একথা সত্য যে, এই সব উপলক্ষে যে রকম আড়ম্বর সাধারণত হয়ে থাকে আমার অনুরোধে তার অনেক কিছু আপনারা বাতিল করেছেন—কিন্তু আমার মনে হয় বাধ্যতামূলক এই ব্যবস্থার ফলে আপনাদের সংবর্ধনায় বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হ্রাস পায়নি এবং আমি আশা করি এই উপলক্ষে এইসব বাদ দেওয়া হয়েছে বলে কেউই আপসোস করবেন না।

বন্ধুগণ, অন্য কিছু বলার আগে মহাত্মা গান্ধীর রাজকোট মিশনের সাফল্যে এবং তার ফলে তাঁর অনশনের অবসানে আমাদের আনন্দ প্রকাশ করে আমি আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে চাই। আজ সারাদেশ আনন্দিত এবং দারুণ নিশ্চিন্ত।

বন্ধুগণ, অনেক দিক থেকে এই বৎসরটি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ সম্ভাবনাপূর্ণ। এই বৎসরকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সাধারণত যে রকম হয়ে থাকে সে রকম হয়নি। নির্বাচন হবার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যার পরিণতিতে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটির পনেরোজন সদস্যের মধ্যে বারোজন পদত্যাগ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির আরও একজন বিশিষ্ট ও প্রধান সদস্য পণ্ডিত

জওহরলাল নেহরু যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেননি, তা সত্ত্বেও তিনি এমন একটি বিবৃতি দিয়েছেন যার থেকে সবার ধারণা হয়েছে যে তিনিও পদত্যাগ করেছেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসের প্রাক্কালে রাজকোটের ঘটনাপরিস্থিতি মহাত্মা গান্ধীকে আমরণ অনশনের সংকল্প নিতে বাধ্য করে। তারপর প্রেসিডেণ্ট নিজে এলেন ত্রিপুরিতে অসুস্থ অবস্থায়। অতএব অবস্থাগতিতে এই বৎসরের প্রেসিডেণ্ট অভিভাষণ দৈর্ঘ্যের দিক থেকে পূর্ববর্তী সব নজিরের ব্যতিক্রম হবার দাবি করতে পারে।

বন্ধুগণ, আপনারা অবগত আছেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অতিথিরূপে মিশর থেকে ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির প্রতিনিধি দল আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তাঁদের আন্তরিক সংবর্ধনা জানাতে আমার সঙ্গে আপনারাও যোগ দেবেন। তাঁরা যে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে আসতে পেরেছেন এর জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের এই দুঃখ রয়ে গেল যে, মিশরের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির প্রেসিডেণ্ট, মুস্তাফা এল নাহাস পাশা'র পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করা সম্ভব হল না। ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান প্রধান সদস্যদের সঙ্গে আমার পরিচিত হবার সুযোগ থাকায় আমার আনন্দ আজ সমধিক। পুনরায় আমি আমার দেশবাসীদের তরফ থেকে তাঁদের আন্তরিক ও সহৃদয় অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

১৯৩৮এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা যখন হরিপুরায় মিলিত হই তারপর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের মিউনিক চুক্তি যার অর্থ দাঁড়ায় নাৎসী জার্মানির কাছে ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেনের মত পশ্চিমী শক্তিবর্গের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। এর ফলে ফ্রান্স আর ইউরোপের প্রধান শক্তি হয়ে রইল না, একটিও গোলাগুলি খরচ হল না অথচ জার্মানির হাতে কর্তৃত্ব চলে গেল। আরও সম্প্রতি স্পেনে প্রজাতন্ত্রী সরকারের ক্রমিক পতন ফ্যাসিস্ট ইটালি ও নাৎসী

জার্মানির শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে বলে মনে হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি, যেমন ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেন, ইওরোপীয় রাজনীতি থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে ইটালি ও জার্মানির সঙ্গে আপাতত হাত মিলিয়েছে। কিন্তু তা কতদিন থাকবে? সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ঘটনাসমাবেশের ফলে ইওরোপে ও এশিয়ায় ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ শক্তি ও সম্মানের দিক থেকে যে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেশের রাজনীতি প্রসঙ্গে আমি আমার রুগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ কয়েকটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকব। প্রথমেই, কিছুদিন থেকে আমি যা বোধ করছি আমার দিক থেকে তা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যথা, স্বরাজের প্রশ্ন তুলে ধরে ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরম পত্রের আকারে জাতীয় দাবি পেশ করার সময় এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, ততদিন নিষ্ক্রিয় মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা করার দিন আমাদের অনেক আগেই কেটে গেছে। সমস্যা এখন আর এই নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কখন আমাদের গিলিয়ে দেওয়া হবে। সমস্যা এই, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যদি কয়েক বৎসরের জন্য, অন্তত যতদিন ইওরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পর্যন্ত, সুবিধা-মাফিক তুলে রাখা হয় তখন আমরা কি করব। ইওরোপে একবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে, তা চতুঃশক্তির ফলেই হোক কিংবা অন্য কোন উপায়েই হোক, গ্রেটবৃটেন নিঃসন্দেহে শক্ত হাতে সাম্রাজ্যনীতি অনুসরণ করবে। প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের বাদ দিয়ে আরবদের তোষণের কিছু কিছু চেষ্টা এখন যে তার কার্যকলাপে দেখা যাচ্ছে তার কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে নিজেকে দুর্বল বোধ করছে। অতএব আমার মতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমাদের জাতীয় দাবি চরমপত্রের আকারে পেশ করা উচিত, সেইসঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমা দেওয়া থাকবে যার মধ্যে উত্তর প্রত্যাশা করা হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন জবাব না পাওয়া যায়, অথবা সন্তোষজনক জবাব না

পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের জাতীয় দাবি বলবৎ করার জন্যে যে সব অনুমোদিত পন্থা 'আমাদের আছে আমরা তার আশ্রয় নেব। আমাদের অনুমোদিত পন্থা আপাততঃ ব্যাপক আইন অমান্য অথবা সত্যাগ্রহ। দীর্ঘকালের জন্যে সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহের মত একটা বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মূখীন হবার মত অবস্থা ব্রিটিশ সরকারের আজ আর নেই।

কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোক আছে দেখে আমার কষ্ট হয় যাঁরা এতই নৈরাশ্যবাদী যে তাদের মতে বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের উপর বড় রকমের আঘাত হানার সময় এখনও নাকি আসেনি। কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তববাদীর চোখে পরিস্থিতিটা দেখলে নৈরাশ্যবাদের সামান্যতম কারণ আমি খুঁজে পাই না। আটটি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তার ফলে আমাদের জাতীয় সংগঠনের শক্তি ও সম্মান যথেষ্ট বর্ধিত হয়েছে। বৃটিশ ভারতের সর্বত্র গণআন্দোলন যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। এবং শেষ হলেও তুচ্ছ নয়, ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়েছে। স্বরাজের দিকে চূড়ান্তভাবে এগিয়ে যেতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এর চেয়ে আর কী সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেতে পারি, বিশেষত যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে? ঠাণ্ডা মাথার বাস্তববাদী হিসেবে আমি এইটুকু বলতে পারি, বর্তমান পরিস্থিতির যাবতীয় ঘটনা এতই আমাদের অনুকূল যে তাতে আশাবাদী হওয়াই উচিত। শুধু যদি আমরা আমাদের বিভেদ ভুলে সমস্ত শক্তি সংহত করে জাতীয় সংগ্রামে সব কিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি, আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারব। আমাদের কি সেই দূরদর্শিতা থাকবে না যাতে আমরা আমাদের বর্তমান অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারি অথবা আমরা এই সুযোগ পেয়েও নেব না, যে-সুযোগ যে কোন জাতির জীবৎকালে দুর্লভ?

ভারতের দেশীয় রাজ্যে জাগরণের কথা আমি আগেই বলেছি। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে আমাদের যে মনোভাব অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে তা যে আমাদের সংশোধন করা

উচিত সে-বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। আপনারা অবগত আছেন, সেই প্রস্তাবে কংগ্রেসের নামে রাজ্যগুলিতে কয়েকপ্রকারের কার্যকলাপ চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী সংসদীয় কার্যকলাপই হোক, রাজ্যের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হোক, কিছুই কংগ্রেসের নামে চালানো চলবে না। কিন্তু হরিপুরার পর থেকে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। আজ আমরা দেখছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবোচ্চ শক্তি দেশীয় রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা যারা কংগ্রেসের, আমাদের পক্ষে কি রাজ্যগুলির জনগণের আরও সান্নিধ্যে আসা কর্তব্য নয়? আজ আমাদের কর্তব্য কী এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া ছাড়া নাগরিক স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সরকারের জন্য রাজ্যগুলির গণ-আন্দোলনকে ব্যাপক ও নিয়মিতভাবে চালিত করার দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটির নেওয়া উচিত। এতদিন যে কাজ হয়েছে তা হযেছে খাপছাডাভাবে। তার পিছনে পদ্ধতি বা পরিকল্পনা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্তু সে সময়ে এসেছে যখন ওয়ার্কিং কমিটিকে সেই দায়িত্ব নিয়ে ব্যাপক ও নিয়মিতভাবে তা পালন করতে হবে এবং, যদি প্রয়োজন হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাবকমিটিও নিয়োগ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা ও নির্দেশের এবং নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সহযোগিতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে হবে।

স্বরাজের লক্ষ্যে আমাদের চূড়ান্তভাবে এগিয়ে যাবার যৌক্তিকতার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তার জন্যে উপযুক্ত প্রস্তুতির দরকার হবে। প্রথমতঃ, প্রধানত ক্ষমতার লোভের দরুন আমাদের দলের মধ্যে যা কিছু দুর্নীতি ও দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করেছে তা স্খালন করবার জন্যে আমাদের নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবিরোধী সংগঠনগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে কিষাণ আন্দোলন এবং ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। দেশের সমস্ত

প্রগতিশীল শক্তিকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও পারস্পরিক একতা বজায় রেখে কাজ করে যেতে হবে এবং সাম্রাজ্যবিরোধী সব সংগঠনের প্রয়াসকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার লক্ষ্যে চালিত করতে হবে।

বন্ধুগণ, আজ কংগ্রেসের ভিতরকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বিভেদ সেখানে মাথাচাড়া দিয়েছে। তার ফলে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই নিরুৎসাহ ও নিরাশ বোধ করছেন। যে মেঘ আজ আপনারা দেখছেন তা কেটে যাবে। আমার দেশবাসীর জাতীয়তাবোধে আমার বিশ্বাস আছে এবং আমি সুনিশ্চিত যে, অচিরেই আমরা বর্তমান বাধাবিপত্তি পার হয়ে আমাদের দলগত ঐক্য ফিরিয়ে আনতে পারব। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সময় এবং তারপরে, যখন প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু দাশ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরাজ্যপার্টি প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও প্রায় একই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমান সঙ্কটে আমার স্বর্গত গুরুদেবের, শ্রদ্ধেয় মতিলালজীর এবং ভারতের অন্যান্য মহান সন্তানদের আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করুক এবং মহাত্মা গান্ধী যিনি জাতিকে সাহায্য ও চালিত করার জন্যে এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন তিনি কংগ্রেসকে বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্ত করতে সহায় হোন, এই আমার প্রার্থনা।

ত্রিপুরি এবং তারপর—একটি চিঠি

বিহারে জামাডোবায় আরোগ্যকালীন বিশ্রামের সময় ইংলণ্ডে অবস্থিত শ্রীঅমিয়নাথ বসুকে লেখা চিঠি।

জামাডোবা
১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯

স্নেহের অমি,

ঠিক দুমাস হল আমি শয্যা নিয়েছি। অনেক দিনের মধ্যে এই বারই আমাকে সবচেয়ে কাহিল করেছে। আমার ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়, তার সঙ্গে অন্যান্য গোলযোগও ছিল (লিভার ও অন্ত্রের)। এই অসুখটা এমনই সময়ে হল যখন রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে আমাকে মানসিক উদ্বেগে দিন কাটাতে হচ্ছিল। শারীরিক বা মানসিক বিশ্রাম কোনটাই তখন ছিল না—বিছানায় শুয়ে শুয়ে, এমনকি দারুণ জ্বর নিয়েও আমাকে কাজ করে যেতে হয়েছে। এক এক সময় মনে হয়েছে আমি আর সেরে উঠব না। যাই হোক, এখন সঙ্কট কেটে গেছে এবং আমি সেরে ওঠার মুখে। আমি এমাসের ২১ তারিখে বি পি. সি. সি, এ. আই সি. সি. ইত্যাদির মিটিং-এ যোগ দিতে কলকাতায় যাচ্ছি। যদিও টেম্পারেচার এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে, বেশ কিছুদিন দুর্বলতা থাকবে। যদি পারি গ্রীষ্মকালে একবার চেঞ্জে যাব ভাবছি। দেখি কতদূর কী হয়।

তুমি নিশ্চয় খবরের কাগজ পাও—প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আগে পরেকার বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতিগুলো নিশ্চয় দেখেছ। ত্রিপুরি কংগ্রেসের বিবরণও নিশ্চয় চোখে পড়েছে। প্রাচীনপন্থীরা ধরে নিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি শতকরা ২৫ বা ৩০ ভাগের বেশি ভোট পাব না তাইজন্যে ফলাফলটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিনামেঘে বজ্রপাতের

মত। ওদের নিজেদের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায়। ওরা ভাবতে থাকে কেবল ক্ষমতাই (সাতটি প্রাদেশিক সরকার) তাদের হাত ফসকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে না, গান্ধীবাদীরা একযোগে বোধ করতে শুরু করে, তাদের গত বিশ বছরের কাজ একদিনে পণ্ড হয়ে গেল। তাদের যত কিছু আক্রোশ এসে পড়ল আমার উপর। দেশবন্ধুর আমল থেকে তারা আর কারও কাছে এমন হার স্বীকার করেনি। এরপরে এল গান্ধিজীর বিবৃতি—তিনি এগিয়ে এলেন প্রাচীনপন্থীদের উদ্ধার করতে এবং বললেন ওদের পরাজয় তাঁর নিজের পরাজয়। যারা "মধ্যপন্থী" তাদের মত বদলাতে শুরু করল। তাদের মন ঝুঁকছিল আমাদের দিকে কিন্তু তাদের কথায়—-তারা গান্ধিজীকে উড়িয়ে দিতে পারছিল না।

আমার অসুখটা দারুণ একটা দুর্দৈব হয়ে দাঁড়াল। ত্রিপুরিতে পরিষ্কারভাবে আমাদের পরাজয় ঘটেছে। তবে বোম্বাইয়ের এক বন্ধু আমাকে যেমন বলেছিলেন, ঘটনাটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম : একজন রুগ্ন লোক বিছানায় শুয়ে শুয়ে লড়াই করছে (১) প্রাচীনপন্থীর ১২ জন মাতব্বরের সঙ্গে, (২) জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে (৩) সাত সাতটি প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে (যারা দক্ষিণপন্থীদের জন্য দালালি করছিল) এবং (৪) মহাত্মা গান্ধীর নাম, প্রভাব এবং সম্মানের সঙ্গে। তিনি তাঁর শেষ কথায় আমাদের পরাজয়কে নৈতিক জয় বলে অভিহিত করেন।

আমাদের হারবার আরও কারণ ছিল সি. এস. পি.'[১] নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমাদের তরফে কয়েকটা চালের ভুল। সি. এস. পি নেতাদের ত্রিপুরি নীতিতে ঐ দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এমন বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল যে তার ফলে দলের ভিতশুদ্ধ নড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টিও সি. এস. পি'র সঙ্গে হাত মেলায় কিন্তু শেষ মুহূর্তে সি. পি. নেতারা যা স্থির করেছিল (সি. এস. পি নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে) তা বানচাল করে দেয় দলের সাধারণ কর্মীদের বিক্ষোভ।

১। সি. এস. পি : কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি

এই সঙ্কটের সময় পণ্ডিত নেহরু ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের আদর্শের যতখানি অনিষ্ট করেছেন, তেমন আর কেউ করেন নি। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন আমরাই সংখ্যায় বেশি হতে পারতাম। এমনকি তিনি যদি নিরপেক্ষ থাকতেন তাহলেও সম্ভবত আমরা সংখ্যাধিক হতাম। কিন্তু ত্রিপুরিতে তিনি ছিলেন দক্ষিণপন্থীদের দলে। প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার ১২ জন মাতব্বরের কার্যকলাপের থেকে অনেক বেশি আমার ক্ষতি করেছে। ভাবলে সত্যিই দুঃখ হয়।

আপাততঃ আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। গান্ধিজী ও আমার মধ্যে কথাবার্তা চলেছে। তাঁরা কোন একটা মীমাংসার দিকে যাবেন কি না—এত আগে তা বলা যাচ্ছে না। এও সম্ভব যে শেষ পর্যন্ত আমাকে ইস্তফা দিতে হতে পারে।

সাধারণের চোখে সি. এস. পি বেশ পড়ে গেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এম. এন. রায়ের লাভ হয়েছে। তিনি এখন বাংলা দেশে ঘুরছেন এবং যেখানেই যাচ্ছেন সবাই তাঁকে ভালোভাবে নিচ্ছে। স্বভাবত তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের একটা দুর্বলতা আছে তবে তিনি সত্যি কোন প্রতিষ্ঠা পাবেন কি না তা নির্ভর করে তাঁর বন্ধুদের উপর অর্থাৎ যাদের সঙ্গে তিনি জোট বাঁধবেন তাদের উপর। তিনি অত্যন্ত স্বতন্ত্রবাদী, জোট বেঁধে কাজ করা তাঁর ধাতে নেই। এটি তাঁর মস্ত একটা ত্রুটি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তার উপসংহার যতই দুঃখদায়ক হোক, তার ফলে কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা তীব্র হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এইটেই যোগাবে দারুণ প্রেরণা। সামনের ভবিষ্যতে আমাদের কপালে যাই থাক না কেন, শেষপর্যন্ত আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি বাস্তববাদী হিসেবেই এ কথা বলছি। প্রগতিপন্থী ও বৈপ্লবিক শক্তিগুলির শতকরা ৯০ ভাগ আমাদের পক্ষে। আমার দুঃখ হয় যখন ভাবি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ও পরে এবং বিশেষ করে ত্রিপুরিতে জওহর নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন

তার ফলে এমনকি যারা তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল তাদের মধ্যেও জওহর সম্পর্কে ধারণা দারুণভাবে নাড়া খেয়েছে। দেড়ঘণ্টা ধরে ডেলিগেটরা তাঁর কথা শুনতেই চান নি। তাঁরা শান্ত হলেন একমাত্র যখন মেজদা[১] তাঁদের শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। এমন ঘটনা কখনও কেউ শোনে নি। এই পর্যন্তই থাক। ভালোবাসা জেনো।

তোমাদের
সুভাষ

১। মেজদাদা—শরৎচন্দ্র বসু

আমার অদ্ভুত অসুখ

১৯৩৯ এর এপ্রিলে 'মডার্ণ রিভিউ' এ প্রকাশিত প্রবন্ধ

১৯৩৯ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি। সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমি সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওয়ার্ধায় ফিরে আসি। রাত্রে কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং গুরুতর বা জরুরী কিছু করার না থাকায় আমরা গল্প-গুজব করতে থাকি। আমি অসুস্থ বোধ করছিলাম, তাই তাঁদের সামনেই আমি নিজের টেম্পারেচার দেখি। দেখলাম জ্বর ৯৯'৪ ডিগ্রী হয়েছে। ব্যাপারটার উপর তেমন কোন গুরুত্ব দিইনি।

পরের দিন ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমি ওয়ার্ধা থেকে কলকাতা রওনা হব। সকালে সুস্থ বোধ করার বদলে কেমন যেন খারাপ লাগছিল। ভাবলাম গত রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার জন্যে ওইরকম হয়েছে। ওয়ার্ধায় এবং নাগপুর স্টেশনে অনেক বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, নিজের কথা ভাববার তাই সময় পাইনি। নাগপুর স্টেশন ছেড়ে ট্রেন যখন চলতে শুরু করেছে একমাত্র তখনই আমি বুঝতে পারলাম, আমি অসুস্থ। এইবার টেম্পারেচার নিয়ে দেখি জ্বর ১০১ ডিগ্রী। সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টা দুয়েক পরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এক ভদ্রলোক আমার কামরায় এলেন। তাঁর উপস্থিতি আমার ভালো লাগছিল না, বিশেষ করে যখন জানতে পারলাম তিনি কলকাতা পর্যন্ত সারাপথ সঙ্গে যাবেন, কারণ, জ্বর অবস্থায় তখন আমার একলা থাকতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু উপায় নেই ; তাঁরও সেখানে থাকার যেমন অধিকার ছিল আমারও তেমনই। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করে সহৃদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার কী হয়েছে? আপনাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।" আমি বললাম, আমি ভালো বোধ করছি

না, আমার জ্বর এসেছে। তখন তিনি বললেন, "আপনি ঘামছেন দেখছি। নিশ্চয়ই আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।"

সমস্ত দিন সমস্ত রাত আমি আমার বার্থে পড়ে রইলাম এবং সর্বক্ষণ ঘেমেছি। তাঁর কথাগুলো বারে বারে আমার মাথায় ঘুরছিল "আপনাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।" আমাকে অত খারাপ দেখাবার কারণ কী ? আমার মুখের ভাব সবসময় এমনই থাকে যে অনেক দিন অসুখে ভোগার পরও আমাকে কদাচিৎ সত্যি খারাপ "দেখায়"। তাছাড়া একদিনের অসুখে আমাকে কি করে এতখানি কাহিল দেখাতে পারে ? আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম।

পরের দিন সকালে আমি প্রতিজ্ঞা করে উঠলাম, আমাকে দেখাতেই হবে আমি সুস্থ আছি। আমি বাথরুমে গিয়ে ভালো করে মুখ হাত ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম তখন আগের দিনের থেকে কিছুটা ভালো দেখাচ্ছিল। আমার সহযাত্রী সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেমন বোধ করছি। আমার জবাব শুনে তিনি বললেন "আচ্ছা, আজ আপনাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে। কাল আপনাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।"

স্টেশান থেকে আমি বাড়িতে গিয়ে দেখি কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিছুটা জোর করেই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলাম বটে তবে ১১টা নাগাদ এমন কাহিল বোধ হতে লাগল যে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হল। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে হল। সেই বিছানায় বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাকে পড়ে থাকতে হয়েছিল।

ডাক্তার এলেন এবং সব রকম পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে জানালেন রোগ গুরুতর। প্যাথোলজিস্টকে ডাকা হল, তিনি যথারীতি পরীক্ষার জন্যে রক্ত ইত্যাদির নমুনা নিয়ে গেলেন। পরে আরও অনেক ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। তার মধ্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের অগ্রগণ্য স্যার নীলরতন সরকারও ছিলেন।

ডাক্তাররা যখন রোগ নিয়ে চিন্তিত এবং কি করে তা আয়ত্তে

আনা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, আমি নিজে তখন বাইরের আমার নানা কাজের কথা ভাবছিলাম। ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারি বিহারের হাজিপুরে ও মজফরপুরে আমার কাজ ছিল এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ঠিক ছিল ওয়ার্ধায়। ১১ই ফেব্রুয়ারি আমি ওয়ার্ধা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছই এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় আমি পাটনা রওনা হয়ে যাবো ঠিক ছিল। আমার আগেকার কর্মসূচী বহাল আছে কিনা এবং আমি তা মেনে চলব কিনা জানতে চেয়ে বিহার থেকে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন আসতে লাগল। আমি জানিয়ে দিলাম, বহাল আছে, সেইসঙ্গে এ কথাও জানিয়ে রাখলাম, যদিও আমি অসুস্থ, যেমন করে হোক আমি আসবই। শুধু তাঁদের বলেছিলাম শোভাযাত্রার সব ব্যবস্থা বাতিল করতে এবং আমার কর্মসূচী যতদূর সম্ভব হালকা করতে। বাড়িতে আমার নিজের লোকদের বললাম, সেই দিনই (১৭ই ফেব্রুয়ারি) রাত্রের ট্রেনে আমি হাজিপুর হয়ে পাটনা যাচ্ছি। ডাক্তাররা যাই বলুক না কেন, ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আমার যে কর্মসূচী ঠিক ছিল তা পালন করতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডাক্তারের নির্দেশ শোনবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে আমি বলে দিলাম, আমার ১০৫ ডিগ্রী জ্বর থাকলেও আমি রওনা হয়ে যাব। তারপর আমার টিকিট কেটে আনতে ও বার্থ রিজার্ভ করতে নির্দেশ দিলাম।

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল, আমার জ্বরও উত্তারোত্তর উঠতে লাগল। সবচেয়ে মারাত্মক—অসম্ভব মাথার যন্ত্রণায় মনে হল রগ দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে। যখন রওনা হবার সময় এল সবকিছু ঠিক থাকলেও আমি তখন মাথা তুলতে পারছি না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে হার মানতে হল এবং সংকল্প ত্যাগ করতে হল। অনুশোচনার সঙ্গে টেলিগ্রাম করে জানাতে হল ঐ রাত্রে আমার পক্ষে রওনা হওয়া অসম্ভব, তবে পরের দিন রওনা হতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। পরের দিন অবস্থার কোন উন্নতি হল না, বরঞ্চ তা আরও খারাপ হল। তাছাড়া ১৭ তারিখে আমার রওনা না হওয়ার ফলে সব আয়োজন

-বানচাল হয়ে গেল। অতএব মজফরপুরে যাওয়াটা একেবারে বাতিল করে দিতে হল। অপ্রত্যাশিত এই অবস্থা বিপর্যয়ে আমার গভীর অনুশোচনা কিছুতেই বলে বোঝান যায় না।

যদিও ১৮ ফেব্রুয়ারির পর মজফরপুরকে আমার কর্মসূচী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, নিজের মনে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধায় মিটিংয়ের জন্যে আমি ভাবতে আরম্ভ করলাম। ওয়ার্ধায় যাওয়া অসম্ভব বলে ডাক্তাররা আমাকে বারে-বারে সাবধান করতে লাগলেন। আমি যদি ওয়ার্কিং কমিটির চিন্তা ত্যাগ করে সুস্থ হয়ে ওঠার দিকে মন দিই, আমি তাহলে হয়তো ত্রিপুরি কংগ্রেসে যেতে পারব—নইলে ত্রিপুরিকেও বাতিল করতে হতে পারে। কিন্তু এত সব হুঁসিয়ারি কালা লোকের সঙ্গে কথা বলার মত। ডাক্তারের নির্দেশ সত্ত্বেও আমার যাবার আয়োজন চলল এবং বন্ধুদের দয়ায় ২২শে ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমাকে নাগপুরে নিয়ে যাবার জন্যে একটা এরোপ্লেনও ঠিক করা হল।

২১শে তারিখে আমি ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম ডাক্তাররা ঠিকই বলেছেন, ট্রেনে বা প্লেনে কিছুতেই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। একথা মহাত্মা গান্ধীকে ও সর্দার প্যাটেলকে আমি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম, সেইসঙ্গে প্রস্তাব করলাম ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং যেন মুলতুবি রাখা হয়। তখন আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন (বা তেরোজন) সদস্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন।

ওই দুটো টেলিগ্রাম নিয়ে অনেক রকমই জল্পনা হয়েছে, বলা হয়েছে আমি নাকি ওয়ার্কিং কমিটিকে বাঁধাধরা রুটিনমাফিক কাজ করবারও অনুমতি দিইনি। এরকম অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। প্রথমত টেলিগ্রামে এমন কিছুই ছিল না যাতে বোঝা যায় আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে রুটিনমাফিক কাজও করতে দিতে চাইনি। আমার একমাত্র ভাবনার কারণ ছিল কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবগুলি। কংগ্রেসের

বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ঠিক আগে সাধারণত সেগুলি ওয়ার্কিং কমিটিই রচনা করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সর্দার প্যাটেলকে আমি যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তাতে মুলতুবি করা সম্পর্কে আমার মতামত জানিয়ে আমি তাঁকে অনুরোধ করি অন্যান্য সদস্যদের অভিমত জেনে নিয়ে তিনি যেন আমাকে টেলিগ্রাম করে জানান। আমার টেলিগ্রাম দুটির জবাবে আমি পেলাম ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্যের পদত্যাগ। এই সব সদস্য যদি আমার অনুপস্থিতিতেই ত্রিপুরি কংগ্রেসের জন্যে প্রস্তাব রচনা করতে চাইতেন, আমি নিশ্চয় তাঁদের পথে অন্তরায় হতাম না। কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে অন্যান্য সদস্যরা যদি মুলতুবি করা সম্পর্কে আমার সঙ্গে একমত না হতেন অথবা আমার সত্যিকার অভিপ্রায় কী সে সম্পর্কে তাঁদেব যদি কোন সংশয় থেকে থাকত, তাঁরা সহজেই আমাকে একটা ট্রাঙ্ককল বা টেলিগ্রাম করতে পারতেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে আমার দিক থেকে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। এছাড়া অন্যান্য ও আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়েও, যদি তাঁরা একবার খোঁজ নিতেন তাঁরা দেখতে পেতেন, আমার অনুপস্থিতিতে যদি তাঁরা চালিয়ে যেতে চাইতেন আমার দিক থেকে কোনই বাধা পেতেন না। আমার একমাত্র ভাবনা ছিল, ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবগুলি এমনভাবে করিয়ে নেওয়া যাতে সব সদস্যরা একমত হন—তা না হলে বিপদ হবে এই যে, 'আনুষ্ঠানিক-ভাবে' যখন খসড়াপ্রস্তাবগুলি সাবজেক্টস কমিটির কাছে আসবে তখন দেখা যাবে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছেন। এই মতৈক্যের জন্যে ওয়ার্কিং কমিটিতে খসড়া প্রস্তাবগুলি রচিত হবার সময় আমার উপস্থিতি দরকার ছিল। সেইজন্যেই ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং মুলতুবি রাখার কথা আমি বলেছিলাম। আমার প্রস্তাবমত কাজ ভালোভাবেই হত যদি বারোজন (বা তেরোজন) সদস্য সবাইকে হতচকিত করে ইস্তফা দিয়ে আমায় জবাব না দিতেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি আমি সর্দার প্যাটেলকে এই টেলিগ্রাম করি :

সর্দার প্যাটেল, ওয়ার্ধা

মহাত্মাজীকে করা আমার টেলিগ্রাম অনুগ্রহপূর্বক দেখিবেন। দুঃখের সঙ্গে বোধ করিতেছি ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবি রাখিতে হইবে। সহকর্মীদের পরামর্শ লইয়া টেলিগ্রামে অভিমত জানাইতে অনুরোধ করি। —সুভাষ

কিন্তু আমি অন্য কথায় চলে এসেছি বলে দুঃখিত। এটি 'রাজনৈতিক' প্রবন্ধ নয়, এবং আমি যখন কলম ধরেছিলাম, আমি 'আমার অদ্ভুত অসুখ' সম্বন্ধে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম এবং বলতে চেয়েছিলাম কেন আমি আমার অসুখকে অদ্ভুত বলেছি। এবারে আমি আমার কথায় ফিরে যাই।

২১ তারিখে সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত হতাশার মধ্যেও আমি আশা করছিলাম আমি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে যোগদান করতে পারব, অন্ততপক্ষে ২২ তারিখে প্লেনে সেখানে হাজির হতে পারব। কিন্তু ডাক্তারদের এইসব চিন্তার কোন বালাই ছিল না। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, ওয়ার্ধার প্রশ্নই উঠতে পারে না—তাঁদের লক্ষ্য ছিল ত্রিপুরি। তাঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল আমার অবস্থা পরবর্তী কয়েক-দিনের মধ্যে এমন করে তোলা যাতে আমি অন্তত ত্রিপুরি কংগ্রেসে গিয়ে উঠতে পারি। স্যার নীলরতন সরকারের বুলেটিন তো ত্রিপুরি কংগ্রেসকেও নিষিদ্ধ বলে জানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমি আমার ডাক্তারদের যুক্তিতর্ক দিয়ে নানাভাবে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত সোজা জানিয়ে দিলাম: যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আমি আমাদের ইতিহাসের এমন সঙ্কটমুহূর্তে ত্রিপুরি কংগ্রেস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি যাতে কংগ্রেসে যোগদান করতে সমর্থ হই তার জন্যে মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব তাঁরা আমার জন্যে তা করেছেন।

আমার পাঁচ সপ্তাহের অসুখের কথা যখন ভাবি, তখন আমাকে একটি স্বীকারোক্তি করতেই হয়। শুরু থেকে আমার অসুখ সম্পর্কে

ডাক্তাররা যতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমি ততখানি দিইনি—আসলে আমি ভেবেছিলাম তাঁরা অকারণে বেশি ভয় পাচ্ছেন—এবং তাঁদের সঙ্গে যতখানি সহযোগিতা করা আমার উচিত ছিল আমি তা করিনি। অপরপক্ষে আমার একটা যুক্তিসঙ্গত অছিলাও ছিল। আমার পক্ষে শরীর ও মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া অসম্ভব ছিল। আমি অসুখে পড়ি অত্যন্ত সঙ্কটের সময়ে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ সেই সঙ্কটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমাকে আক্রমণ করে বিবৃতির পর বিবৃতি বার হতে থাকে। সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত আসে এমন জায়গা থেকে যেখান থেকে তা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আপিস থেকে পাঠিয়ে দেওয়া জরুরী কাজকর্ম বাধ্য হয়ে আমাকেই দেখতে হয়। সাক্ষাৎকার সম্পর্কেও স্থানীয় বন্ধুবান্ধব ও দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা না করলেও, অনেক দূর দূরজায়গা থেকে যে সব কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের কাজে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরিয়ে দিতে আমি পারিনি। এইসব এবং অন্যান্য আরও কারণে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও আমার শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম সম্পর্কে ডাক্তারদের উপদেশ মেনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখানে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলছি। আমার বিরুদ্ধে যখন বিবৃতির পর বিবৃতি বার হচ্ছে তখন আমার চুপ করে থাকাটারই অপব্যাখ্যা করা হচ্ছিল এবং বিভিন্ন প্রদেশের এমনকি দূরাঞ্চলের বন্ধুরা আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন আমার বিরুদ্ধে যে সব ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে অন্তত পক্ষে তার মধ্যে কতকগুলিকে খণ্ডন করার জন্যে আমি যেন যাহোক একটা জবাব প্রকাশ করি। আমার ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন বেশ কিছুটা দ্বিধাসংকোচের পর একদিন বিকেলে আমি ঠিক করে ফেললাম আজই আমার বিবৃতিটা লিখে ফেলব, তার ফল যাই হোক। ব্যাপারটা কিন্তু সহজ ছিল না। প্রথমে কী কী অভিযোগ করা হয়েছে তা বোঝবার জন্যে তদবধি যে সব বিবৃতি বার হয়েছে আমাকে

সেগুলো পড়তে হল। তা শেষ করার পরই আমি আমার বিবৃতি বলে যেতে শুরু করলাম। যখন টাইপ করা খসড়াটা দেখা শেষ করে খবরের কাগজে তা ছাপাবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছি তখন মাঝরাত। তখন আমার জ্বর দেখা হল, জ্বর তখন ১০৩ ডিগ্রী। এর আগে মোটামুটি আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং গত দুদিন সন্ধ্যায় ১০১ ডিগ্রীর বেশি জ্বর ওঠেনি। সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে নিজের ইচ্ছামত মাথা খাটানোর ফলে যে অবনতি ঘটল তার জন্যে ডাক্তাররা আক্ষেপ করলেন বটে কিন্তু আমি যে অবস্থায় পড়েছিলাম তাতে আমার তা না করে উপায় ছিল না।

এবারে আমার ঝঞ্ঝাটগুলির মধ্যে যেটি মোক্ষম সেই প্রসঙ্গে আসছি, কারণ যা ঘটেছে তার অনেকখানি একমাত্র তাই থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধা থেকে ফিরে এসে কলকাতায় যখন আমি অসুস্থ হয়ে রয়েছি তখন স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা সর্বত্র গুজব রটিয়ে চলেছিল যে আমার অসুখটা 'মেকি', ২২এ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এড়াবার জন্যে আমার 'রাজনৈতিক' জ্বরকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাকে এই খবর জানায় কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমার বন্ধুরা এবং এই খবরের সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্দেহ করতে পারি না। যে সব লোকেরা জেনেশুনে বদ মতলবে ঐরকম মিথ্যা গুজব রটাচ্ছিল, এমনকি স্যার নীলরতন সরকারের বুলেটিনও তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। একই ধরণের প্রচার চালান হয়েছিল জব্বলপুরে ও ত্রিপুরিতে। ৬ই মার্চ বিকেল ৪টা নাগাদ যখন আমি জব্বলপুরে পৌঁছই আমার জ্বর তখন ১০১ ডিগ্রী। অ্যাম্বুলেন্সে করে যখন ত্রিপুরিতে আমার ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছই জ্বর তখন ১০৩ ডিগ্রীতে উঠেছে। ত্রিপুরিতে পৌঁছনোর পর রিসেপশন কমিটির ডাক্তাররা আমার ভার নিলেন। আমাকে পরীক্ষা করার পর তাঁদের মধ্যে একজন অপর একজনের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকালেন, তৎক্ষণাৎ আমার কাছে তা অদ্ভুত ঠেকল। দিন দুয়েক পর সব ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম। ত্রিপুরিতে সবাইকে বলা

হয়েছিল আমি সত্যি অসুস্থ নই এবং এই প্রচারের পাল্লায় ডাক্তাররাও পড়েছিলেন। আমার পৌঁছবার পর আমাকে পরীক্ষা করে যখন তাঁরা দেখতে পেলেন আমি গুরুতর অসুস্থ, তাঁরা অবাক হন এবং মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচার চালানো হয়েছে বলে রেগে যান। তাঁদের রাগ আরও বেড়ে যায় যখন ত্রিপুরিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের বুলেটিনও বিশ্বাস করতে নারাজ হয়। যেমন, একদিন ওয়ার্কিং কমিটির একজন গণ্যমান্য প্রাক্তন সদস্য অভ্যর্থনা কমিটির ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করেন আমার সত্যিই ১০২ ডিগ্রী জ্বর হয়েছে কিনা এবং তিনি (ডাক্তারবাবু) নিজে জ্বর দেখেছেন কিনা। কয়েকটি স্বতন্ত্র সূত্র থেকে আমার কাছে খবর আসে যে, এমনকি উচ্চতম মহলেও আমার অসুখ বিশ্বাস করা হয়নি। একদিন নিছক্ উত্ত্যক্ত বোধ করে রিসেপশন কমিটির ডাক্তাররা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সিবিল হাসপাতালগুলির ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং জব্বলপুরের সিবিল সার্জনকে নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড বসালেন। তাঁদের যুক্ত বিবৃতি বার হবার পর, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু এই সব হোমরাচোমড়া সরকারি লোকদের নিয়ে আসার ফল হল এই যে কংগ্রেসের উন্মুক্ত অধিবেশনে আমার যোগদান করা একেবারে বারণ হয়ে গেল। রিসেপশন কমিটির ডাক্তারদের হাতেপায়ে ধরে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগদান করার অনুমতি কোনমতে হয়তো আদায় করতে পারতাম, কিন্তু সরকারি অফিসারদের কাছে তা সম্ভব নয়। তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করার আগে চালাকি করে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেন তাঁদের অভিমতে আমার আস্থা আছে কিনা এবং তাঁদের নির্দেশ মানব কিনা। স্বভাবত আমাকে সায় দিতে হয়েছিল এবং তারপরে আমি যেন নিজের জালেই বাঁধা পড়লাম—কারণ আমাকে পরে বলা হল, কংগ্রেসের উন্মুক্ত অধিবেশনে আমি যোগদান করতে পারব না। রিসেপশন কমিটি আমার জন্যে যে আয়োজন করেছিল তা খুবই সন্তোষজনক এবং শারীরিক প্রয়োজনের দিক থেকে আমার অভিযোগ করার কিছুই ছিল না। কিন্তু উপরের ওই ও অন্যান্য নানাকারণে

ত্রিপুরির মানসিক পরিবেশ ছিল বেশ পীড়াদায়ক। কংগ্রেসের আগেকার কোন অধিবেশনে এরকম অভিজ্ঞতা কখনও আমার হয়নি।

১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে আমি যে সব চিঠি, টেলিগ্রাম ইত্যাদি পেয়েছি, তা পড়বার আনন্দ ছাড়াও, সেগুলি একসঙ্গে জড়ো করলে রীতিমত একটা বই হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিদিন তা আসছে—শুধু চিঠি বা টেলিগ্রাম নয়, নানা ধরনের ওষুধপত্র মাদুলি কবচ ভর্তি পার্সেল ও প্যাকেটও তাতে আছে। ধর্মমত অনুযায়ী লেখক ও প্রেরকদের আমি ভাগ করতে চেষ্টা করছিলাম, দেখলাম তাঁদের মধ্যে সব ধর্মমতই আছে। কেবলমাত্র সব ধর্মমতই নয়, সব রকমের চিকিৎসা শাস্ত্র (সব 'প্যাথি', কথাটা যদি ব্যবহার করতে পারা যায়) এবং নারীও আছে পুরুষও আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্সী ইত্যাদি—অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, বৈদ্য, হকিম, প্রাকৃতিক চিকিৎসক, গণৎকার ইত্যাদি—নারী পুরুষ—সকলে আমাকে লিখে চলেছেন, আমাকে উপদেশ দিয়ে এবং কখনও কখনও ওষুধের নমুনা ও কবচ সঙ্গে পাঠিয়ে। স্বভাবত তাঁদের সহৃদয়তার জন্যে চিঠি লিখে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানানো এখন আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কখনও কখনও আমার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে একাধিকবার তাঁরা লিখেছেন। এত সব ব্যবস্থা-পত্র নিয়ে আমি এখন কী করি ? প্রথমে আমি আমার ডাক্তারদের হাতে সেগুলি তুলে দিই, সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হবে তাঁরাই তা সবচেয়ে ভালোভাবে ঠিক করতে পারবেন বলে, কিন্তু যে সব প্রেসক্রিপশন বা ওষুধ এসেছে ডাক্তাররা অধিকাংশক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে নারাজ। তাঁদের বা আমার দিক থেকে তা নির্মম নয় কি ? আমি বুঝি না।

ওষুধপত্র প্রেসক্রিপশন ছাড়াও অন্য এক ধরনের চিঠিপত্র ও পার্সেলও আমি পাচ্ছি। সাধু ও গণৎকাররা আমাকে কবচ ও আশীর্বাদী পাঠাচ্ছেন। এবং অপরিচিত কত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহমর্মী বন্ধু কোন মন্দিরে বা পীঠস্থানে আমার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করে পুজো দিয়ে আশীর্বাদী ফুল পাঠাচ্ছেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এইসব

আশীর্বাদী ফুল, পাতা, ভস্ম ইত্যাদি (বা নির্মাল্য) ভক্তিভরে গ্রহণ করে কিছুক্ষণের জন্য মাথায় রাখতে হয় বা কপালে ছোঁয়াতে হয়। মেয়েরা ওতেই থামে না। ওই কাজটুকু হয়ে গেলে তারা এগুলি ফেলে দিতে রাজী নয়। ফলে আমার বালিশের তলায় অসংখ্য কবচ ও এই ধরণের প্যাকেট পাওয়া যাবে। রোজই তারা সংখ্যায় বাড়ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনের গঠন অত্যন্ত যুক্তিবাদী, তবে আমি অপরের মনোভাব ও বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি যদিও তা আমার মতের সঙ্গে মেলে না।

অতএব আমি আপনমনেই ভেবে চলেছি এত সব প্রেসক্রিপশন, ওষুধ, মাদুলি কবচ, ফুল, ভস্মর আসল মূল্য কী। কাশ্মীর থেকে কন্যা-কুমারী—ভারতের সকল প্রান্ত থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর কাছ থেকে এইসব এসেছে, এই ভেবে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার এত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মী বন্ধু আছে জেনে কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ জলে ভরে এল। স্বপ্নেও আমি কখনও এতটা ভাবিনি। হতে পারে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কারও কারও কিছুটা আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তবে এঁদের মধ্যে বিরাট অংশ আমার কষ্টে আমার জন্যে শুধুমাত্র সত্যিকার সমবেদনা থেকেই যে লিখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসক্রিপশন, ওষুধ বা মাদুলিগুলোর বাস্তব মূল্য হয়তো কিছুই নেই কিন্তু তাদের পিছনে ছিল সত্যিকারের প্রীতি ও সমবেদনা বোধ, যার মূল্য আমার কাছে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর। পার্থিব ওষুধপত্র বা গণৎকারদের মাদুলি কবচের থেকে এইসব শুভেচ্ছা যে আমাকে সারিয়ে তুলতে অনেক বেশি সাহায্য করবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। যেখানে প্রেসক্রিপশন, ওষুধ বা কবচ ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেখানেও যাঁরা তা পাঠান তাঁদের সহৃদয় শুভেচ্ছা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করি।

ত্রিপুরির পীড়াদায়ক মানসিক পরিবেশের দরুন রাজনীতি সম্পর্কে এমন একটা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি যা গত উনিশ বছরের ভিতরে আগে কখনও তেমন বোধ করিনি। জামা-

ডোবায় বিছানায় শুয়ে দিনরাত যখন ছটফট করেছি, নিজেকে তখন বারেবারে এই প্রশ্নই করেছি। সর্বোচ্চ মহলেও যখন এত ক্ষুদ্রতা, এত প্রতিহিংসাপ্রবণতা তখন আমাদের জনসেবাব্রতের পরিণতি কী হবে! হিমালয়ের সেই চিরন্তন আহ্বান—আমার জীবনে যা প্রথম আকর্ষণ—সেইদিকে স্বাভাবিকভাবে আমার ভাবনার মোড় ঘুরে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমাদের রাজনীতির পরিণাম যদি এই হয় তাহলে, অরবিন্দ ঘোষ যাকে "দিব্য জীবন" বলেন, কেন আমি তা থেকে সরে এলাম। এতদিনে কি মায়ার আবরণ ছিন্ন করে সব প্রেম ভালবাসার উৎসমুখে ফিরে যাবার সময় আমার হয়েছে? উচিত-অনুচিতের সংশয় সন্দেহের দোলায় দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেটে যেতে লাগল। এক এক সময় হিমালয়ের আহ্বান দুর্নিবার হয়ে উঠত। আমার মনের অন্ধকারে একটু আলো পাবার জন্যে আমি প্রার্থনা করতাম। তারপরে ধীরে ধীরে আমার নতুন এক দৃষ্টি খুলে গেল এবং আমার মানসিক স্থৈর্য আবার ফিরে আসতে লাগল—সেই সঙ্গে ফিরে এল মানুষের উপর এবং আমার স্বদেশবাসীর উপর আমার বিশ্বাস। যতই হোক ত্রিপুরি ভারতবর্ষ নয়। এছাড়াও আরেক ভারত আছে, তার পরিচয় রয়েছে এই গোছা গোছা চিঠিতে, প্রেসক্রিপশনে, রয়েছে এই রাশি রাশি ওষুধে, কবচে, নির্মাল্যে আরও কত কী-তে। এই ভারত—যে ভারত হয়তো সত্যিকার ভারত—এই ভারতের বিরুদ্ধে আমার কী নালিশ আছে? তারপরে আমার খেয়াল হল, ত্রিপুরিতেও দুটো জগৎ ছিল। যে ক্ষুদ্রতা ও প্রতিহিংসার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তা ত্রিপুরির কেবল একটা অংশ সম্পর্কেই খাটে। অন্য অংশ সম্পর্কে? এই অংশ সম্পর্কে আমার কী নালিশ থাকতে পারে? তাছাড়া ত্রিপুরিতে আমার অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন মানুষের উপর মৌলিক বিশ্বাস আমি হারাই কী করে? মানুষকে অবিশ্বাস করার অর্থ তার অন্তরের ভগবানকে অবিশ্বাস করা—নিজস্ব অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করা। ক্রমশ আমার সব সন্দেহ দূর হল, আবার আমি আমার সুস্থ স্বাভাবিক আশাবাদে ফিরে এলাম। আমার স্বাভাবিক

সত্তাকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় এই সব প্রেসক্রিপশন, ওষুধ, মাদুলি, নির্মাল্যের অবদান ছিল অনেকখানি।

শারীরিক কষ্ট আমি অনেক ভোগ করেছি এবং অনেক রকম রোগের অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় রোগবিদ্যার পাঠ্যবইয়ে যত কিছুর হদিস দেওয়া আছে আমি সব শেষ করে ফেলেছি। বাড়িতে, বাইরে এমনকি জেলেও আমি অসুস্থ হয়েছি। সত্যি বলতে কি, আমি যে এখনও বেঁচে আছি এবং চলেফিরে বেড়াচ্ছি তাই দেখে আমি নিজে প্রায়ই অবাক হয়ে যাই। কিন্তু ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ থেকে একমাস ধরে যেরকম একটানা বিষম ও তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে সে রকম যন্ত্রণা সারা জীবনে আমি কখনও ভোগ করিনি। এ কথা ঠিক, জেলখানাতে আমার রোগভোগ কম হয়নি। তবে তখনকার ভোগান্তিটা ছিল আরও অনেক বেশিদিনে ছড়িয়ে। কিন্তু এবারে আমার কী হল? গতমাসের গোড়ার দিকে আমি আগের থেকে সুস্থই ছিলাম। কি করে এবং কেনই বা আমি হঠাৎ অমন গুরুতর অসুখে পড়লাম? হয়তো ডাক্তাররাই এর জবাব দেবার চেষ্টা করতে পারেন, তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষ—রোগী নিজেই—কি চেষ্টা করতে পারে না?

ডাক্তারদের সামনে তো রোগ পরীক্ষার রিপোর্ট স্তূপাকার হয়ে জমে রয়েছে। এছাড়াও তাঁরা আমাকে বারেবারে পরীক্ষা করে দেখেছেন। রোগী ঠিক কী রোগে ভুগছে যদিও তাঁরা তা রোগীকে জানাতে চান না, তবু আমি এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি, আমার বর্তমান ব্যাধি নিউমোনিয়া গোছের কিছু, সঙ্গে রয়েছে, লিভারের ও পেটের গোলোযোগ। তাঁরা আরও বলেন, ব্লাড প্রেসার অসম্ভব কম। এর উপর সেডিমেন্টেশন পরীক্ষায় ও অন্যান্য উপায়ে জানা গেছে প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে এবং দুর্বলতা অত্যধিক। রোগের আক্রমণকে যোঝবার ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার মত যথেষ্ট শক্তি শরীরে নেই। এই ব্যাখ্যা কি যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত? আমি জানি না।

কোন না কোন কারণে আমার জীবনীশক্তি আপাতত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে—এই ব্যাখ্যা ছাড়া আমার এই দুঃসহ শারীরিক ভোগান্তি ও দীর্ঘ অসুস্থতার সত্যিকার কারণ কী তা রোগশয্যায় আমাকে পরীক্ষা করে এবং অন্যান্য নানা পরীক্ষায় ধরা পড়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। অসুখে পড়ার কয়েকদিন পর থেকে আমার ব্যাধিটা কী ধরনের জানিয়ে নানা জায়গা থেকে আমার কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম আসতে লাগল। তার মধ্যে কয়েকটি টেলিগ্রাম ছিল, তাতে বলা হয়েছে (আমার উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে) তাই শুনে ডাক্তাররা প্রথমটা হেসেছিলেন। পরে তাঁরা ব্যাপারটা ভেবে দেখেন কিন্তু নিদানিক এমন কোন সূত্র তাঁরা পেলেন না যাতে এই ধারণা সমর্থিত হয়। এ নিয়ে তাই তাঁরা আর মাথা ঘামালেন না।

কয়েকদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের একজন নামকরা পণ্ডিত এবং আদর্শ চরিত্রের লোক। আমাদের পরিবারের সকলে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। আমাদের কাছে একটি খবর পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। আগের দিন আমার অসুখ নিয়ে আলোচনা করার জন্যে কয়েকজন পণ্ডিত ও জ্যোতিষী মিলিত হন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন, সাধারণ কারণ থেকে আমার এই অদ্ভুত ও জটিল অসুখ হয়নি। তাঁরা অভিমত দেন, তন্ত্রশাস্ত্রে যাকে মারণক্রিয়া বলা হয়, অর্থাৎ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বা ইচ্ছা শক্তির জোরে মৃত্যু ঘটানোর প্রয়াস, দেশের কোন অঞ্চলে কেউ সেই ক্রিয়া করেছে। শুনে প্রত্যেকে কৌতূহল এবং সেইসঙ্গে মজাও বোধ করল। তান্ত্রিক যৌগিক ব্যায়ামে অস্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব একথা অবিশ্বাস না করেও এই ১৯৩৯ সালে মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদির মত মনোজাগতিক ঘটনা ঘটা কি সম্ভব ? আমাদের অভ্যাগত অধ্যাপক কিন্তু দৃঢ়নিশ্চিত যে, যদিও এইরকম ঘটনা আজকাল বিরল, তবুও তা কিন্তু ঘটে থাকে। এবং তিনি এইরকম অনেক ঘটনার কথা বললেনও। তিনি আরও

জানালেন, যদিও মারণক্রিয়া করা হয়েছে, আমার শক্তির দরুণ এর ফলে মারাত্মক কিছু হবে না, কেবল আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। আমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কী ভাবে আমার সাবধান হওয়া উচিত সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

আমি স্বীকার করছি এতশত কথা আমাকে একটুও বিশ্বাস করাতে পারেনি, কিন্তু তবু তা আমার মনে অপার্থিব একটা অনুভূতি রেখে গিয়েছিল। আমার মনের পেছনে আবছা যেন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের ছাপ পড়েছিল। অন্য কোন লোক ঐ ভাবে কথা বলতে এলে বিনা ভণিতায় তাকে বিদায় করে দেওয়া হত। কিন্তু অসাধারণ বিদ্বান ও নির্মল চরিত্রের এই ভদ্রলোক, যাঁর ন্যায়নিষ্ঠা সন্দেহাতীত, রাজনীতির সঙ্গে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই এবং যাঁর নিজের স্বার্থের ধান্দা নেই তাঁর কথার গুরুত্ব দেওয়া না হলেও কথা শুনতেই হয়।

প্রায় এই সময়েই, অর্থাৎ ত্রিপুরি রওনা হবার কয়েকদিন আগে আমার কিছু বন্ধু আমাকে কবচ পরতে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তাতে নাকি আমার পক্ষে স্বাস্থ্যোদ্ধার করা সহজ হবে। আমার যুক্তিবাদী মন প্রথমে এতে বেঁকে বসল, কিন্তু এক দুর্বল মুহূর্তে আমি রাজী হয়ে গেলাম। দুটো আংটি ও চারটে কবচ নিতে রাজী হলাম। যাদের আমি জানি এবং যাদের ব্যবসাগত কোন উদ্দেশ্য ছিল না তাদের কাছ থেকেই কেবলমাত্র ওই কটি আমি নিয়েছিলাম। যাদের আমি নিজে চিনি না তাদের কাছ থেকে মাদুলি কবচ কিছুই আমি নিইনি এবং এইরকম ছিল অসংখ্য। এগুলি সব ধারণ করলে নিজেকে একটা মাদুলি কবচের প্রদর্শনীতে পরিণত করা হত। ত্রিপুরি কংগ্রেসের সময় ভালো থাকার জন্যে আমি এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম যে আমি নিজেকে এই বলে বোঝাই যে, ওই সব মাদুলি কবচ ধারণ করার ফলে যদি আমার ভালো থাকার শতকরা পাঁচভাগের সম্ভাবনা থাকে তাই বা ছাড়ি কেন? এইভাবে আমার সহজাত যুক্তিবাদিতার সঙ্গে একটা রফায় আসা গেল—তবে ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হয়ে যেতেই আমি আংটি দুটো ও কবচ চারটে সঙ্গে সঙ্গে

খুলে ফেললাম। আপাতত আমার যুক্তিবাদিতার কোন ভয় নেই এবং প্রকৃতি ও বরাতের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

আমার অসুখের কয়েকটা দিক আছে যার কারণ সাধারণ মানুষ হিসেবে অন্তত আমি কিছুই খুঁজে পাই না। নিয়ম বা পালা বলে কিছু নেই। কয়েকদিন ধরে দুপুরের দিকে হয়তো জ্বর বাড়তে শুরু করে সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ বেশীরকম বাড়ে, তারপর আস্তে আস্তে নেমে আসে। পরের দিন সকালে হয়তো জ্বর নেই। জ্বর যখন বাড়তে থাকে তখন অসহ্য মাথার যন্ত্রণা—পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত বরফ লাগাবার পর সেই যন্ত্রণার উপশম হয়। জ্বর যখন ছাড়ে তখন দারুণ ঘাম হতে থাকে, সেই সঙ্গে অসম্ভব অবসাদ। তারপরে হঠাৎ এই নিয়ম পাল্টিয়ে যায়। একদিকে দিনরাত যেমন জ্বর ছাড়ার নাম নেই, অন্যদিকে জ্বরও থাকে খুব বেশি। কখনও কখনও লক্ষণ দেখে মনে হয় মারাত্মক ধরনের ম্যালেরিয়া, কখনও মনে হয় আন্ত্রিক জ্বর, আবার কখনও অন্য কিছু।

কিন্তু প্রতিবারই রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা যাবে কিছুই নেই। একদিন যদি জ্বর ১০৪ ডিগ্রীতে উঠল, পরের দিনই হয়তো তা ছেড়ে গেল, সবাই ভাবল আর জ্বর আসবে না। কিন্তু তিন দিনের দিন দেখা যাবে আবার জ্বর উঠছে। জ্বরের খামখেয়ালি সেই সঙ্গে নানা ধরনের লক্ষণের জন্যে ডাক্তাররা ও আর সকলেও কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। আর কেন যে আমার এই অসম্ভব দুর্বলতা ও অবসাদ তা রহস্যই রয়ে গেল। আজও পর্যন্ত আমার মনে হয় না আমি সত্যিই যতটা কাহিল হয়েছি তার অর্ধেকও আমাকে দেখে বোঝা যায়।

গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে বা তারও বেশি যদিও বাইরের জগতের সঙ্গে আমার যোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল না, অন্যদিক থেকে কিন্তু সেই যোগ আমি অনেক ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম। যাদের রাজনীতির সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, যাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই —দেশের সুদূর প্রান্তের লোকেরা—এমনকি গোঁড়া পণ্ডিতরাও

আমার অসুখে আমার জন্য যেরকম উৎকণ্ঠিত ও কাতর হয়েছেন, তা আমি কল্পনা করতে পারিনি—প্রায়ই আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি—'আমরা কোন সূত্রে বাঁধা রয়েছি? ওঁরা সবাই কেন আমার জন্যে ভাবছেন? এত ভালবাসা পাবার মত কীই বা আমি করেছি?' এই সব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র তাঁরাই দিতে পারেন।

একটি জিনিস আমি জানি। এই সেই ভারতবর্ষ যার জন্যে লোকে পরিশ্রম করে, কষ্টভোগ করে। এই সেই ভারতবর্ষ যার জন্যে জীবন বিসর্জন দেওয়া যায়। এই সেই সত্যকার ভারতবর্ষ যেখানে চিরদিন আস্থা রাখা যায়, ত্রিপুরি যাই বলুক বা করুক না কেন।

জামাডোবা
জিয়ালগোবা পোঃ
জেলা মানভূম।

বসু-গান্ধী পত্রালাপ

(মার্চ—মে, ১৯৩৯)

[টেলিগ্রাম]

জিয়ালগোরা, ২৪এ মার্চ, ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী—বিড়লাভবন, নূতন দিল্লী।

কংগ্রেসের কাজ সম্পর্কে শরতের নিকট আপনার প্রস্তাব স্মরণে রাখিয়া এবং খুব শীঘ্র আপনার সহিত আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকায় পত্রযোগে আপনার সহিত আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমি লিখিতেছি।

—সুভাষ

নূতন দিল্লী, ২৫এ মার্চ, ১৯৩৯। রাষ্ট্রপতি বোস—জিয়ালগোরা

তোমার তারবার্তা। মৌলানা আজাদ আমার সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হওয়ায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গতকাল আমি এলাহাবাদ যাই এবং ট্রেনে যাইবার সময় একটি পত্র দিই। তোমার পত্র প্রত্যাশিত। আশা করি স্বাস্থ্যোন্নতি অব্যাহত আছে। ভালোবাসা।

—বাপু

জিয়ালগোরা, ২৫শে মার্চ, ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী—বিড়লাভবন, নূতন দিল্লী।

আপনার অদ্যকার টেলিগ্রাম। আপনার পত্র না পাওয়া অবধি আমি আমার পত্র পাঠাইলাম না।

—সুভাষ

জিয়ালগোরা, ২৫শে মার্চ, ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী—নূতন দিল্লী।

আপনার পত্র পাইলাম না। অতএব আমারটি পাঠাইতেছি।

সুভাষ

জিয়ালগোরা
২৫শে মার্চ, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

কংগ্রেসের কার্যকলাপে অচলাবস্থা সৃষ্টি করছি বলে যাঁরা আমাকে দোষারোপ করছেন তাঁদের জবাবে আজ (শনিবার, ১৫ই মার্চ) যে বিবৃতি দিয়েছি আশা করি আপনি তা দেখেছেন। আপাতত আমাদের জরুরী সমস্যা নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে হলে, তার আগে আরও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সমস্যা বিবেচনা করা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও আগের সমস্যাটা নিয়েই আমি প্রথমে আলোচনা করব।

এই সমস্যা সম্পর্কে আপনি যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আপনার মতামত অনুগ্রহ করে আমাকে জানান, আমি কৃতজ্ঞ থাকব :

(১) ওয়ার্কিং কমিটির গঠন সম্পর্কে বর্তমানে আপনার ধারণা কী? এতে কি সমমতাবলম্বীরাই থাকবে, না, এতে কংগ্রেসের ভিতরকার বিভিন্ন দল বা পার্টির লোক থাকা উচিত, যাতে কমিটি মোটামুটিভাবে যতখানি সম্ভব কংগ্রেস সংস্থার সাধারণ গঠনের অনুরূপ হতে পারে?

(২) আপনি যদি এই অভিমত এখনও পোষণ করেন যে কমিটি সমমতাবলম্বী হবে, তাহলে স্পষ্টতই একদিকে আমার মত লোকেরা এবং অপরদিকে সর্দার প্যাটেল ও অন্যেরা একই কমিটিতে থাকতে পারেন না। (এইখানে আমাকে বলতেই

হচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটিকে সমমতাবলম্বী হতেই হবে, বরাবর আমি এই ধারণার বিরোধিতা করে আসছি)।

(৩) আপনি যদি মেনে নেন ওয়ার্কিং কমিটিতে বিভিন্ন দল ও পার্টির লোকদের থাকা উচিত, তারা সংখ্যায় কতজন করে থাকবে ? আমার মতে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি প্রধান পার্টি বা গোষ্ঠী আছে। খুব সম্ভব তারা কম বেশী সমান সমান। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে আমরা ছিলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্রিপুরিতে হল অন্যরকম, তবে তা হয়েছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মনোভাবের দরুণ। সি. এস. পি যদি নিরপেক্ষ না থাকত, তাহলে নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও (পরবর্তী চিঠিতে অথবা আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমি তার উল্লেখ করব।) উন্মুক্ত অধিবেশনে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারতাম।

(৪) আমি যদি সাতজন সদস্যের নাম প্রস্তাব করি এবং আপনি যদি সর্দারকে সাতজনের নাম প্রস্তাব করতে বলেন, তা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হবে বলে আমার মনে হয়।

(৫) অধিকন্তু, আমাকে যদি প্রেসিডেণ্ট পদে বহাল থাকতে হয় এবং ঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হয় তাহলে আমার পছন্দমত কোন একজনের সাধারণ সম্পাদক হওয়া দরকার।

(৬) কোষাধ্যক্ষের নাম সর্দার প্যাটেল প্রস্তাব করতে পারেন।

এবার আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে প্রধান প্রধান যে দুটি বিষয় জড়িত আছে তার একটির কথা উল্লেখ করব। (পৃথক চিঠিতে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিখে জানাব।) প্রথমত, আপনি কি এটিকে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বলে মনে করেন এবং আপনি কি চান, এর ফলে আমার পদত্যাগ করা উচিত ? আমি এই প্রশ্ন করছি, তার কারণ এই প্রস্তাবের কয়েকপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমনকি যাঁরা প্রস্তাবটির সমর্থক তাঁরাও তা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর প্রেসিডেণ্টের

অবস্থা ঠিক কী দাঁড়াচ্ছে। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ১৫ ধারায় ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগ করা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের উপর কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা আছে এবং গঠনতন্ত্রের সেই ধারা আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। একই সঙ্গে পণ্ডিত পন্থর প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি আপনার ইচ্ছানুযায়ী গঠিত হবে। তাহলে মোট ফল কী দাঁড়াচ্ছে? আমাকে কি আদৌ গণ্য করা হচ্ছে? আপনি কি আপনার নিজের মনোমত ও ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করবেন এবং আমি কেবলমাত্র আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব? তার ফল হবে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ১৫ ধারাকে সংশোধন না করে অকার্যকর করা।

এই প্রসঙ্গে আমি না বলে পারছি না যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের উক্ত প্রকরণটি স্পষ্টতই গঠনতন্ত্রবিরোধী এবং বিধিবহির্ভূত। আসলে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটাই নিয়মসম্মত ছিল না, কারণ অনেক বিলম্বে তা পাওয়া গিয়েছিল। পণ্ডিত পন্থের সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি অনিয়মিত বলে অগ্রাহ্য করবার অধিকার আমার ছিল, ঠিক যেমন কংগ্রেসের উন্মুক্ত অধিবেশনে মৌলানা আজাদের অধিকার ছিল জাতীয় দাবির প্রস্তাবের উপর শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সংশোধনটি অনিয়মিত বলে অগ্রাহ্য করবার। অধিকন্তু পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পরও বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক দিক থেকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কিত শেষ প্রকরণটিকে অনিয়মিত বলে আমার অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল, যেহেতু তা গঠনতন্ত্রের ১৫ ধারাকে লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু আমার স্বভাব অতি-গণতান্ত্রিক বলে কেতা বা নিয়মপালনের খুঁটিনাটি ত্রুটির উপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করি না। অধিকন্তু, যে সময় আমি বুঝেছিলাম বিরুদ্ধ ভোটের সম্ভাবনা রয়েছে তখন গঠনতন্ত্রের আড়ালে আশ্রয় নেওয়া কাপুরুষোচিত হবে বলে আমি বোধ করেছিলাম।

এই চিঠি শেষ করবার আগে আরেকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করব। সব কিছু বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাকে যদি প্রেসিডেন্ট-রূপে বহাল থাকতে হয়, তাহলে আপনি আমাকে কিভাবে চলতে

বলেন? আমার মনে আছে, গত এক বছর মাঝে মাঝে (হয়তো বা প্রায়ই) আপনি আমাকে বলেছেন, পুতুল প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকি আপনি তা চান না এবং আপনি চান আমি আমার নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠিত করি। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় যখন আমি দেখলাম আপনি আমার কার্যক্রমে সম্মত নন, তখন আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমার সম্মুখে দুটো পথ খোলা আছে—হয় নিজেকে মুছে ফেলা, নয়তো, আমার যা আন্তরিক বিশ্বাস তাতে অটল থাকা। যদি আমার সঠিক স্মরণে থাকে, আপনি তখন জবাবে আমাকে বলেছিলেন, স্বেচ্ছায় আমি আপনার মত যদি মেনে নিতে না পারি, তাহলে নিজেকে মুছে ফেলা মানে দাঁড়াবে নিজেকে দমন করা এবং নিজেকে দমন আপনি অনুমোদন করতে পারেন নি। আমাকে যদি প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকতে হয় তাহলে গত বছর আমাকে আপনি যেরকম উপদেশ দিয়েছিলেন আপনি কি এখনও সেইরকমই বলবেন, পুতুল প্রেসিডেন্ট হয়ে আমি যেন না থাকি?

যা কিছু বললাম তাতে আমি ধরে নিয়েছি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে, বিশেষ করে ত্রিপুরি কংগ্রেসে যা কিছু ঘটেছে সব সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভিতরকার সব দল ও পার্টির মিলিতভাবে কাজ করা সম্ভবপর।

আমার পরের চিঠিতে সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আজ সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছি তাতে ঐগুলির কয়েকটি উল্লেখ করেছি।

আমার স্বাস্থ্যোন্নতি অব্যাহত আছে তবে খুবই ধীরে ধীরে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় মনে হয় যথেষ্ট নিদ্রার অভাব।

আপনার কাজের গুরুভার সত্ত্বেও আশা করি আপনার শারীরিক উন্নতি হচ্ছে। প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ,

সুভাষ।

ট্রেনে
(বিড়লা ভবন, নূতন দিল্লী)
২৪শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

আমি নিশ্চিত আশা করি এই পত্র যখন তোমার হস্তগত হইবে সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে তখন তুমি অগ্রসর হইতেছ।

ইহার সহিত আমাকে লেখা শরতের পত্রের একটি নকল এবং আমার উত্তর পাঠাইলাম। ইহাতে যদি তোমার মনোভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে একমাত্র তখনই আমার প্রস্তাবগুলি প্রযোজ্য। যাহাই হউক না কেন কেন্দ্রের অরাজকতার অবসান দরকার। তোমার অনুরোধমত আমি একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া আছি যদিও সঙ্কট সম্পর্কে আমার মতামত দিবার জন্য আমার উপর চাপ দেওয়া হইতেছে।

প্রস্তাবটি সর্বপ্রথম আমি এলাহাবাদে দেখি। ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া আমার মনে হয়। প্রাথমিক প্রয়াস তোমাকেই করিতে হইবে। জাতীয় কাজের দায় বহন করিতে কতখানি তুমি সমর্থ হইয়াছ আমার জানা নাই। যদি না হও, আমার মনে হয় যে—একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পন্থা তোমার নিকট খোলা আছে তাহাই গ্রহণ করা উচিত হইবে।

আমাকে এখনও আরও কয়েকদিন দিল্লীতে থাকিতে হইবে।

ভালোবাসা জানিও।

বাপু।

জিয়ালগোরা হইতে রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসুর টেলিগ্রাম

আপনার পত্র প্রতীক্ষিত। আমার বিবৃতি মত আমাদের সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়। —সুভাষ

সুভাষ বসুর নিকট গান্ধীজীর টেলিগ্রাম

রাজকোট ব্যাপার আমাকে দিল্লীতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে অন্যথা দুর্বলতা সত্ত্বেও তোমার নিকট ছুটিয়া যাইতাম। তোমাকে বলিতেছি এখানে আসিয়া আমার সহিত থাক। তোমাকে সেবা করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিবার ভার লইতেছি, তাহারই ফাঁকে ধীরগতিতে আমাদের আলোচনা চলিবে। ভালোবাসাসহ।

—বাপু।

জিয়ালগোরা

২৯শে মার্চ, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

দু-একদিনের মধ্যে আমি আপনাকে আবার লিখব; ইতিমধ্যে একটি জরুরী ব্যাপার দেখা দিয়েছে। এ.আই.সি.সি'র কর্মরত সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরসিং লিখে জানিয়েছেন যে, এ.আই.সি.সি'র মিটিং-এর জন্য তিনি ২০ দিনের নোটিশ চান।

নিয়ম অনুযায়ী এ.আই.সি.সি'র সদস্যদের ১৫ দিনের নোটিশ দিতেই হবে। তার পরেও, তাঁর মতে, আরও ৪।৫ দিন দরকার যাতে দেশের দূরতম প্রান্তে নোটিশ পৌঁছতে পারে। ফলতঃ আমাদের মোট ২০ দিনের সময় চাই।

আমার মনে হয় ২০শে এপ্রিল নাগাদ একটি তারিখ সুবিধাজনক হবে, অবশ্য আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু তাতে একটু মুশকিল আছে। আমি জানতে পারলাম ২০শে এপ্রিল নাগাদ বিহারে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সম্মেলন বসবে। তাতে দুটি মিটিং একই সময়ে পড়ে যাচ্ছে। এ.আই.সি.সি'র, সেই সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও কলকাতায় হবে। সেই সময় সেখানে আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আমি কি প্রস্তাব করতে পারি, গান্ধী সেবা সঙ্ঘের

সম্মেলনের আগে বা পরে এ.আই.সি.সি'র বৈঠক বসুক। আগে হলে আপনি প্রথমে কলকাতায় এসে পরে বিহার যাত্রা করতে পারেন। পরে হলে আপনি প্রথমে বিহারে গিয়ে পরে কলকাতায় আসতে পারেন। প্রথম ক্ষেত্রে সঙ্ঘের সম্মেলন এক সপ্তাহের জন্য পিছিযে দিতে হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ.আই.সি.সি'র বৈঠক এপ্রিলের শেষের দিকে ধার্য করতে হবে।

বিষয়টি বিবেচনা করে এ.আই.সি.সি'র বৈঠক কখন বসানো উচিত হবে সেই বিষয়ে দয়া করে আমাকে উপদেশ দেবেন। শেষ কথা, এ.আই.সি.সি বৈঠকের সময় আপনাকে আমরা একান্তভাবে চাই।

আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আপনার ব্লাডপ্রেসার আবার বৃদ্ধি পেয়েছে শুনে উদ্বেগে আছি। আমার আশঙ্কা হয়, আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছেন।

প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ

সুভাষ

(দ্বিতীয় পত্র)

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

আমি আপনার ২৪ তারিখে ট্রেন থেকে লেখা চিঠি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পেয়েছি।

প্রথমতঃ, আমার দাদা শরৎ নিজে থেকেই আপনাকে লিখেছিলেন। আপনি তাঁর চিঠি থেকে দেখতে পাবেন, তিনি এখান থেকে কলকাতায় পৌঁছেই আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছেন এবং তারপরে আপনাকে লিখেছেন। যদি তিনি আপনার টেলিগ্রাম না পেতেন তিনি লিখতেন কিনা সন্দেহ।

তাঁর চিঠিতে অবশ্য কিছু কথা আছে যা আমারও মনের কথা। কিন্তু সেকথা অন্য। আমার কাছে আসল সমস্যা এই যে, উভয় পক্ষ অতীতের কথা ভুলে গিয়ে একত্রে কাজ করতে পারবে কিনা, তা সম্পূর্ণভাবে আপনার উপর নির্ভর করে। যথার্থ অপক্ষপাত মনোভাবের দ্বারা আপনি যদি উভয়পক্ষের আস্থাভাজন হতে পারেন, তাহলে আপনি কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে তুলতে এবং জাতীয় একতা ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

প্রতিহিংসাপরায়ণতা আমার ধাতে নেই এবং আমি অভিযোগ পুষে রাখি না। কতকটা বলা যায় আমার মানসিকতা বক্সিং খেলোয়াড়ের মত—অর্থাৎ বক্সিং খেলা শেষে হাসিমুখে করমর্দন করা এবং খেলার মনোভাব নিয়ে খেলার ফল মেনে নেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, আমি অনেক আবেদন পাচ্ছি, তা সত্ত্বেও পন্থ প্রস্তাব যে রূপে কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে আমি তাই স্বীকার করে নিচ্ছি। একেই আমাদের কার্যকর করতে হবে। বিধিবহির্ভূত অংশটি থাকা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি যাতে উত্থাপিত ও আলোচিত হয় তার জন্য আমি নিজেই অনুমতি দিই। আমার পক্ষে এখন তা কিভাবে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ?

তৃতীয়তঃ, আপনার সম্মুখে এখন দুটি উপায় খোলা আছে (১) নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আমাদের অভিমতকে গ্রহণ করা, অথবা (২) সম্পূর্ণভাবে আপনার অভিমতে চালিত হওয়া। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, আমাদের পক্ষে একসঙ্গে চলা সম্ভব নাও হতে পারে।

চতুর্থতঃ, আমার সাধ্যমত যতদূর তাড়াতাড়ি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন এবং ওয়ার্কিং কমিটি ও এ.আই.সি.সি'কে তলব করা সম্ভব আমি তা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এখন আমার পক্ষে দিল্লী যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত (ডাক্তার সুনীল[১] আজ সকালে আপনাকে এই বিষয়ে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন)। মাত্র গতকাল আমি আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি।

[১] ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু

পঞ্চমতঃ, আপনার চিঠিতে জেনে অবাক হলাম যে, এ.আই.সি.সি আপিস আপনাকে পন্থ প্রস্তাবের একটি নকল পাঠায়নি। (পরে পাঠানো হয়েছে।) আপনি এলাহাবাদে আসার আগে পর্যন্ত প্রস্তাবটি আপনার নজরে আনা হয়নি জেনে আমি আরও বেশি অবাক হয়েছি। অথচ ত্রিপুরিতে দারুণ গুজব রটেছিল যে প্রস্তাবটিতে আপনার পূর্ণ সমর্থন আছে। আমরা যখন ত্রিপুরিতে ছিলাম সেই সময়ে ঐ মর্মে একটি বিবৃতি দৈনিক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

ষষ্ঠতঃ, আমার আসন দখল করে থাকার বিন্দুমাত্র অভিলাষ নেই। কিন্তু আমি অসুস্থ বলে আমার পদত্যাগ করা দরকার, এই যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না। যেমন, কোন প্রেসিডেন্টই জেলে থাকাকালে পদত্যাগ করেন নি। আপনাকে জানাতে চাই যে, পদত্যাগ করবার জন্য আমার উপর দারুণ চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমি তা প্রতিরোধ করছি যেহেতু আমার পদত্যাগে কংগ্রেস রাজনীতিতে এক নূতন পর্বের সূচনা হবে এবং আমি শেষ পর্যন্ত তা পরিহার করতে চাই।

গত কয়েকদিন আমি এ.আই.সি.সি'র জরুরী কাজকর্ম দেখছি।

আগামীকাল কিংবা পরশু আবার আপনাকে লিখব। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আশা করি আপনার ব্লাডপ্রেসার শীঘ্র কমে আসবে। প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

পুনশ্চ—এই চিঠি আপনার চিঠির ঠিক উত্তর নয়। আমার মনে যেসব কথা জেগেছিল আমি তাই শুধু টুকে রেখেছি। আপনাকে তা জানাতে চাই বলে লিখে পাঠালাম।

নূতন দিল্লী
৩০শে মার্চ, ১৯৩৯

স্নেহের সুভাষ,

তোমার নিকট হইতে আমার টেলিগ্রামের উত্তর পাইবার আশায় তোমার ২৬ তারিখের পত্রের জবাব দিতে বিলম্ব হইল। গত রাত্রে আমি সুনীলের তারবার্তা পাইয়াছি। আমি প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পূর্বে উঠিয়া এই জবাব লিখিতে বসিয়াছি।

যেহেতু তুমি মনে কর, পন্থের প্রস্তাব নিয়মসম্মত হয় নাই এবং ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কিত অংশটি স্পষ্টতঃ নিয়মতন্ত্রবিরুদ্ধ ও বিধি-বহির্ভূত, তোমার কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কমিটি গঠনে তোমার মনোনয়ন অবাধ হওয়া উচিত। অতএব এই প্রসঙ্গে তোমার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

গত ফেব্রুয়ারিতে আমাদের মধ্যে সাক্ষাতের পর হইতে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে যে, যেখানে মূল বিষয় লইয়া মত-পার্থক্য, মতপার্থক্য যে ছিল সে-বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত ছিলাম, সেখানে একটি মিশ্র কমিটি অনিষ্টকর হইবে। অতএব তোমার নীতি এ.আই.সি.সি'র সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন করে ধরিয়া লইয়া তোমার এমন একটি ওয়ার্কিং কমিটি হওয়া দরকার যাহাতে একমাত্র তাহারাই থাকিবে যাহারা তোমার নীতিতে বিশ্বাস করে।

হাঁ, ফেব্রুয়ারিতে সেবাগ্রামে আমাদের সাক্ষাতের সময় আমি যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম তাহা আমি বিশ্বাস করি। নিজেকে স্বেচ্ছায় মুছিয়া ফেলা পৃথক, তাহা না করিয়া নিজেকে তুমি কোনভাবে দমন করিলে তাহা সমর্থন করিয়া আমি দোষের ভাগী হইব না। যাহাতে দেশের সর্বাধিক মঙ্গল হইবে বলিয়া তোমার ধারণা তাহার কোন-প্রকার অপহ্নব নিজেকে দমন করার সামিল। অতএব তোমাকে যদি প্রেসিডেন্টের কাজ করিতে হয় তাহা হইলে তোমার হাত বাঁধা থাকিলে চলিবে না। দেশে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে তাহাতে মধ্য-পন্থার কোন স্থান নাই।

গান্ধীবাদীদের (অ্যাখ্যাটি যদিও ঠিক নয়) সম্পর্কে বলা যায়, তাহারা তোমাকে বাধা দিবে না। তাহারা যেখানে পারিবে তোমাকে সাহায্য করিবে, যেখানে পারিবে না সেখানে বিরত থাকিবে। তাহারা যদি সংখ্যালঘু হয়, তাহাতে কোনই অসুবিধা হইবে না। তাহারা যদি সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারা নিজেদের দমন করিতে নাও পারে।

আমাকে যাহা চিন্তিত করে তাহা এই যে কংগ্রেস নির্বাচকমণ্ডলীই ভুয়া, অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংখ্যালঘিষ্ঠতার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বিলুপ্ত। এতৎসত্ত্বেও, যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের ভিতরকার জঞ্জাল সাফ করা না যাইতেছে, আপাততঃ আমাদের সহায়সম্বল যাহা আছে তাহাতেই কাজ চালাইতে হইবে। অপর যে বিষয়ে আমি ভাবিত তাহা আমাদের নিজেদের মধ্যে নিদারুণ অবিশ্বাস। যেখানে কর্মীরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করে সেখানে সম্মিলিত কাজ অসম্ভব।

আমার মনে হয় তোমার পত্রে উত্তর দিবার মত আর কোন বিষয় ছিল না। তুমি যাহাই কর, ভগবান তোমাকে চালিত করুন। ডাক্তারদের নির্দেশ মানিয়া শীঘ্র সুস্থ হইযা উঠ। ভালোবাসা জানিও। —বাপু।

পুনশ্চ: আমার দিক হইতে যদি বল, আমাদের পত্রালাপ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি যদি অন্যপ্রকার মনে কর, তোমাকে ইহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিলাম।

নূতন দিল্লী, ৩১শে মার্চ, ১৯৩৯

তোমার পত্র। প্রথম পত্রের জবাব গতকাল পাঠাইয়াছি। অল ইণ্ডিয়া মিটিং অবশ্যই অগ্রগণ্য। কার্যপদ্ধতি নিয়ম ২ বলে জরুরী মিটিংএ সাত দিনের নোটিশ আবশ্যক তাহা সংবাদপত্র মারফত দেওয়া যাইতে পারে। ভালোবাসা।

—বাপু।

জিয়ালগোরা, ৩১শে মার্চ, ১৯৩৯

আপনার অদ্যকার টেলিগ্রাম। আমার স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিশের পর কোন দিন ভালো হয়। অল ইণ্ডিয়ার পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ধার্য। অল ইণ্ডিয়ার পূর্বে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ সম্মেলন মিটিংয়ে আপত্তি নাই। ব্যক্তিগতভাবে তাহাই আমার সুবিধা। সব-সত্ত্বেও তারিখ বিষয়ে আপনার ইচ্ছাই মানিয়া লইব। প্রণাম।

—সুভাষ

নূতন দিল্লী, ১লা এপ্রিল, ১৯৩৯

তোমার টেলিগ্রাম। তোমার সুবিধামত তারিখ স্থির কর। তোমার তারিখ অনুযায়ী আমি ব্যবস্থা করিয়া লইব। ভালোবাসা

—বাপু।

জিয়ালগোরা

৩১শে মার্চ, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

সুনীল আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে দীর্ঘ টেলিগ্রাম করেছিলেন তার জবাবে আপনি তাঁকে যে টেলিগ্রাম করেছেন তা আমি দেখলাম। আমাকে দিল্লী যাবার প্রস্তাব করে আপনি টেলিগ্রাম করাতে আমি ভাবলাম এ বিষয়ে ডাক্তারদের বক্তব্য তাঁদের নিজেদের বলতে দিলেই ভালো হবে। সেইজন্য সুনীল আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

২৪ তারিখে (ট্রেন থেকে) আমাকে লেখা আপনার চিঠিতে এবং ঐ তারিখে দাদা শরৎকে লেখা চিঠিতে যে সব প্রসঙ্গ আছে সে সম্পর্কে এবং সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করছি। এই রকম সঙ্কটের সময়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, বাস্তবিক এ আমার দুর্ভাগ্য।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ এমন দ্রুতগতিতে চলেছে যে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার সুযোগই আমি পাচ্ছি না। এ ছাড়া ত্রিপুরিতে এবং পরেও আমার প্রতি কোন কোন প্রভাবশালী মহলের (আমি পরিষ্কারভাবে বলে রাখতে চাই—এতে আপনি মোটেই পড়েন না) ব্যবহারে যে বিবেচনাটুকু আমার প্রাপ্য ছিল তা আমি পাইনি। কিন্তু আমার অসুস্থতার দরুন আমাকে পদত্যাগ করতে হবে, এ কোনো যুক্তি হতে পারে না। গতকাল আপনাকে লেখা চিঠিতে (আপনাকে লেখা আমার দ্বিতীয় চিঠি) আমি এই কথাই বলেছি, আমার জ্ঞানতঃ কোন প্রেসিডেন্ট দীর্ঘকাল জেলে থাকা কালেও পদত্যাগ করেননি। হতে পারে, শেষ পর্যন্ত আমাকে পদত্যাগ করতে হতে পারে—তবে যদি তা করতে হয় তা হবে ভিন্ন কারণে।

আমার মনে হয় আমি আমার দ্বিতীয় চিঠিতে বলেছি যে, যদিও পদত্যাগ করবার জন্য আমার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, আমি তা প্রতিরোধ করে চলেছি। আমার পদত্যাগের অর্থ হবে কংগ্রেস রাজনীতিতে এক নূতন পবের সূচনা, তা আমি শেষ পর্যন্ত পরিহার করতে চাই। যদি আমাদের একসঙ্গে চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলে মর্মান্তিক এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং তার পরিণাম যাই হোক—কংগ্রেস আগামী কিছুকালের জন্য দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তার সুযোগ নেবে ব্রিটিশ সরকার। এই দুর্বিপাক থেকে দেশ ও কংগ্রেসকে রক্ষা করা আপনার হাতের মধ্যে। নানা কারণে যারা সর্দার প্যাটেল ও তাঁর দলের দারুণ বিরোধী তাদের এখনও আপনার উপর আস্থা আছে এবং তারা বিশ্বাস করে আপনিই নিরপেক্ষভাবে ও আবেগে চালিত না হয়ে সব কিছু দেখতে পারেন। তাদের কাছে আপনি জাতির প্রতীক —সব দল ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে—অতএব একমাত্র আপনিই কলহরত সবার মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

যদি কোন কারণে, ভগবান না করুন, সেই আস্থা লোপ পায় এবং আপনাকে একজন দলীয় লোক বলে গণ্য করে, তাহলে ভগবান কংগ্রেস এবং আমাদের সহায় হোন !

আজ কংগ্রেসের দুটি প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ফাটলকে এখনও জোড়া দেওয়া যায়—এবং আপনিই পারেন। আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মনোভাব সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারব না—তাঁদের সম্পর্কে ত্রিপুরিতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা খুবই খারাপ। তবে আমাদের কথা আমি বলতে পারি। আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ নই এবং বিক্ষোভ পুষে রাখি না। আমরা সব বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলতে, ভুলে যেতে প্রস্তুত এবং সবার যা আদর্শ, ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি, সেই আদর্শের জন্য আবার আমরা হাতে হাত মেলাতে চাই। আমি যখন 'আমাদের' কথা বলছি সাংগঠনিক সি. এস. পি'কে তা থেকে বাদ দিচ্ছি। ত্রিপুরিতে সর্বপ্রথম আমরা আবিষ্কার করি সাংগঠনিক সি. এস. পি'র অনুগামীসংখ্যা কত কম। সি. এস. পি দলে এখন ভাঙন ধরেছে এবং কয়েকটি প্রাদেশিক শাখা সাংগঠনিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তার কারণ নেতাদের তথাকথিত দ্বিধাগ্রস্ত নীতি। উপরকার নেতৃত্ব যাই করুক না কেন সি. এস. পি'র একটা বিরাট অংশ ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে থাকবে। এ বিষয়ে যদি আপনার সন্দেহ থাকে, কিছুকাল অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন।

আমার দাদা শরৎ আপনাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছেন। আমার অনুমান, এর প্রধান কারণ ত্রিপুরি রওনা হবার সময় তাঁর মনোভাব এরকম ছিল না। স্বভাবতঃ ত্রিপুরিতে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমার থেকে তিনি বেশি জানেন—যেহেতু তিনি যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াতে, লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে ও খবরাখবর নিতে পারতেন। আমি শয্যাশায়ী থাকা সত্ত্বেও রাজনীতির দিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় দায়িত্বশীল চক্রের মনোভাব সম্পর্কে কয়েকটি স্বতন্ত্র সূত্রে যতটুকু সংবাদ আমি পেয়েছি সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে আমাকে বীতশ্রদ্ধ করার পক্ষে তা যথেষ্ট। আমি এও বলতে পারি যে, যখন আমি ত্রিপুরি ছেড়ে আসি তখন কংগ্রেস

রাজনীতিতে এত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা বোধ করি যে গত উনিশ বছরে কখনো তেমন বোধ করিনি। ভগবানের আশীর্বাদে আমার সেই মনোভাব এখন কেটে গেছে এবং আমি আমার মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেয়েছি।

জওহরলাল তাঁর কোন একটি চিঠিতে (এবং সম্ভবতঃ সংবাদপত্রের বিবৃতিতে) মন্তব্য করেছেন যে, আমি প্রেসিডেন্ট থাকা কালে এ আই সি.সি আপিসের অবনতি ঘটেছে। অন্যায় ও অন্যায্য বলে আমি ওই মন্তব্যে আপত্তি জানাচ্ছি। সম্ভবতঃ তিনি বুঝতে পারেননি, আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় তিনি কৃপালনিজীকে এবং আপিসের সমস্ত কর্মীদের অপদস্থ করেছেন। সেক্রেটারি এবং তাঁর সহকর্মীদের উপর আপিসের ভার দেওয়া আছে, যদি আপিসের অবনতি ঘটে, তারজন্য তাঁরাই দায়ী। এই বিষয়ে জওহরকে আমি বিশদভাবে লিখছি।[১] আপনাকে আমার এই কথা বলার কারণ আপনি দাদা শরৎকে লেখা আপনার চিঠিতে অন্তর্বর্তী কার্য পরিচালন সম্পর্কে কিছু বলেছেন। একমাত্র যে উপায়ে আমরা আপিসের কাজে সাহায্য করতে পারি, তা এই, এক্ষুণি একজন স্থায়ী সেক্রেটারি নিয়োগ করা, ওয়ার্কিং কমিটির বাকি সদস্যদের নিয়োগে যদি দেরি থাকে তবুও তা করতে হবে। কিন্তু যদি ওয়ার্কিং কমিটি তাড়াতাড়ি গঠন করা হয়, আগেভাগে জেনারেল সেক্রেটারি নিয়োগ আমরা নাও করতে পারি।

পন্থ প্রস্তাবে আপনার প্রতিক্রিয়ার কথা যদি আমাকে জানান আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার অবস্থার সুবিধা এই যে, আপনি সব কিছু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন—অবশ্য ত্রিপুরিতে সব ঘটনা আপনার জানা থাকলে। খবরের কাগজ দেখে বিচার করলে, এ যাবৎ যাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই একই মতাবলম্বী—অর্থাৎ যাঁরা পন্থ প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আপনার সঙ্গে যাঁরা দেখা করছেন তাঁদের

১। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে এই চিঠি লেখা হয় ২৮শে মার্চ, ১৯৩৯। সম্ভবত এটি নেতাজীর দীর্ঘতম চিঠি। চিঠিখানি এর পরেই উদ্ধৃত করা হল।

বাদ দিয়েও আপনি সহজেই সবকিছুর সমুচিত মূল্য ধার্য করতে পারেন।

পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে আমার নিজের মতামত কী, আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। তবে আমার ব্যক্তিগত মনোভাব ততটা ধর্তব্য নয়। লৌকিক জীবনে জনস্বার্থে আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাবকে প্রায়ই নিবৃত্ত করতে হয়। আমি আগের এক চিঠিতেও একথা বলেছি যে, বিশুদ্ধ গঠনতান্ত্রিক দিক থেকে পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে যে যাই ভাবুক না কেন, একবার যখন তা কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে, আমি তা মেনে নিতে বাধ্য। এখন আমার জিজ্ঞাস্য আপনি কি প্রস্তাবটিকে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বলে গণ্য করেন এবং এই কারণে, আপনি কি মনে করেন, আমার পদত্যাগ করা উচিত ? এই বিষয়ে আপনার অভিমত আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করবে।

আপনি হয়তো অবগত আছেন ত্রিপুরিতে যাঁরা পন্থ প্রস্তাবের পক্ষে দল ভারি করবার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন তাঁরা রটিয়েছিলেন যে রাজকোটের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছে এবং প্রস্তাবটিতে আপনার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। ঐ মর্মে একটি বিবরণ দৈনিক সংবাদ-পত্রেও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ঘরোয়া আলোচনাতেও বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি যেমন আছে তার থেকে সামান্যও নড়চড় হলে আপনি বা আপনার গোঁড়া অনুগামীরা খুশি হবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এইসব রটনা বিশ্বাস করিনি এবং করি না, কিন্তু ভোট সংগ্রহের দিক থেকে নিঃসন্দেহে তার মূল্য ছিল। পন্থ প্রস্তাবটি যখন সর্দার প্যাটেল আমাকে প্রথমবারে দেখান, আমি তখন তাঁকে প্রস্তাব করি (সেই সময় রাজেনবাবু ও মৌলানা আজাদও উপস্থিত ছিলেন) যে, কিছু অদলবদল যদি করা হয় তাহলে সংশোধিতরূপে প্রস্তাবটির সর্বসম্মতি-ক্রমে কংগ্রেসে পাস হয়ে যাবে। প্রস্তাবটি সংশোধিত রূপ সর্দার প্যাটেলের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। মনে হয় তাঁদের মনোভাব ছিল—একটি শব্দ, একটি কমা-সেমিকোলনেরও হেরফের হলে চলবে না। আমার ধারণা

রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রস্তাবটির সংশোধিত রূপ আপনাকে দিয়েছেন। পন্থ প্রস্তাবের যদি লক্ষ্য হয়, আপনার নীতিতে আপনার নেতৃত্বে ও পরিচালনায় নূতন করে আস্থা প্রকাশ করা, সংশোধিত প্রস্তাবে তার ব্যবস্থা ছিল--কিন্তু যদি তার লক্ষ্য হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিশোধ নেওয়া, তাহলে অবশ্য সংশোধিত প্রস্তাব দিয়ে তা হত না। পন্থের প্রস্তাব আপনার মর্যাদা প্রভাব ও প্রতিপত্তি কিভাবে বৃদ্ধি করেছে ব্যক্তিগতভাবে আমি তা বুঝি না। সাবজেক্টস্ কমিটিতে আপনার বিপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি ভোট পড়েছিল এবং উন্মুক্ত অধিবেশনে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা যাই বলুক না কেন, বিভিন্ন স্বতন্ত্র সূত্রে পাওয়া সংবাদ এই যে, প্রায় ১২০০ ভোটের মধ্যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও কমপক্ষে ৮০০ ভোট হয়তো বেশীও হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে পড়েছিল। এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সাবজেক্টস্ কমিটিতে যেরকম ভোট দিয়েছিল এখানেও যদি সেইরকম ভোট দিত, তাহলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হত। যাই হোক না কেন ভোটের ফলাফল হত অনিশ্চিত। প্রস্তাবটি সামান্য পরিবতন করলে বিরুদ্ধে একটিও ভোট পড়ত না এবং আপনার নেতৃত্ব সমস্ত কংগ্রেস সদস্যের একবাক্যে সমর্থন লাভ করত। ব্রিটিশ সরকারের কাছে এবং সারা দুনিয়ার কাছে আপনার মর্যাদা নিমেষে শতগুণ বেড়ে যেত। তার পরিবর্তে, যারা আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তারা আপনার সুনাম ও মর্যাদা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করল। এর ফলে, আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা দূরের কথা তারা তা এমন অতলে নামিয়ে এনেছে যে তা কল্পনা করা যায় না। কারণ আজ সারা দুনিয়া জানল যে, যদিও ত্রিপুরিতে আপনি ও আপনার অনুগামীরা কোনক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, এক শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে। ঘটনাপ্রবাহকে যদি এইভাবে চলতে দেওয়া হয়, পরিমাণে ও শক্তিতে বিরোধিতা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে। যে পার্টিতে বৈপ্লবিক, প্রগতিশীল যুবশক্তি নেই, সেই পার্টির ভবিষ্যৎ কী? গ্রেট বৃটেনের লিবারেল পার্টির মত তার ভবিষ্যৎ।

পন্থ প্রস্তাবে আমার কী প্রতিক্রিয়া তা আপনাকে জানাতে গিয়ে অনেক কথাই বললাম। আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমাকে জানান। আপনি কি পন্থের প্রস্তাব অনুমোদন করেন, না আমরা যেমন বলেছিলাম সেই-ভাবে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হলেই আপনি বেশি খুশি হতেন।

আর একটি বিষয় আছে যা আমি এই চিঠিতে উল্লেখ করব—তা আমাদের কাযক্রমের প্রশ্ন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় আমি আমার মতামত আপনাকে জানিয়েছি। তারপর যা ঘটেছে তাতে আমার ধারণাই সমর্থিত হয়েছে এবং আমার ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে। বেশ কয়েকমাস ধরে আমি বন্ধুবান্ধবদের বলে আসছি যে, ইউরোপে শীতের শেষে এক সংকট দেখা দেবে এবং তা গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত চলবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সেইসঙ্গে স্বদেশে আমাদের যা অবস্থা তাতে ৮ মাস আগে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মে যে আমাদের সেই সময় এসেছে যখন আমরা পূর্ণ স্বরাজ দাবি করতে পারি। আমাদের এবং দেশের দুর্ভাগ্য, আপনি আমাদের এই আশাবাদ সমর্থন করেন না।

কংগ্রেসের ভিতরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এই ধারণা আপনাকে পেয়ে বসেছে। এ ছাড়া হিংসার মিথ্যা ভয়ে আপনি আতঙ্কিত। কংগ্রেসের ভিতর থেকে সমূলে দুর্নীতি দূর করবার জন্য আপনার যে সংকল্প যদিও তাতে আমি আপনার সঙ্গে একমত, আমার মনে হয় না ভারতকে সমগ্রভাবে দেখলে আগের চাইতে দুর্নীতি এখন বেশি, এবং হিংসার কথা যদি বলেন আমার নিশ্চিত মনে হয় তা আগের তুলনায় অনেক কম। আগে বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশকে সংগঠিত বৈপ্লবিক হিংসার ঘাঁটি বলে গণ্য করা যেতে পারত। এখন সেই সব জায়গায় অহিংসভাব অনেক বেশি প্রবল। বাংলাদেশ সম্পর্কে তো আমি সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি, এই প্রদেশ এখন যতখানি অহিংস, গত ৩০ বৎসরে কখনও তেমন হয় নি। এই সব এবং আরও

অন্যান্য কারণে, ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে আমাদের আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। চরমপত্রের ব্যাপারটা আপনার বা পণ্ডিত জওহরলালের মনোমত নয়। কিন্তু আপনার সমগ্র কর্মজীবনে আপনি কর্তৃপক্ষের কাছে কতবারই না চরমপত্র দিয়েছেন এবং এই উপায়ে জনস্বার্থকেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই কদিন আগে রাজকোটেও আপনি একই কাজ করেছেন। তাহলে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে কী আপত্তি থাকতে পারে? যদি আপনি তাই করেন এবং একই সঙ্গে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন, আমি দৃঢ় নিশ্চয়, আমরা অতি শীঘ্র পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করতে সমর্থ হব। ব্রিটিশ সরকার হয় বিনা যুদ্ধে আমাদের দাবিতে সাড়া দেবে, নয়তো, যদি সংগ্রাম একান্তই হয়, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমি এই বিষয়ে এত আশাবাদী এবং আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার মনে হয় যদি আমরা সাহসে ভর করে অগ্রসর হই, খুব বেশি হলেও ১৮ মাসের মধ্যেই আমরা স্বরাজ লাভ করব।

এই বিষয়ে আমার বিশ্বাস এত প্রবল যে এই কারণে আমি যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত। আপনি যদি সংগ্রামের দায়িত্ব নেন আমি সানন্দে আমার সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব। যদি আপনি মনে করেন অপর কোন প্রেসিডেন্টকে নিলে কংগ্রেস আরও ভালোভাবে সংগ্রাম করতে পারবে, সানন্দে আমি সরে দাঁড়াব। আপনি যদি মনে করেন আপনার পছন্দমত ওয়ার্কিং কমিটি হলে কংগ্রেস আরও সার্থকভাবে সংগ্রাম চালাতে পারবে, সানন্দে আমি আপনার ইচ্ছাকে মেনে নেব। আমি শুধু এইমাত্র চাই, আপনি এবং কংগ্রেস এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে স্বরাজের জন্য আবার সংগ্রাম শুরু করুন। যদি নিজেকে মুছে ফেললে জাতীয় লক্ষ্য ত্বরান্বিত হয়, আমি পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মুছে ফেলতে প্রস্তুত। আমি মনে করি, এইটুকু করতে পারার মত যথেষ্ট ভালবাসা আমার দেশের প্রতি আছে।

আপনি সম্প্রতি যে ভাবে দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তা আমার মনোমত হয়নি—একথা বলার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন। রাজকোটের জন্য আপনি আপনার মহামূল্য জীবন বিপন্ন করেছেন এবং রাজকোটের জনগণের জন্য লড়াই চালাবার সময় অন্যান্য রাজ্যের সংগ্রাম আপনি বন্ধ রাখলেন। কী কারণে আপনি তা করলেন? ভারতে ছয়শোর বেশি রাজ্য আছে এবং রাজকোট তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি রাজ্য। রাজকোট লড়াইকে মশার কামড় বললেও অতুক্তি হয না। কেন আমরা দেশব্যাপী সর্বত্র একই সঙ্গে লড়াই করব না এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করব না? দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই চিন্তাই করছে, যদিও আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় তারা স্পষ্টভাবে তা বলতে দ্বিধা বোধ করছে।

পরিশেষে আমি বলতে পারি আমার মত অনেকেই রাজকোট মীমাংসার শর্তে উৎসাহিত বোধ করেনি। একে আমরা বিরাট জয় বলে অভিহিত করেছি—এবং জাতীয়তাবাদী কাগজগুলিও আমাদের সায় দিয়েছে,—কিন্তু আমরা কতটুকু লাভবান হয়েছি? স্যার মরিস্ গয়ার আমাদেরও লোক নন, স্বাধীন প্রতিনিধিও নন। তিনি সরকারী ব্যক্তি। তাঁকে সালিস করায় কী যুক্তি থাকতে পারে? আমরা আশা করছি তিনি আমাদের সপক্ষে রায় দেবেন। কিন্তু যদি তিনি আমাদের বিপক্ষে রায় দেন, আমাদের অবস্থা তখন কী হবে?

এ ছাড়াও যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বরবাদ করবার সঙ্কল্প আমরা নিয়েছি, স্যার মরিস গয়ার তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কোন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোন হাই কোর্টের জজ বা দায়রা জজকে সালিস মানি তাহলে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বদাই আমরা মীমাংসায় পৌছতে পারব। কিন্তু সে রকম মীমাংসায় আমরা কতটুকু লাভবান হব? তাছাড়া অনেকেই বুঝতে পারছে না, বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও আপনি কী কারণে দিল্লীতে অপেক্ষা করছেন। সম্ভবতঃ, আপনার দুর্বল স্বাস্থ্যের দরুন আবার দীর্ঘ ট্রেনযাত্রা করবার আগে আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন

আছে কিন্তু বৃটিশ সরকার এবং তার সমর্থকদের এতে মনে হতে পারে আপনি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারপতিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং তার ফলে তাঁর মর্যাদাও বৃদ্ধি করছেন।

আমার চিঠি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে, অতএব এবার থামা দরকার। যদি আমি এমন কিছু বলে থাকি যা আপনার কাছে ভ্রান্ত মনে হয়, আশা করি আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। আমি জানি আপনি চান লোকে মনের কথা স্পষ্টভাবে খুলে বলুক। তাই আমাকে অকপটে এই দীর্ঘ চিঠি লেখবার সাহস জুগিয়েছে।

ধীরে ধীরে হলেও ক্রমশঃ আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আশা করি যখন এই চিঠি আপনার কাছে পৌছবে আপনার শরীর তখন আরো সুস্থ এবং আপনার ব্লাড প্রেসার আরও কম থাকবে।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

জওহরলালের প্রতি

পোঃ জিয়ালগোরা
জেলা মানভূম, বিহার
১৮শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

কিছুদিন থেকে দেখছি আমার উপর তুমি ভয়ঙ্কর বিরূপ হয়ে উঠেছ। আমার এ কথা বলার কারণ আমি দেখছি আমার বিরুদ্ধে বলবার কোন সুযোগ পেলে সাগ্রহে তুমি তা গ্রহণ কর ; এবং আমার অনুকূলে কিছু বলবার থাকলে তা তুমি ভ্রূক্ষেপই কর না। রাজনীতিক্ষেত্রে যারা আমার প্রতিপক্ষ তারা আমার নামে যা কিছু বলে তুমি তাতে সায় দাও, অথচ তাদের বিপক্ষে যা বলা যেতে পারে সে বিষয়ে তুমি প্রায়ই চোখ বুজে থাকো। পরে যা বলছি তাতে এইটেই নানা ঘটনা থেকে দেখাতে চেষ্টা করব।

আমার উপর তোমার এই প্রচণ্ড বিরূপতা কেন, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমার দিকে, ১৯৩৭ সালে অন্তরীণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি কর্মক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের সঙ্গে তোমার সঙ্গে আচরণ করে এসেছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার বড় ভাই ও নেতা হিসাবে তোমাকে দেখে এসেছি এবং প্রায়ই তোমার উপদেশ চেয়েছি। গত বছর ইওরোপ থেকে তোমার ফিরে আসার পর আমি এলাহাবাদে গিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন পথে তুমি আমাদের চলতে বল। এইভাবে যখনই তোমার কাছে গিয়েছি, সচরাচর তুমি যে জবাব দিয়েছ, তা অস্পষ্ট, হাঁ-ও নয়, না-ও নয়। যেমন, গত বছর ইওরোপ থেকে তোমার ফিরে আসার পর, আমাকে তুমি এই বলে হাটিয়ে দিলে যে, গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করার পর আমাকে তুমি যা জানাবার জানাবে। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের

পর ওয়ার্ধায় আমাদের যখন দেখা হয় তুমি আমাকে সুস্পষ্ট কিছু জানাওনি। পরে যখন ওয়ার্কিং কমিটিতে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ কর, তাতে নতুন কিছুই ছিল না, অন্তত দেশকে চালিত করার মত কিছুই ছিল না।

গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে অপ্রীতিকর যে বাকবিতণ্ডা চলে তাতে অনেক কিছুই বলা হয়েছিল—কিছু আমার সপক্ষে, কিছু আমার বিপক্ষে। তোমার সব কটি উক্তি ও বিবৃতিতে যা কিছু বলা হয়েছে সবই আমার বিরুদ্ধে। খবরে প্রকাশ দিল্লীতে এক বক্তৃতায় তুমি বলেছ, আমার বা আমার জন্যে ভোটভিক্ষার ব্যাপারটা তোমার খারাপ লেগেছে। জানি না তুমি কী মনে করে এ কথা বলেছিলে, কিন্তু তুমি চমৎকারভাবে ভুলে গিয়েছিলে যে খবরের কাগজে ডক্টর পট্টভির নির্বাচনী আবেদন বার হবার পর আমারটা বেরিয়েছিল। ভোটভিক্ষার কথা যদি বল, ডক্টর পট্টভির পক্ষে ভোট যোগাড় করতে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে কি রকম কাজে লাগানো হয়েছিল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তুমি তা মনে রাখনি। অপরপক্ষের পুরোদস্তুর একটি সংগঠন ছিল (যেমন, গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি এবং সম্ভবতঃ চরকা সঙ্ঘ এবং এ,আই,ভি,আই,এ)[১]। এর উপরে, আমার বিরুদ্ধে নামানো হয়েছিল বড় বড় মহারথীদের, তাঁদের মধ্যে তুমিও ছিলে। পুরোপুরি তাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সুনাম ও মর্যাদাকে ব্যবহার করতে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির অধিকাংশ ছিল তাঁদের হাতে। এ সবের তুলনায় আমার কী ছিল? আমি ছিলাম একা। তুমি জানো কিনা জানি না তবে আমি নিজে জানি, অনেক জায়গায় ডক্টর পট্টভির জন্যে ভোট চাওয়া হয়নি, চাওয়া হয়েছিল গান্ধীজী ও গান্ধীবাদীদের জন্যে, যদিও এই রকম প্রচারের কারসাজি অনেক লোককেই ভোলাতে পারেনি। তবু প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কারণে তুমি আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছ।

এরপরে পদত্যাগ প্রসঙ্গে আসছি। বারোজন সদস্য পদত্যাগ

[১] অল্ ইণ্ডিয়া ভিলেজ্ ইন্ডাষ্ট্রিস্ এসোসিয়েশন

করেন। তাঁদের চিঠিখানি ছিল সরল অকপট—ভদ্র চিঠি, তাতে তাঁরা তাঁদের অবস্থা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কারভাবে জানান। আমার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে, আমার সম্পর্কে একটিও অপ্রিয় কথা তাঁরা বলেন নি, যদিও, যদি তাঁরা চাইতেন আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তোমার বিবৃতি ? কি করে তার বর্ণনা দেব ? কঠিন ভাষা আমি প্রয়োগ করতে চাই না, এইটুকু শুধু বলতে চাই, তা তোমার পক্ষে অশোভন হয়েছে। (আমি শুনেছি, তুমি তোমার বিবৃতির সারাংশ সাধারণ পদত্যাগ পত্রের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তাতে কেউ রাজী হয়নি।) তারপর, তোমার বিবৃতি থেকে মনে হয় তুমি পদত্যাগ করেছ যেমন আর বারোজন করেছেন—অথচ এখনও পর্যন্ত তোমার অবস্থা জনসাধারণের কাছে রহস্যে ঢাকা। সঙ্কটের সময়ে প্রায়ই তুমি পথ ঠিক করে উঠতে পার না, ফলে জনসাধারণ মনে করে তুমি দুনৌকায় পা দিয়ে রয়েছ।

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের তোমার বিবৃতির কথা আবার বলছি। তোমার ধারণা তুমি অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং তোমার কথায় ও কাজে খুব সঙ্গতি আছে। কিন্তু নানা উপলক্ষ্যে তোমার আচরণ দেখে অন্য লোকেরা বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে তুমি বলেছ, তুমি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং তার কারণ হিসেবে আলমোড়া থেকে ২৬শে জানুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে যা বলেছিলে তার উল্লেখ কর। স্পষ্টতঃ তুমি আগেকার যুক্তি থেকে সরে আস ! এ ছাড়াও বোম্বাইয়ের কিছু বন্ধু আমাকে জানান, তুমি তাঁদের আগেই বলেছিলে যে আমি যদি দাঁড়াই তাতে তোমার আপত্তি নেই, তবে আমাকে বামপন্থীদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে।

তোমার আলমোড়া বিবৃতির উপসংহারে তুমি বলেছ, ব্যক্তির কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে, মনে রাখতে হবে একমাত্র মূলনীতি ও আদর্শের কথা। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই যে তুমি আমাদের ব্যক্তির কথা ভুলতে বল, একথা তোমার কখনই খেয়াল

থাকে না। সুভাষ বসু যখন আরেকবার নির্বাচনে দাঁড়ায় তখনই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার হতশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং তুমি নীতি ও আদর্শের স্তুতিতে মেতে ওঠ। মৌলানা আজাদ যখন আবার নির্বাচনে দাঁড়ান, তাঁর জন্যে তখন দীর্ঘ প্রশস্তি লিখতে তোমার বাধে না। যখন সুভাষ বসুর সঙ্গে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যদের বিরোধ বাধে, তখন সুভাষ বসুকেই প্রথমে তার ব্যক্তিগত দিকগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। শরৎ বসু যখন ত্রিপুরির কোন কোন ব্যাপার সম্পর্কে অভিযোগ করেন (যথা, মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া ভক্ত বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন তাঁদের মনোভাব ও আচরণ সম্পর্কে)—তোমার মতে তিনি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নিজেকে নামিয়ে আনছেন। তখন তাঁর উচিত ছিল মূলনীতি ও কার্যক্রমে নিজেকে আবদ্ধ রাখা। আমি স্বীকার করছি, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোমার যুক্তির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বার করতে অক্ষম।

আমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রশ্নটা যখন তোমার চোখে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে, এবার তাহলে সেই দিকটাই দেখা যাক। তুমি অভিযোগ করেছ, আমার বিবৃতিগুলিতে আমি আমার সহকর্মীদের উপর অবিচার করেছি। স্পষ্টতঃই তাঁদের মধ্যে তুমি ছিলে না এবং যদি আমি কোন অভিযোগ করে থাকি তা অন্যদের বিরুদ্ধে। কাজে কাজেই তুমি তোমার হয়ে বলনি, অপরের হয়ে ওকালতি করেছ। সাধারণতঃ মক্কেলের থেকে উকিল কথা কয় বেশি।। তুমি জেনে অবাক হবে যে, ত্রিপুরিতে এই নিয়ে যখন সর্দার প্যাটেলের (রাজেনবাবু ও মৌলানার) সঙ্গে কথা বলি, তিনি আমাকে যা জানান তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান যে অভিযোগ তা নাকি গত জানুয়ারি মাসে বর্দৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক বসেছিল তারও আগেকার। আমি যখন তাঁকে জানাই যে, সাধারণের ধারণা আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের মূলে আছে আমার "নির্বাচনী বিবৃতিগুলি", তিনি বলেন সেগুলি অতিরিক্ত অভিযোগের কারণ। অতএব দেখা যাচ্ছে,

"অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে" তোমার মক্কেলরা ততখানি গুরুত্ব দেননি যতখানি তাঁদের উকিল হয়ে তুমি দিয়েছ। ত্রিপুরিতে যেহেতু সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই এ.আই.সি.সি মিটিং-এ যোগদান করতে চলে যান এবং কথা দেওয়া সত্ত্বেও মিটিং-এর শেষে ফিরে আসেন না, বর্দৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এর আগে কোন্ ঘটনার কথা তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন তা ঠিকমত জানবার জন্যে আমি আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিনি। কিন্তু আমার দাদা শরতের সঙ্গে এ বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের কথা হয়েছিল। সর্দার প্যাটেল তখন তাঁকে বলেছিলেন, ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে এ.আই.সি.সির যে বৈঠক থেকে সোশ্যালিস্টরা সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে যায় সেখানে তিনি আমার যে মনোভাব দেখেন, তাঁর আসল অভিযোগের কারণ তাই। আমার দাদা এবং আমি দুজনেই এই কথা শুনে অবাক হয়ে যাই, তা সত্ত্বেও এই থেকেই কিন্তু জানা গিয়েছিল, "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারটা"কে তুমি যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যদের মনে তার কোনই গুরুত্ব ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ত্রিপুরিতে থাকাকালে কয়েকজন ডেলিগেট (তোমাকে জানিয়ে রাখছি, তাঁরা আমার সমর্থক নন) আমাকে বলেন, "অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারটা" অনেকে ভুলেই গিয়েছিল, তুমি নানা বিবৃতি দিয়ে, বারেবারে বলে বলে সেই বিতর্ককে আবার খুঁচিয়ে তুলেছ। এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে এ কথাও বলতে পারি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন প্রাক্তন সদস্য একযোগে আমাকে সাধারণের চোখে যতটা না নামিয়ে এনেছেন, তুমি একা তার চেয়ে অনেক বেশি নামিয়েছ। যদি আমি এতটা পাষণ্ড হয়ে থাকি, জনসাধারণের কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশ করা তোমার শুধু অধিকারই নয়, কর্তব্যও। কিন্তু হয়তো তোমার একথা মনে হতে পারে তোমার মত, মহাত্মা গান্ধীর মত বিরাট বিরাট নেতাদের এবং সাতটা বা আটটা প্রাদেশিক সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও যে শয়তানটা প্রেসিডেন্ট পদে আবার নির্বাচিত হয়, নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু একটু

ভালো আছে। প্রেসিডেণ্ট থাকাকালীন এক বছরে নিশ্চয় সে দেশের কিছু সেবা করেছে যার জন্যে তার পিছনে কোন সংগঠনের জোর না থাকা সত্ত্বেও, অসম্ভব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, সে এতগুলি ভোট লাভ করতে পেরেছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ, "কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে আমি বলেছিলাম এইটেই প্রথম ও সবচেয়ে জরুরী বিবেচ্য বিষয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে সম্পর্কে কিছুই করা হয়নি।" এই কথাগুলি লেখার সময় তোমার কি একবারের জন্যেও মনে হয়নি যে এই ভুল বোঝাবুঝিকে ঠিক করতে হলে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার এবং সেই দেখা করার সুযোগ আমি পাব ২২শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ? এ কথা সত্যি যে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি "অপবাদ সংক্রান্ত ব্যাপার" নিয়ে আলোচনা করিনি, যদিও তিনি একবার এ কথা তুলেছিলেন। তখন আমি তোমারই অনুশাসন মেনে চলছিলাম—অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের থেকে মূলনীতি ও কার্যক্রমের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও, জেনে রাখ, মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে যখন আমি শুনলাম যে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা একই কমিটিতে থেকে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না, আমি তাঁকে বলি, ২২শে তারিখে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে এই সব বিষয় নিয়ে কথা কইব এবং চেষ্টা করব যাতে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। হয়তো তুমিও মানবে, অপবাদ যদি কিছু হয়ে থাকে তা মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে হয়নি। হয়েছিল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে এবং তাঁদের সঙ্গেই ব্যাপারটি আলোচনা করা দরকার ছিল।

ওই বিবৃতেই আমি বামপন্থা দক্ষিণপন্থা শব্দগুলি বলতে ঠিক কী বুঝি আমার কাছ থেকে তা লিখিতভাবে জানতে চেয়েছ। তুমি এই ধরনের প্রশ্ন করবে আমি ভাবতেই পারিনি। হরিপুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তুমি নিজে এবং আচার্য কৃপালনী যে রিপোর্ট পেশ করেছিলে, তার কথা কি ভুলে গেছ? সেই রিপোর্টে তুমি বলনি,

দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের চেপে রাখার চেষ্টা করে চলেছে ? বাম দক্ষিণ কথাগুলি প্রয়োজনমত তোমার ব্যবহারে যদি বাধা না থাকে— অপরেও কি তা ব্যবহারে সমান অধিকারী নয় ?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার কী নীতি আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইনি, এ অভিযোগও তুমি করেছ। আমি মনে করি আমার একটা নীতি আছে, সে-নীতি ভুল হোক বা ঠিক হোক। ত্রিপুরিতে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করি। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ভারতের ও বিদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে একটিমাত্র সমস্যা—একটিমাত্র কর্তব্য আমাদের সামনে আছে, তা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বরাজ আদায় করে নেওয়া। একই সঙ্গে আমাদের দরকার সারা দেশে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য ব্যাপক এক পরিকল্পনা। আমার মনে পড়ছে ত্রিপুরির আগে শান্তিনিকেতনে এবং পরে আনন্দভবনে আমাদের মধ্যে যখন দেখা হয় তখনই তোমাকে আমার যা ধারণা তা খুলে বলি। এইমাত্র যা লিখলাম তা অন্তত সুনির্দিষ্ট একটা নীতি। এখন তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, তোমার নীতি কী? সম্প্রতি এক চিঠিতে ত্রিপুরি কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় দাবির প্রস্তাবটি উল্লেখ করেছ। মনে হচ্ছে এটাকে তুমি দারুণ কিছু বলে মনে করছ। শূন্যগর্ভ সুন্দর কথার বিন্যাসে ঠাসা এইরকম ধোঁয়াটে প্রস্তাব আমার মনে কোন সাড়া জাগায়নি, দুঃখের সঙ্গে আমি একথা স্বীকার করছি। এতে আমাদের পথের কোন হদিস নেই। যদি আমাদের অভিপ্রায় এই হয়, স্বরাজের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে, এবং আমরা মনে করি তার উপযুক্ত সময় এসেছে, সুস্পষ্টভাবে সেই কথা বলে আমাদের কাজে নেমে পড়া উচিত। একাধিকবার তুমি আমাকে বলেছ, চরমপত্র ব্যাপারটা তোমাকে নাড়া দেয় না। অথচ গত বিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে বারেবারে চরমপত্র দিয়ে আসছেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি এত কিছু যে আদায় করতে পেরেছেন তা কেবল পর

পর এই চরমপত্র এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন বুঝে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া থেকেই সম্ভব হয়েছে। সত্যিই যদি তুমি বিশ্বাস কর আমাদের জাতীয় দাবি আদায় করার উপযুক্ত সময় এসেছে, চরমপত্র না দিয়ে আর কী ভাবে তুমি অগ্রসর হবে? এই কদিন আগে মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ব্যাপার নিয়ে চরমপত্র দিলেন। আমি চরমপত্রের কথা বলছি বলেই কি তোমার আপত্তি? তাই যদি, ঢাকা-চাপা না দিয়ে খোলাখুলিভাবে তা বললেই তো হয়?

মোদ্দা কথা, দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যা সম্পর্কে তোমার কী নীতি আমি বুঝতে অপারগ। মনে পড়ছে তোমার কোন এক বিবৃতিতে আমি পড়েছি, তোমার মতে রাজকোট ও জয়পুর আর সব রাজনৈতিক সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠবে। তোমার মত এইরকম প্রখ্যাত নেতার কাছ থেকে এমন মন্তব্য পড়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কোন সমস্যা স্বরাজের আসল সমস্যাকে কি করে চাপা দিতে পারে আমার বুদ্ধির অগম্য। এই বিরাট দেশে রাজকোট ক্ষুদ্র একটা বিন্দু মাত্র। রাজকোট থেকে জয়পুর অবশ্য আয়তনে কিছুটা বড়, তাহলেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের আসল যে লড়াই তার কাছে জয়পুর সমস্যাও মশার কামড়ের মত। এ ছাড়া, ভারতবর্ষে যে ছশোর বেশি দেশীয় রাজ্য আছে একথা আমাদের ভুললে চলবে না। আমরা যদি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের গণসংগ্রাম স্থগিত রেখে এখনকার এই রয়ে সয়ে একটু করে এগোবার নীতিতে চলতে থাকি, দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বশীল সরকার পেতে আমাদের ২৫০ বছর লাগবে। এবং তারপরে আমরা আমাদের স্বরাজের কথা ভাবব।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তোমার নীতি মনে হয় আরও অস্পষ্ট। কিছুদিন আগে তুমি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে ভারতে ইহুদীদের আশ্রয় দেবার এক প্রস্তাব যখন পেশ কর আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই। ওয়ার্কিং কমিটি (সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে) তা অগ্রাহ্য করে এবং তাতে তুমি মর্মাহত হও। বৈদেশিক নীতি বাস্তব বুদ্ধিতে

চালিত হয়, সেই নীতি নির্ধারণে জাতির নিজস্ব স্বার্থের দিকটাই প্রবল। যেমন ধর, সোভিয়েত রাশিয়া। তার আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে যতই কমিউনিজমের দাপট থাক, বৈদেশিক নীতিতে সে কখনও ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেয় না। সেই জন্যে নিজের প্রয়োজন সে যখনই বুঝেছে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনি। ফ্র্যাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি এবং চেকোস্লোভাক-সোভিয়েত চুক্তি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমনকি আজও সোভিয়েত রাশিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে হাত মেলাতে উৎসুক। এবারে তুমি বলবে কি, তোমার কী বৈদেশিক নীতি ? ভাপে ভরা আবেগ আর ভালো ভালো কথার বিন্যাস দিয়ে বৈদেশিক নীতি তৈরি হয় না। সব সময় নিষ্ফল প্রয়াসের ধ্বজা ধরে কোন লাভ নেই, তেমনই একদিকে জার্মানি ও ইটালির মত দেশগুলিকে শাপান্ত করে, অন্যদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদের গুণগান করেও কিছু লাভ হবে না।

কিছুদিন থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীকে এবং তোমাকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারতের স্বার্থে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তোমার বা মহাত্মাজীর মনে আমি কোন রেখাপাত করতে পারিনি যদিও ভারতের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ আমাকে সমর্থন করেছে এবং ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্ররা আমার নীতি সমথন করে অনেকের সই করা এক বিবৃতি আমার কাছে পাঠিয়েছে। ত্রিপুরি প্রস্তাবের বেড়িতে আমাকে বেঁধে রেখে কেন আমি তাড়াতাড়ি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করছি না বলে আজ যখন তুমি আমাকে দোষারোপ করতে ছাড়ছ না, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হঠাৎ তোমার চোখে অত্যধিক গুরুত্বের বিষয় হয়ে দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ইওরোপে আজ এমন কী ঘটল যা অপ্রত্যাশিত ? আন্তর্জাতিক রাজনীতির খবর রাখে এরকম প্রতিটি লোক কি জানত না বসন্তকালে ইওরোপে একটা সঙ্কট দেখা দেবে ? ব্রিটিশ সরকারের

কাছে চরমপত্র দেওয়া কত জরুরী তা বোঝাবার জন্যে বারেবারে আমি কি একথা বলিনি ?

এবারে তোমার বিবৃতির আরেকটা অংশ সম্পর্কে বলছি। তুমি বলেছ: "আপাততঃ ওয়ার্কিং কমিটি বলে কিছু নেই। প্রেসিডেণ্ট, তাঁর নিজের ইচ্ছামত, অবাধে প্রস্তাবগুলি রচনা করে কংগ্রেসের কাছে উপস্থাপিত করতে চান। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যেও এখনো কোন মিটিং ডাকা হয়নি।" এইরকম অর্ধসত্য—তাই বা কেন, অসত্য বলার মনোবৃত্তি তোমার কি করে হল, ভেবে অবাক হচ্ছি। ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের পদত্যাগপত্র আমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে গেল, তবু তাদের কোন দোষ তুমি দেখতে পেলে না, দেখলে আমার, যেহেতু তুমি কল্পনায় ধরে নিলে যে সম্ভবত আমি প্রস্তাবগুলি নিজের ইচ্ছামত রচনা করতে চেয়েছি। এ ছাড়া, দৈনন্দিন কাজ চালাতে কবে আমি তোমাদের বাধা দিয়েছি ? ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি মুলতুবি রাখতে বলেছিলাম, ঠিকই। তা সত্ত্বেও সর্দার প্যাটেলকে যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তাতে কি আমি বলিনি, কংগ্রেসের জন্য প্রস্তাব রচনার আসল কাজ সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের কী মত আমাকে যেন জানিয়ে দেন ? এ বিষয়ে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে সর্দারকে যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তা একবার দেখতে অনুরোধ করি। আমার টেলিগ্রাম ছিল এই :

সর্দার প্যাটেল, ওয়ার্ধা।

মহাত্মাজীকে করা আমার টেলিগ্রাম অনুগ্রহপূর্বক দেখিবেন। দুঃখের সঙ্গে বোধ করিতেছি ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতবী রাখিতে হইবে। সহকর্মীদের পরামর্শ লইয়া টেলিগ্রামে অভিমত জানাইতে অনুরোধ করি।

—সুভাষ

ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হবার সাতদিন পরে তুমি আমাকে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম কর যে, কংগ্রেসের কার্যকলাপে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যে আমি দায়ী। তোমার তো ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রবল, তবু এটুকু তোমার খেয়ালে এল না যে, ত্রিপুরি কংগ্রেসে যখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন ভালোমতই জানা ছিল আমি গুরুতর অসুস্থ এবং মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরিতে আসেন নি, অতএব আমাদের দুজনের মধ্যে অবিলম্বে সাক্ষাৎ হওয়া কঠিন। তোমার এও খেয়ালে এল না, গঠন-তন্ত্রবিরুদ্ধ ও অবৈধ উপায়ে আমার হাত থেকে ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কংগ্রেসই এই অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গঠনতন্ত্রকে এমন হেলাভরে যদি অমান্য না করত তাহলে ১৯৩৯-এর ১৩ই মার্চ আমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতাম। কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হবার মাত্র সাত দিন পরে তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন শুরু করে দিলে যদিও আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা তুমি ভালোভাবেই জানতে। আমাকে পাঠানো তোমার টেলিগ্রাম আমার কাছে পৌঁছবার আগেই খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্যের পদত্যাগ করার ফলে ত্রিপুরির আগে পুরো এক পক্ষকাল কংগ্রেসের কার্যকলাপে যখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিবাদে তুমি একটি কথাও বলেছিলে ? আমাকে কি একটুও সহানুভূতি জানিয়েছিলে ? হালে তুমি এক চিঠিতে বলেছ, তুমি যা কর বা বল তা সম্পূর্ণ নিজের থেকে, কেউ যেন মনে না করে অপরের হয়ে তুমি তা বলছ। আমাদের দুর্ভাগ্য, তোমার কখনই মনে হয় না যে অপরে তোমাকে দক্ষিণ-পন্থীদের প্রতিনিধির ভূমিকাতেই দেখে থাকে। ২৬শে মার্চ তারিখের তোমার শেষ চিঠির কথাই ধরা যাক। তুমি সেখানে বলেছ, "আজ খবরের কাগজে তোমার বিবৃতি পড়লাম। এইরকম যুক্তিতর্ক দেখিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হয় না।"

চতুর্দিক থেকে আমার উপর যখন অন্যায় ও অশোভনভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, প্রতিবাদে একটি কথাও তুমি বলছ না,

আমার জন্যে সহানুভূতির কণামাত্রও তোমার নেই। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে যখনই কিছু বলছি অমনি তার প্রতিক্রিয়ায় তুমি বলছ "এইরকম যুক্তিতর্ক দেখিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না।" আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা যুক্তিতর্ক দেখিয়ে যখন বিবৃতি দিয়েছিল তখন কি তুমি একথা বলেছিলে? খুব সম্ভব তা দেখে তুমি আনন্দে গদগদ হয়েছ।

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ, "কংগ্রেসের স্থানীয় বিবাদবিসংবাদগুলো সাধারণত বাঁধাধরা প্রণালীতে না মেটানোর একটা ঝোঁক এসেছে, সরাসরি উপর থেকে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তার ফলে বিশেষ বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর উপর নেকনজর পড়ে বেশী, বিভ্রান্তি বেড়ে চলে এবং কংগ্রেসের কাজের ক্ষতি হয়। আমার দেখে কষ্ট হয় যে, আমাদের সংগঠনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে নতুন নতুন প্রণালী প্রবর্তন করা হচ্ছে, তার একমাত্র পরিণতি হবে এই যে, স্থানীয় সংঘর্ষ দেখা দেবে এবং তা উপর-তলাতেও ছড়িয়ে পড়বে।"

সব ঘটনা ও তথ্য জানবার তুমি চেষ্টাও করলে না অথচ এই রকম একটা অভিযোগ করলে যা পড়ে আমি যেমন বেদনাবোধ করেছি তেমনই অবাকও হয়েছি। অন্তত এইটুকু তো করতে পারতে, আমি যা ঘটনা জানি আমাকে তা জানাতে তো বলতে পারতে। আমি জানি না, একথা যখন তুমি লিখেছ তোমার মনে তখন কী ছিল? আমার এক বন্ধু আন্দাজ করছেন, তুমি তখন দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কথা ভাবছিলে। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে খোলাখুলি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, দিল্লী সম্পর্কে আমি যা করেছি আমার কাছে তাই ছিল একমাত্র সঙ্গত কাজ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, উপর তলা থেকে নিয়মিত হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে কোন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট তোমাকে হারাতে পারবে না। সম্ভবত কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হিসেবে তুমি যা কিছু করেছ সবই ভুলে গেছ, অথবা নিজেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখা

বোধহয় কষ্টকর। ২২শে ফেব্রুয়ারি তুমি আমার নামে অভিযোগ করেছ, উপর থেকে আমি হস্তক্ষেপ করেছি। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আমাকে লেখা একটা চিঠিতে তুমি আমার নামে যে অভিযোগ করেছিলে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নিষ্ক্রিয়, আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না, সে কথা কি ভুলে গিয়েছিলে ? তুমি লিখেছিলে, "কার্যত দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের পরিচালন করার দায়িত্ব পালন করা থেকে তুমি স্পিকারের কাজই করছ বেশী।" সবচেয়ে আপত্তিকর তোমার এই অভিযোগ যে আমার কাজে পক্ষপাতিত্ব আছে এবং আমি কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে বেশী সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নামে খবরের কাগজে প্রকাশ্যে এইরকম গুরুতর অভিযোগ বার করার আগে কংগ্রেস সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর কাছে (ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে না হলেও) এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে দেখা তোমার কি কর্তব্য ছিল না ?

নির্বাচন সংক্রান্ত বাকবিতণ্ডাকে সমগ্রভাবে দেখলে আশা করা স্বাভাবিক যে, নির্বাচন হয়ে গেলে সব ব্যাপারটা সবাই ভুলে যাবে এবং সবার মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে, বক্সিং খেলার পরে প্রতিদ্বন্দ্বীরা হাতে হাত মিলিয়ে যেমন সব মিটিয়ে ফেলে। কিন্তু সত্য ও অহিংসা সত্ত্বেও তা হল না। নির্বাচনের ফলকে খেলোয়াড়ের মন নিয়ে নেওয়া হল না, আমার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রাখা হল এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি কাজ করতে লেগে গেল। তুমি ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের হয়ে মুগুর ঘোরাতে শুরু করলে, অবশ্য সে অধিকার তোমার নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে, আমার সপক্ষেও কিছু বলা যেতে পারে ? আমার অনুপস্থিতিতে, আমার অলক্ষ্যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যে মিলিত হয়ে স্থির করলেন ডক্টর পট্টভিকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দাঁড় করানো হবে এতে কি কিছুই অন্যায় ছিল না ? ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই ডক্টর পট্টভিকে সমর্থন করার জন্যে কংগ্রেস ডেলিগেটদের

কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতেও কি কোন অন্যায় ছিল না? নির্বাচনী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সর্দার প্যাটেল যে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও কর্তৃত্বকে পুরো কাজে লাগিয়েছিলেন তাতে অন্যায় কিছু ছিল না? আমাকে পুনর্নির্বাচিত করলে দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, সর্দার প্যাটেলের এই উক্তিতে কি অন্যায় কিছুই ছিল না? ভোট জোগাড় করার জন্যে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে কাজে লাগানোয় অন্যায় কিছুই ছিল না?

তথাকথিত "অপবাদ" সম্পর্কে আমার যা বলার খবরের কাগজে বিবৃতিতে এবং ত্রিপুরিতে সাবজেক্টস কমিটির কাছে আমার বক্তব্যে আমি আগেই বলেছি। কিন্তু তোমাকে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। লর্ড লোথিয়ান যখন ভারত পরিভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে সব কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে মেলে না—একথা কি তুমি ভুলে গেছ? এই মন্তব্যের তাৎপর্য ও গূঢ়ার্থ কী?

২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখের তোমার বিবৃতিতে তুমি অভিযোগ করেছ, ওপরতলার আবহাওয়া পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসে কলুষিত। তুমি কি শুনে রাখবে, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আগে অবধি তোমার সময়ের থেকে আমার সময়ে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে অনেক কম সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল? অন্তত তার ফলে আমাদের কখনই পদত্যাগ করার অবস্থায় আসতে হয়নি, তোমাকে যেমন, তোমারই কথানুযায়ী, একাধিকবার সে অবস্থায় আসতে হয়েছিল। আমি যতদূর বুঝতে পারছি, আসল গোলমাল শুরু হয়েছে নির্বাচন দ্বন্দ্বে আমার জয়লাভ করা থেকে। আমি যদি হেরে যেতাম তাহলে সম্ভবত জনসাধারণ "অপবাদ" ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতেই পেত না।

তুমি যা বল নিজের কথা বল, তুমি কারও প্রতিনিধিত্ব কর না, তুমি কোন দলেও নেই—নিজেকে এইভাবে জাহির করা তোমার অভ্যাস। সময়ে সময়ে এইসব কথা এমনভাবে বল যাতে মনে হয়

এইজন্যে তুমি গর্বিত ও সুখী। একই সঙ্গে কিন্তু নিজেকে তুমি সমাজতন্ত্রী, সময় সময় ঝানু সোশ্যালিস্ট বলে পরিচয় দাও। একজন সমাজতন্ত্রী কি করে তোমার মত নিজেকে স্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবতে পারে—আমার বুদ্ধির অগম্য। একটি আরেকটির বিপরীত তত্ত্ব। তোমার স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারায় কি করে সমাজতন্ত্র আসতে পারে, তাও আমার কাছে রহস্য। নির্দলীয় তকমা নিলে সব দলের কাছে জনপ্রিয় হতে পারা যায়, ঠিক, কিন্তু তার মূল্য কী ? যদি কারও কোন মতে বা নীতিতে বিশ্বাস থাকে, তার তো চেষ্টা হওয়া উচিত সেই মত ও নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা এবং করতে হলে একমাত্র পার্টি বা সংগঠন মারফতই করতে হবে। পার্টির মাধ্যমে ছাড়া কোন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা প্রসার লাভ করেছে, আমি শুনিনি। এমন কি মহাত্মা গান্ধীরও নিজের পার্টি আছে।

আরও একটি বিষয়ে তুমি প্রায়ই বলে থাক। বিষয়টা জাতীয ঐক্য। এ সম্পর্কেও আমার কিছু বলার আছে। আমি মনেপ্রাণে ঐক্য চাই, আমার বিশ্বাস দেশের সবাই তাই চায। কিন্তু তা একটি শর্তসাপেক্ষ। আমরা যে ঐক্যের প্রযাসী বা যে ঐক্য রক্ষা করতে চাই তা কর্মের ঐক্য, নিষ্কর্মের ঐক্য নয়। ভাঙন সবক্ষেত্রেই খারাপ নয়। প্রগতির স্বার্থে মাঝে মাঝে ভাঙনেরও প্রয়োজন হয়। ১৯০৩ সালে রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি যখন বলশেভিক ও মেনশেভিক দলে ভেঙে গেল, লেনিন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মেনশেভিকদের জগদ্দল সরে যাওয়াতে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এবং বুঝতে পারলেন এবারে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে বাধা নেই। ভারতবর্ষেও "মডারেটরা" যখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এল, প্রগতিশীল কেউই তাই নিয়ে আক্ষেপ করেনি। আরও পরে ১৯২০ সালে কংগ্রেসকর্মীদের একটা বড় অংশ যখন কংগ্রেস ছেড়ে আসে, যারা রইল তারা তাদের চলে যাওয়া নিয়ে আপসোস করেনি। এই ভাঙনগুলি আসলে প্রগতিরই সহায়ক। সম্প্রতি আমরা যেন অন্ধভাবে ঐক্যের দোহাই দিয়ে চলেছি। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। একে দুর্বলতার

সাফাই হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, অথবা এর দোহাই দিয়ে এমন আপস করিয়ে নেওয়া যেতে পারে যা মূলত প্রগতিবিরোধী। তোমার নিজের কথাই ধর। তুমি গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলে—কিন্তু ঐক্যের খাতিরে তা মেনে নিলে। পরে, প্রদেশে সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে তুমি ছিলে, কিন্তু যখন ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সম্ভবত একই কারণে তুমি তাও স্বীকার করে নিলে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পাকেপ্রকারে কার্যকর করতে রাজী হল, তখন যারা যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী তারা তাদের দৃঢ় অভিমত থাকা সত্ত্বেও ঐ একই ঐক্যের খাতিরে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের বিবেকের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেজে নিতে প্রলুব্ধ হতে পারে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যই লক্ষ্য নয়, তা উপায়মাত্র। যতদিন তা প্রগতির অনুকূল, ততদিনই তা কাম্য। যখনই তা প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায়, তখনই তা ক্ষতিকর। কংগ্রেস যদি অধিকাংশের মতানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গ্রহণ করাই ঠিক করে, তাহলে, বলবে কি তুমি কী করবে? তুমি কি সেই সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে, না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?

৪ঠা ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ থেকে লেখা তোমার চিঠিটা একটু অন্যরকমের, এতে দেখছি আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব তেমন কঠোর হয়ে ওঠে নি, পরে যেমন হয়েছে। যেমন সেই চিঠিতে তুমি বলেছ, "আমি যেমন বলেছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে তোমার নির্বাচনে কিছুটা ভালোও হয়েছে, কিছুটা খারাপও হয়েছে।" পরে তোমার ধারণা হয় আমার দ্বিতীয়বারের নির্বাচন একেবারে নির্ভেজাল গর্হিত ব্যাপার। এরও পরে তুমি লিখেছ, "এই ভবিষ্যৎকে আমাদের দেখতে হবে ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকে দেখলে চলবে না। আমাদের মনের মত সব কিছু হচ্ছে না বলে অধৈর্য হওয়া স্বভাবত আমাদের কারও উচিত নয়। যাই ঘটুক না কেন আদর্শের জন্যে আমাদের সব কিছু দিতে হবে।" স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত "অপবাদ" ব্যাপারটার উপরে পরে যে গুরুত্ব দিয়েছ তা দাওনি। শুধু তাই নয়; এর আগেই আমি দেখিয়েছি "অপবাদ" ব্যাপারটা নিয়ে পরে যে চাঞ্চল্য দানা বাঁধে তাও মুখ্যত তোমারই সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে হয়তো তোমার মনে আছে, শান্তি-নিকেতনে আমাদের মধ্যে যখন দেখা হয় তখন তোমাকে আমি একথা আমাদের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের বলি যে, সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, কংগ্রেসকে চালিত করার দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারি না। তখন তুমি আমার কথায সায় দিয়েছিলে। পরে, কী কারণে আমি জানি না, তুমি যেন একেবারে সশরীরে অপরপক্ষে গিয়ে ভিড়লে। তা করবার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে, তবে তোমার সমাজতন্ত্র ও বামপন্থার হাল কী হবে ?

৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠিতে তুমি একাধিকবার অভিযোগ করেছ, আমার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ফেডারেশনের মত জরুরী বিষয় নিয়ে কোন আলোচনাই হয়নি। এ এক অদ্ভুত অভিযোগ যখন তুমি নিজেই প্রায় ছয়মাস ছিলে দেশের বাইরে। তুমি কি জানো, শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের লণ্ডনে দেওয়া তথাকথিত বক্তৃতার উপর এখানে যখন ঝড় উঠেছিল, আমি তখন ওয়ার্কিং কমিটিকে বলি, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব নেওয়া আছে তার পুনরাবৃত্তি করা আমাদের উচিত, সেই সঙ্গে দেশে ফেডারেশন-বিরোধী প্রচারও চালাতে হবে এবং কমিটি তা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তুমি কি জানো পরে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী বৈঠকে ফেডারেশনের নিন্দা করে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন বলে শেষ পর্যন্ত বিবেচিত হয় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় ?

ঐ চিঠিতে তুমি আরও একটা অভিযোগ করেছ, আমি নাকি ওয়ার্কিং কমিটিতে একেবারে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকতাম এবং বস্তুত আমার কাজকর্মে স্পীকারের সঙ্গে মিল ছিল বেশী, প্রেসিডেন্ট-যে কমিটিকে চালায়—তার সঙ্গে তেমন মিল ছিল না। মন্তব্যটা একটু বেশীমাত্রায়

নির্মম হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির বেশীর ভাগ সময় সে সাধারণত তুমিই নিয়ে নিতে, একথা বললে কি ভুল বলা হবে? ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমার মত বাক্যবাগীশ আরও একজন সদস্য থাকলে, আমার মনে হয় আমরা কখনো আমাদের কাজ শেষ করে উঠতে পারতাম না। তাছাড়া তোমার হাবেভাবে মনে হত প্রেসিডেণ্টের সব কাজের দায়িত্ব তুমিই বুঝি নিয়ে নেবে। আমি অবশ্য তোমাকে সংযত করে অবস্থা আযত্তে আনতে পারতাম, কিন্তু তাহলে আমাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যেত। নির্মম সত্য বলতে গেলে, ওয়ার্কিং কমিটিতে সময় সময় তুমি বয়ে যাওয়া ছেলের মত আচরণ করতে এবং প্রায়ই মেজাজ গরম করতে। কিন্তু, তোমার এত লম্ফঝম্প, এমন দুমদাম চটে ওঠা সত্ত্বেও লাভ করেছ কী? সাধারণত তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে চলতে কিন্তু শেষকালে সব মেনে নিতে। সর্দার প্যাটেল ও আর সবাই তোমাকে কায়দা করার একটা তুখড় কৌশল জানতেন। তাঁরা তোমাকে সমানে বকে যেতে দিতেন, শেষকালে তাঁদের প্রস্তাবের খসড়াটা তাঁরা তোমাকে লিখতে বলতেন। প্রস্তাবের খসড়া লেখার সুযোগ পেলে—সে-প্রস্তাব যারই হোক না কেন, তুমি দারুণ খুশি হয়ে যেতে। কদাচিৎ আমি দেখেছি তুমি শেষ পর্যন্ত নিজের মতে স্থির থেকেছ।

আমার বিরুদ্ধে আর এক অদ্ভুত অভিযোগ, গত এক বছরের মধ্যে এ.আই.সি.সি'র আপিসের নাকি দারুণ অবনতি ঘটেছে। প্রেসিডেণ্টের কাজের দায়িত্ব বলতে তুমি কী বোঝ আমার জানা নেই। আমার মতে, প্রেসিডেণ্ট উচ্চপর্যায়ের একজন কেরানী, এমনকি উচ্চপর্যায়ের একজন সেক্রেটারির থেকে অনেক বড় কিছু। প্রেসিডেণ্ট থাকা কালে তুমি সেক্রেটারির কর্তব্য তাকে করতে না দিয়ে নিজেই করতে, তাই বলে অন্য প্রেসিডেণ্টরাও তাই-ই করবে এমন কোন কারণ নেই। এ কথা ছাড়াও, আমার প্রধান অসুবিধা ছিল, এ.আই.সি.সি'র. আপিসটা ছিল দূরে এবং জেনারেল সেক্রেটারিকে প্রেসিডেণ্টের অনুগত থাকা উচিত বলতে যা বোঝায় (আমি ইচ্ছা

করেই বিষয়টি অত্যন্ত নম্রভাবে বলছি) আমার প্রতি জেনারেল সেক্রেটারির সেই আনুগত্য ছিল না, তাহলেও খুব বেশী বলা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, কৃপালনীজীকে আমার উপর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হয়তো তোমার মনে আছে, এ. আই.সি.সি'র আপিসের একটা অংশকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম যাতে তার কাজ আমি ঠিকমত দেখাশোনা করতে পারি। তখন তোমরা সবাই মিলে আমাকে তা করতে দাও নি, অথচ আজ তোমারাই এ.আই.সি.সি'র আপিসের গলদের জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকেই দোষী করছ। তোমার অভিযোগমত সত্যিই যদি এ.আই.সি.সি'র আপিসের অবনতি ঘটে থাকে, তার জন্যে দায়ী জেনারেল সেক্রেটারি, আমি নই। একমাত্র যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনতে পার তা এই যে, আমার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে জেনারেল সেক্রেটারির কার্যকলাপে কম হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং তিনি কার্যত আগের থেকে অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করেছেন। অতএব, এ.আই.সি.সি'র আপিসের সত্যিই যদি অবনতি ঘটে থাকে, তার জন্যে জেনারেল সেক্রেটারিই দায়ী, আমি নই।

আমি অবাক হচ্ছি, তুমি আসল খবর কিছু না জেনে আমার নামে অভিযোগ করেছ বোম্বাই ট্রেড ডিসপিউট্স্ বিলটি বর্তমান আকারে আইনে পরিণত হবার সময় আমি আমার সাধ্যমত বাধা দিইনি। প্রকৃতপক্ষে দেখছি যেখানে আমি জড়িত, সেখানে, আসল ঘটনা কী তা জানবার চেষ্টা না করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার, সময় সময় প্রকাশ্যে তা করার, দক্ষতা তুমি সম্প্রতি অর্জন করেছ। এই বিষয়ে আমি কী করেছি যদি তা জানতে চাও, স্বয়ং সর্দার প্যাটেলকে জিজ্ঞাসা করলে ভালোভাবে জানতে পারবে। একমাত্র আমি যা করিনি তা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। যদি তা অপরাধ হয়ে থাকে, আমি সেই অপরাধ স্বীকার করছি। প্রসঙ্গত তুমি কি জানো বোম্বাই শাখার কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বর্তমান আকারে বিলটিকে সমর্থন জানিয়েছিল ? এবার তোমার কথায় আসছি। বিলটি

যাতে আইনে পরিণত না হয় সেইজন্যে তুমি কী করেছ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? তুমি যখন বোম্বাইয়ে ফিরে এসেছিলে, তখনও তোমার কিছু করবার মত সময় ছিল। যতদূর জানি কিছু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তোমার সঙ্গে দেখাও করেছিল এবং তাদের তুমি কিছুটা আশ্বাসও দিয়েছিলে। আমার চেয়ে তুমি ছিলে অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থায়; কারণ আমার থেকে অনেক বেশী তুমি মহাত্মা গান্ধীকে প্রভাবিত করতে পারতে। যদি তুমি নিজে থেকে চেষ্টা করতে, আমি যেখানে কিছু করতে পারিনি, তুমি সফল হতে পারতে। সে চেষ্টা কি তুমি করেছিলে?

একটি ব্যাপার সম্পর্কে প্রায়ই তুমি আমাকে খোঁচা দাও—কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব নিয়ে। মতান্ধ রাজনীতিবিদের মত তুমি পাকা-পাকি ঠিক করে ফেলেছ কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব দক্ষিণপন্থী একটা চাল। এই প্রশ্নে চূড়ান্ত রায় দেবার আগে অনুগ্রহ করে একটা কাজ করবে? দুসপ্তাহের জন্যে একবার আসাম প্রদেশ ঘুরে এসে আমাকে জানাবে কি সেখানকার বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়া-পন্থী? এলাহাবাদে বসে বসে বিজ্ঞের মত বুলি আওড়িয়ে লাভ কি? যে সব বুলির সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার কোন যোগ নেই? সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতনের পর আমি যখন আসামে যাই আমার এমন একজনও কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়নি যে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যে সম্ভব একথা জোরের সঙ্গে বলেনি। আসল কথা সারা প্রদেশ প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার দাপটে কাতরাচ্ছিল। অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছিল এবং দুর্নীতি বেড়েই চলেছিল। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন আসামবাসী মাত্রই নতুন মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল এবং আবার তাদের আত্মবিশ্বাস ও আশাভরসা ফিরে পেল। যদি সারাদেশের পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণের নীতিকে তুমি নাকচ কর, আমি তাতে স্বাগত জানাব এবং আমার সঙ্গে আসাম ও বাংলার কংগ্রেসকর্মীরাও তা জানাবে। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি যদি সাতটি প্রদেশের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়, তাহলে অন্যান্য অংশে

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতেই হবে। আসামে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কী উন্নতি হয়েছে যদি জানতে তাহলে তুমি তোমার মত একেবারে পালটিয়ে ফেলতে।

বাংলা সম্পর্কে আমার মনে হয় তুমি তেমন কিছুই জানো না। তুবছর প্রেসিডেন্ট থাকাকালে কখনই তোমার মনে হয়নি এই প্রদেশটায় একবার যাওয়া দরকার, যদিও যে ভয়াবহ নিপীড়ণের মধ্যে দিয়ে সেই প্রদেশকে যেতে হয়েছে তা ভাবলে অন্য সব প্রদেশের থেকে ঐ প্রদেশেই তোমার বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই প্রদেশে কী ঘটেছে কখনও কি তা জানতে চেয়েছ? যদি জানতে তাহলে রাজনীতির মতান্ধের মত কথা কইতে না। তাহলে আমার সঙ্গে একমত হযে স্বীকার করতে যে প্রদেশটিকে যদি বাঁচাতে হয়, হক মন্ত্রিসভা বিদায় নিতেই হবে এবং বর্তমান অবস্থায় যে সরকার সবচেয়ে ভালো, অর্থাৎ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, তাই প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কিন্তু এসব কথা বলবার সময় আমি এটুকুও বলে রাখতে চাই যে, কোয়ালিশন মন্ত্রি-সভার কথা উঠছে যেহেতু পূর্ণ স্বরাজের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছে। কাল এই সংগ্রাম শুরু কর, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সব কথা শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

এবারে ২০শে মার্চ তারিখে দিল্লী থেকে যে টেলিগ্রাম করেছ তার কথা উল্লেখ করছি। তাতে তুমি বলেছ, "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সঙ্কটাপন্ন জাতীয় সমস্যার দরুণ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের, অ্যাপিস-ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন" ইত্যাদি। ওয়ার্কিং কমিটি তাড়াতাড়ি গঠন করা যে প্রয়োজন যে-কেউ তা বোধ করতে পারে—কিন্তু তোমার টেলিগ্রামটার প্রথমেই যা নজরে পড়ে তা হচ্ছে আমি যে দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে চলেছি সে সম্পর্কে তোমার সহানুভূতির চূড়ান্ত অভাব। তুমি ভালোমতই জানতে পন্থ প্রস্তাব যদি উত্থাপন করা না হত ও গৃহীত না হত, ১৩ই মার্চই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা

করা যেত। ঐ প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, কংগ্রেস তখন ভালোমতই জানত যে আমি গুরুতর অসুস্থ, জানত, মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরিতে আসেননি, এবং এও জানত যে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া দুষ্কর। ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হল না, এদিকে একমাস কেটে গেল, এতে জনসাধারণ যে, স্বাভাবিক কারণেই চঞ্চল হয়ে উঠবে তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু এই বিক্ষোভ শুরু করা হয়েছে ত্রিপুরি কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবার ঠিক এক সপ্তাহ পর থেকে এবং এক্ষেত্রেও—"অপবাদ" ব্যাপারেব মতই—তুমিই আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করেছ। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা না করে কি সহজেই ওযার্কিং কমিটি গঠন করা যেত? মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার দেখা করা কিভাবে সম্ভবপর ছিল? তুমি কি ভুলে গিযেছিলে গত বছর হরিপুরা কংগ্রেসের প্রায ছসপ্তাহ পরে ওযার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল? খবরের কাগজে তোমার টেলিগ্রাম বার হবার পরে জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের এক অংশ আমার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ শুরু করে, তুমি কি মনে কর তা সরল ও অকপট মনে করা হয়েছে? আমার ইচ্ছানুযাযী ওয়ার্কিং কমিটির গঠন বন্ধ রেখে আমি কি জ্ঞাতসারে কংগ্রেসে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করছি? আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যদি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত না হয়ে থাকে, রোগশয্যায় যখন আমি শায়িত তখনও আমার হয়ে সর্বজনস্বীকৃত নেতারূপে তুমি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেছ কি?

আমি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এ আই সি.সি'র অবনতি ঘটেছে, তোমার এই অভিযোগের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। সেই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে চাই। তোমার কি খেয়াল ছিল না, আমাকে হেয় করতে গিয়ে জেনারেল সেক্রেটারিকে তো হেয় করেছই, সেইসঙ্গে আপিসের সব কর্মচারীকেও হেয় করেছ?

তোমার টেলিগ্রামে "সঙ্কটাপন্ন জাতীয় সমস্যার" কথা উল্লেখ করেছ এবং সেইজন্যে তুমি চাও এখনই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হোক—যদিও, তোমার কথামত, তুমি নিজে ওয়ার্কিং কমিটির অন্তর্ভুক্ত

হতে চাও না। এই "সঙ্কটাপন্ন জাতীয় সমস্যাগুলি" কী বলবে কি? আগের এক চিঠিতে তুমি বলেছ, সবচেয়ে সঙ্কটজনক সমস্যা রাজকোট ও জয়পুর পরিস্থিতি। যেহেতু এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যা করবার মহাত্মাজী নিজেই করছেন, একপক্ষে সেগুলি ওয়ার্কিং কমিটি ও এ আই.সি.সি'র এক্তিয়ারের বাইরে।

এছাড়াও তোমার টেলিগ্রামে তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছ। তোমার এ কথা বলার পর আমি খবরের কাগজে লক্ষ্য করলাম কযেকজন লোক যাদের আন্তর্জাতিক বোধ বলতে কিছু নেই, ভারতের স্বার্থের দিক থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বোঝবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় যাদের নেই, হঠাৎ তারা বোহেমিয়া ও স্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছে। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমাকে অপদস্থ করতে সুবিধামাফিক একটা হাতিয়ার পাওয়া গেছে। গত দুমাসে ইওরোপে এমন কিছু ঘটেনি যা প্রত্যাশিত ছিল না। সম্প্রতি চেকোস্লোভাকিয়ায় যা ঘটেছে তা মিউনিক চুক্তির পরিণাম মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ইওরোপ থেকে যে খবর পাচ্ছি তার ভিত্তিতে গত ছমাস ধরে আমি আমার কংগ্রেসী বন্ধুদের বলে আসছি যে, ইওরোপে বসন্তকালে একটা সঙ্কট দেখা দেবে এবং তা থাকবে গ্রীষ্ম পর্যন্ত। এইজন্যে আমাদের তরফ থেকে সক্রিয় একটা কিছু করবার জন্যে, যেমন, ব্রিটিশ সরকারের কাছে পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে চরমপত্র দেবার জন্যে চাপ দিয়ে আসছি। আমার মনে আছে (শান্তিনিকেতনে বা এলাহাবাদে) সম্প্রতি একবার তোমাকে যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বলি এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করার যুক্তি হিসেবে যখন তার উল্লেখ করি, নিস্পৃহভাবে তুমি জবাব দিয়েছিল, আন্তর্জাতিক সঙ্কট কয়েক বছর ধরে চলবে। হঠাৎ দেখছি তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছ! তবে একথা তোমাকে বলে রাখছি : তোমার দিক থেকে বা গান্ধীবাদীদের দিক থেকে আমাদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সদ্ব্যবহার করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তোমার টেলি-

গ্রামে সবসময় তুমি বল, আন্তর্জাতিক সঙ্কটের দিক থেকে এ.আই. সি.সি'র শীঘ্র বৈঠক একান্ত দরকার। কিন্তু কেন? গালভরা বড়বড় কথায় তৈরি দীর্ঘ এক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য, যার প্রকৃত কোন কার্যকারিতা নেই? অথবা তুমি কি তোমার মনোভাব এ.আই. সি.সি'কে বলবে। এবারে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের জন্যে এগিয়ে যেতে হবে এবং ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে হবে? না, তা হবে না। আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি গভীরভাবে অনুধাবন করে আমাদের স্বার্থে যাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা যায়, হয় সেই চেষ্টা করা উচিত, নয়তো, এসব ব্যাপার নিযে কোন কথা বলাই উচিত নয়। কাজ করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য না হয়, ঢাক পিটিয়ে কোন লাভ নেই।

আমি শুনলাম, তুমি যখন দিল্লীতে তখন মহাত্মাজীর কাছে এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর একবার এলাহাবাদে যাওয়া দরকার। খবরটা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে। যদি তা না হয়, তুমি কি তাঁকে একবার ধানবাদেও যেতে বলেছিলে? ডাক্তারের নিষেধ থাকার দরুণ মহাত্মাজী ধানবাদে আসতে পারছেন না, সংবাদপত্রের এই খবর প্রতিবাদ করবার জন্যে আমার সেক্রেটারি ২৪শে মার্চ যখন তোমাকে টেলিফোন করে, তখন তাঁর ধানবাদে আসা সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে কোন আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, যদিও গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির গঠন আমাকে ঘোষণা করতে হবে এবং সেজন্যে তোমার উদ্বেগের সীমা নেই। টেলিফোনেই তুমি জানিয়ে দিয়েছিলে ধানবাদে তাঁর যাওয়ার কথা নেই। মহাত্মাজীকে ধানবাদে আসতে রাজী করানো তোমার পক্ষে কি অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল? তুমি কি চেষ্টা করেছিলে? হয়তো তুমি বলবে রাজকোটের ব্যাপারের জন্যে তাঁকে দিল্লী ফিরে যেতে হত। কিন্তু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আগেই তাঁর হয়ে গেছে। এবং স্যার মরিস গয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, সে কাজ ছিল তো সর্দার প্যাটেলের, মহাত্মাজীর নয়।

রাজকোটের ব্যাপারে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। মীমাংসার যে শর্তে মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করলেন তাই নিয়ে তুমি অনেক ভেবেছ। এমন কোন ভারতবাসী নেই যে মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা হওয়ায় নিশ্চিন্ত ও খুশি হয়নি। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় মীমাংসার শর্তগুলিকে পরীক্ষা করে কী দেখা গেল ? প্রথমত, যে-মরিস গয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তাঁকে মধ্যস্থ বা সালিশ মানা হল। তার ফলে কি প্রকারান্তরে (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কাঠামোকে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি ? দ্বিতীয়ত, স্যার মরিস আমাদেরও লোক নন কিংবা স্বাধীন ব্যক্তিও নন। তিনি খাঁটি ও সরলভাবে সরকারী লোক। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন বিরোধ বাধলে আমরা যদি কোন হাইকোর্টের জজকে বা দায়রা জজকে মধ্যস্থ বা সালিস মানি ব্রিটিশ সরকার তাতে সানন্দে রাজী হবে, যেমন বিনা-বিচারে আটক রাজবন্দীদের প্রশ্নে সরকার সর্বদা বড়াই করে বলেছে যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দুজন হাইকোর্ট বা দায়রার জজের কাছে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কখনও তা সন্তোষজনক মীমাংসা বলে মেনে নিইনি। তাহলে রাজকোটের ক্ষেত্রে বাতিক্রম হল কেন ?

এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনি, তুমিই তা ভালোভাবে আমাকে বোঝাতে পারবে। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং যথাসময়ে সাক্ষাৎকারও হয়েছে। এখনও কেন তিনি সেখানে অপেক্ষা করছেন ? অপেক্ষা করার কথা সর্দার প্যাটেলের, যদি মরিস গয়ারের তাঁকে দরকার হয়। বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও মহাত্মাজী যদি দিল্লীতে রয়ে যান প্রকারান্তরে তাতে কি ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না ? ২৪শে মার্চ তারিখের চিঠিতে তুমি বলেছ, মহাত্মাজী দিল্লীতে কিছুদিনের জন্য মোক্ষমভাবে আটক আছেন এবং কিছুতেই তিনি দিল্লী ছেড়ে যেতে পারবেন না। আমি ভাবছিলাম দিল্লীতে অপেক্ষা করার চেয়ে গান্ধীজীর পক্ষে এখন আরও অনেক বেশী জরুরী কাজ ছিল। মহাত্মাজী যদি নিজে থেকে একটু চেষ্টা করতেন তাহলে যে অচলা-

বস্থার, যে পথভ্রষ্ট হবার কথা তুমি এত বলে থাক, তা নিমেষে সুরাহা হয়ে যেত। কিন্তু এ বিষয়ে তুমি নীরব এবং যা কিছু দোষ সবই আমার।

তোমার ২৩শে মার্চ তারিখের চিঠিতে তুমি লিখেছ, "পরে অপর লোকদের কিছু কানাঘুষা কথা থেকে আমি জানতে পাই যে, এ.আই.সি.সি-র একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। আমি ঠিক জানি না এই ভাবে কারা ভাবছিল এবং এই মিটিং করায় তাদের উদ্দেশ্যেই বা কী। অবশ্য পরিস্থিতিটা আরও বিশদ করে বোঝানোর জন্যে তার দরকার হতে পারে।" হাওয়ার সঙ্গে কথাটা দৌড়য়। আমার কাছে খবর আসে, কিছু এম. এল. এ (কেন্দ্রীয়) এ.আই.সি.সি-র তাড়াতাড়ি মিটিং আহ্বান করানোর জন্য এ.আই.সি.সি'র সদস্যদের দিয়ে রিকুইজিশন পত্রে সই করানোর চেষ্টা করছে, যেন আমি এ.আই.সি.সি'র মিটিং ডাকতে চাইছি না এবং কংগ্রেসে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছি। এই ধরনের কিছু কি তুমি দিল্লীতে বা অন্যত্র শোননি? যদি শুনে থাক, তুমি কি মনে কর কাজটা সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল?

একই চিঠিতে (২৩শে মার্চের) তুমি জাতীয় দাবির প্রস্তাবের এবং শরতের [দাদা] তা বিরোধিতা করার কথা বলেছ। শরতের [দাদা] মনোভাব সম্পর্কে মনে হয় তিনি নিজেই তোমাকে এ বিষয়ে লিখবেন। কিন্তু একথা বলা ঠিক নয় যে তাঁর বিরোধিতার কথা বাদ দিলে প্রস্তাবটি সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি বেশ কয়েকজনের কাছে শুনেছি, তাঁরা প্রস্তাবটির বিরোধীতা করেছেন, এ জন্যে নয় যে প্রস্তাবটিতে অন্যায় কিছু ছিল, করেছেন এইজন্য যে তাতে প্রকৃত তাৎপর্য কিছু ছিল না। এটা অনেকটা সেইরকম নির্দোষ প্রস্তাবের মত যা প্রত্যেক কংগ্রেসের শেষের দিকে উত্থাপিত, সমর্থিত এবং সর্বসম্মতভাবে অথবা বিনা-বাধায় গৃহীত হয়ে থাকে। বাস্তবিক আমি বুঝে পাই না এই রকম প্রস্তাব নিয়ে কি করে তুমি এত

মাতামাতি করতে পার। প্রকৃতপক্ষে এর থেকে কোন পথের হদিস পাওয়া যাবে ?

এই সূত্রে আমি না বলে পারছি না, সম্প্রতি কয়েকবছরের কংগ্রেস প্রস্তাবগুলিতে-প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ভারী ভারী শব্দ ও বাগাড়ম্বরই বেশি। এগুলিকে "প্রস্তাব" বলা থেকে "প্রবন্ধ" বা "নিবন্ধ" বললেই ঠিক হয়। আগে আমাদের প্রস্তাবগুলি হত সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক ও কাজের। বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে যে, আমাদের প্রস্তাবগুলির এই নব-রূপায়ণে তোমার বেশ কিছুটা হাত আছে। আমার কথা যদি বল, লম্বা লম্বা প্রবন্ধের থেকে আমি কাজের প্রস্তাব বেশী পছন্দ করি।

একাধিকবার তুমি তোমার চিঠিগুলিতে আজকের কংগ্রেসে দুঃসাহসিক প্রবণতার প্রাদুর্ভাবের কথা বলেছ। তুমি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছ ? আমার মনে হচ্ছে কিছু ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে তোমার এ কথা বলা। নতুন নতুন নারীপুরুষ কংগ্রেসে এসে প্রাধান্য পাক, এতে কি তোমার আপত্তি আছে ? তোমার কি এই অভিপ্রায় যে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কয়েকজন ব্যক্তির কুক্ষিগত থাকবে ? আমার যদি স্মৃতিভ্রংশ না হয়, উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিলে এই মর্মে একটি রুল গৃহীত হয় যে, কোন কোন কংগ্রেস সংগঠনে একই ব্যক্তি তিন বছরের বেশী কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকবে না। স্পষ্টতই এই রুলের প্রয়োগক্ষেত্র অধস্তন সংগঠনগুলি। উচ্চতর সংস্থাগুলিতে একই ব্যক্তি একই পদে যুগ যুগ কাটাতে পারে। তুমি যাই বল না কেন, একদিক থেকে আমরা সবাই তো দুঃসাহসিক, কারণ জীবনটাই একটা দুঃসাহসিক অভিযান। আমার মনে হয়েছিল, যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে মনে করেন, কংগ্রেস সংগঠনের সকল স্তরে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হোক, সাগ্রহে তাঁরা তা চাইবেন।

একথা ভাববার কারণ তোমার নেই (এ ক্ষেত্রে তোমার ২৪ তারিখের চিঠি উল্লেখ করছি) যে, শরতের [আমার দাদা] চিঠিখানি আমার হয়ে লেখা। তাঁর নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এখান থেকে

কলকাতায় ফিরে যাবার পর তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পান এবং তাতে তাঁকে লিখতে বলা হয়। গান্ধীজী যদি ঐভাবে টেলিগ্রাম না করতেন, তিনি একান্তই লিখতেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অবশ্য একথা আমাকে বলতেই হবে যে, মহাত্মাজীকে লেখা তাঁর চিঠিতে কিছু কথা আছে যা আমার মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি।

[আমার দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তোমার চিঠি থেকে আমি ধরে নিতে পারি, ত্রিপুরির পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন তা পড়ে তুমি অবাক হয়েছ। এতে আমি অবাক হচ্ছি। যদিও যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াবার অবস্থা আমার ছিল না, ওখানকার অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ সম্পর্কে স্বতন্ত্রসূত্রে আমি যথেষ্ট রিপোর্ট পেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছি না, এসব ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই না জেনে ও না শুনে ওখানে তুমি কি করে ঘুরে বেড়াতে পারলে।

দ্বিতীয়ত, তুমি মন্তব্য করেছ ত্রিপুরিতে ব্যক্তিগত প্রশ্নের দিক থেকে অন্যান্য প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ। কেবল তুমি একটা কথা বলনি, যদিও এই বিষয় নিয়ে সাবজেক্টস্ কমিটিতে বা কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তুমি উচ্চবাচ্য করনি—আর সবার চাইতে তুমিই এই সব ব্যক্তিগত প্রশ্নকে বেশি করে তুলে ধরে সাধারণের চোখে তার প্রাধান্য দিয়েছ।

[দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠিতে তুমি বলেছ, "সুভাষের অসুখকে কেউ ভুয়ো বলতে পারে, এ অসম্ভব ব্যাপার। আমার জানা নেই আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ সেরকম সন্দেহ প্রকাশ করেছিল কি না।" তোমার এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় চোখ থাকতেও তুমি একেবারে অন্ধ হয়ে ছিলে। কারণ, কে না জানে ত্রিপুরিতে এবং তার আগে থেকে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমার নামে নিয়মিতভাবে ঐ মর্মে প্রচার চালিয়েছিল। কিছুদিন থেকে আমার উপরে তুমি যে সম্পূর্ণ বিরূপ হয়েছো, এ তার আরেকটি প্রমাণ (এই

চিঠির প্রথম অংশ দেখ)। [দাদা] শরৎ ত্রিপুরির পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে যা বলেছেন আমার মনে হয় না তাতে সামান্যও অতিরঞ্জন আছে।

ত্রিপুরিতে শোনা কিছু অপ্রীতিকর রিপোর্টের কথা তুমি উল্লেখ করেছ। যে সব রিপোর্ট আমাদের বিরুদ্ধে যায় সেইগুলিকেই তুমি গুরুত্ব দাও, তোমার মত লোকের কাছ থেকে এই ব্যাপার কিছুটা অশোভন ও অস্বাভাবিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তুমি কি জানো ডেলিগেটদের টিকিট বিলি করার ব্যাপার নিয়ে একমাত্র বাংলা প্রদেশের বিরুদ্ধেই নালিশ করা হয়নি ? জানো কি অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ করা হয়েছে ? কিন্তু তুমি শুধু বাংলার কথাই উল্লেখ করেছ। তুমি একথা জানো, আসল রসিদ হারিয়ে গেছে বলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যখন নকল রসিদ দেয়, বি.পি. সি.সি এ বিষয়ে এ.আই.সি.সি'র আপিসকে সতর্ক করে দিয়ে বলে তারা যেন ডেলিগেটদের টিকিট বিলি করার সময় সাবধান হয়। তুমি কি খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছ—এই ভুলের জন্য কে দায়ী বি.পি.সি.সি আপিস না এ.আই.সি.সি'র আপিস ?

আরও বলেছ, ডেলিগেটদের আনার ব্যাপারে রাশি রাশি টাকা খরচ করা হয়েছে। তুমি কি জানো না, পুঁজিপতি ও টাকাওয়ালা লোকেদের স্থান কোন দিকে ? লাহোর থেকে লরি লরি বোঝাই ডেলিগেটদের যে নিয়ে আসা হয়েছিল এ খবর তুমি পেয়েছ ? কার নির্দেশে তাদের আনা হয়েছিল ? সম্ভবত ডক্টর কিচলু এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেন। দিন পাঁচেক আগে পাঞ্জাবের নাম করা এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে জানান, সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে তাঁদের নিয়ে আসা হয়। আমি অবশ্য এসব কিছুই জানি না। তবে তোমার অন্তত কিছুটা নিরপেক্ষতা বোধ আছে—নিশ্চয় আশা করা যেতে পারে।

ত্রিপুরিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ভূমিকা সম্পর্কে আমার দুটি কথা বলার আছে। বহু সংখ্যক এ.আই.সি.সি সদস্য আমাকে অনুরোধ

করেন, ব্যালট মারফত যেন ভোট নেওয়া হয়। কেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বলেন যে, প্রকাশ্যভাবে যদি তাঁরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তাঁরা ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। এর অর্থ কী? দ্বিতীয়ত, এই ভাবে কোন পক্ষের হয়ে মন্ত্রীদের ভোট ভিক্ষা করাটা আমার মতের বিরুদ্ধে। তাঁদের তা করবার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার আছে ঠিকই— কিন্তু তার ফল হবে এই যে প্রত্যেক প্রদেশে কংগ্রেস সংসদীয় দলে ভাঙন দেখা দেবে। মন্ত্রীদের নিজ নিজ প্রদেশের সব এম.এল.এ ও এম.এল.সি'দের সম্মিলিত সমর্থন না পেলে তাঁরা কী করে কাজ চালাতে পারবেন?

তুমি কি স্বীকার করবে না যে ত্রিপুরি কংগ্রেসে (সাবজেক্ট্স্ কমিটিতেও) সাধারণের চোখে প্রাচীনপন্থীদের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় এবং সর্বত্র মোড়লী করতে দেখা গেছে মন্ত্রীদের, [দাদা] শরৎ যখন এই মন্তব্য করেন, তিনি কি ভুল করেছিলেন?

[দাদা] শরৎকে লেখা চিঠিতে তুমি যে মন্তব্য করেছ তা, লোকে যেমন বলে, মড়ার উপর খাড়ার ঘা। তুমি বলেছ "ত্রিপুরি প্রস্তাব কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এবং গান্ধীজীর মধ্যে সহযোগিতাকে সম্ভবপর করেছে।"

উপরের চিঠিতে তুমি দাবি করেছ ত্রিপুরিতে এবং তার আগে থেকে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব আনবার জন্য তুমি অনেক চেষ্টা করেছ। অন্য লোকের ধারণা যে একেবারে আলাদা, অপ্রিয় এই সত্য কথাটা কি তুমি শুনবে? তাদের মতে, বিভিন্ন কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ত্রিপুরি কংগ্রেস যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তার দায়িত্ব থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না।

এবারে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি তোমার নীতি ও কার্যক্রম স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল—ধোঁয়াটে তত্ত্বকথা নয়, বাস্তব কাজের কথায়। আমার আরও জানতে ইচ্ছা করে তুমি কী? সোশ্যালিস্ট? বামপন্থী? মধ্যপন্থী? দক্ষিণপন্থী? না, গান্ধীবাদী? না, অন্য কিছু?

[দাদা] শরৎকে লেখা তোমার চিঠিতে দুটি চমৎকার বাক্য

আছে : "ব্যক্তিগত দিক যখন রাজনৈতিক প্রশ্নকে ছাপিয়ে ওঠে তখন আমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাই। কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে একান্তই যদি কোন বিরোধ দেখা দেয়, আমি মনেপ্রাণে আশা করব তা যেন উচ্চস্তরেই থাকে এবং নীতি ও আদর্শের গণ্ডিতে তাকে যেন আবদ্ধ রাখা হয়।" তুমি যদি নিজের কথা মেনে চলতে, আমাদের কংগ্রেসী রাজনীতি কত অন্যরকম হত।

যখন তুমি বল, ত্রিপুরিতে কিসের বাধা ছিল তুমি জান না, তোমার অকপট সারল্যকে আমি প্রশংসা না করে পারি না। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরি কংগ্রেসে একটিমাত্র প্রস্তাব, অর্থাৎ পন্থ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, এবং ঐ প্রস্তাবের সর্বাঙ্গে ছিল নীচতা ও প্রতিহিংসার মনোভাব। সত্য ও অহিংসার ভক্তরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠর কাজে বাধা দিতে চান না বলে বাধা না দেবার মনোভাব থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ত্রিপুরিতে তাঁরা বাধা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন নি। তাঁদের নিশ্চয় তা করবার অধিকার ছিল—কিন্তু তাঁরা মুখে এমন কথা বলেন কেন যা কাজে করেন না ?

অস্বাভাবিক এই দীর্ঘ চিঠি শেষ করার আগে আমি অন্যান্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

ত্রিপুরিতে বাংলাদেশের ডেলিগেটদের টিকিট দেওয়া নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল সে সম্পর্কে তুমি উল্লেখ করেছ। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম, এ.আই.সি.সি'র কোন একজন সদস্য কলকাতায় প্রকাশ্য জনসভায় বলেছেন যে তিনি উত্তর প্রদেশের কিছু ডেলিগেটদের কাছে শুনেছেন, উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কেও একইরকম গোলযোগ দেখা দিয়েছিল।

তুমি কি মনে কর না পন্থ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মাজীকে আমার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো ? আমার দিক থেকে অন্তত, যখন মহাত্মাজী ও আমার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ হয়নি, তখন তুমি কি মনে কর কাজটা সাধু হয়েছিল ? প্রাচীনপন্থীদের যদি আমার সঙ্গে

লড়াই করবার ইচ্ছা থেকে থাকে, সামনাসামনি তাঁরা তা করলেন না কেন ? এ একটা কূট কৌশল, ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে এইরকম চাল সত্য ও অহিংসার সঙ্গে খাপ খায় কিনা।

আমি আগেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সর্দার প্যাটেল যে ঘোষণা করে বললেন, আমার পুনর্নির্বাচন দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, তাঁর দিক থেকে এ কাজটা কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলে তুমি মনে কর। এই মন্তব্য তাঁর প্রত্যাহার করা উচিত বলে তুমি একটি কথাও বলনি, এবং তা না বলে প্রকারান্তরে তাঁর অভিযোগকেই সমর্থন করেছ। এবারে, মহাত্মাজীর মন্তব্য, যাতে তিনি বলেছেন যতই হোক আমি দেশের শত্রু নই, এই মন্তব্য সম্পর্কে তুমি কী ভাবো আমার জানতে ইচ্ছা হয়। এই রকম মন্তব্য কি তুমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে কর ? যদি তা না মনে কর, আমার সপক্ষে মহাত্মাজীকে কিছু কি বলেছিলে ?

আমরা যখন ত্রিপুরিতে তখন কিছু লোক দৈনিক কাগজে ছাপিয়ে দিল যে, পন্থ প্রস্তাবে মহাত্মাজীর পুরোপুরি সমর্থন আছে। লোকগুলির এই ফিকির সম্বন্ধে তুমি কী মনে কর ?

এবারে, পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ? ত্রিপুরিতে একটা গুজব শোনা গিয়েছিল, এই প্রস্তাবের অন্যতম রচয়িতা ছিলে তুমি। তা কি সত্যি ? তুমি যদিও ভোট দেবার সময় নিরপেক্ষ থাক, এই প্রস্তাবটি কি অনুমোদন কর ? তোমার দিক থেকে এর ব্যাখ্যা কী ? তোমার মতে এটি কি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ?

আমার চিঠিটা এত বড় হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত। এর ফলে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে বুঝতে পারছি। কিন্তু এত কথা বলার ছিল, আমার উপায় ছিল না।

হয়তো তোমাকে আবার লিখতে হতে পারে অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে হতে পারে। অসমর্থিত এক সংবাদে শোনা যাচ্ছে যে, আমার সভাপতিত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তুমি নাকি কিছু প্রবন্ধ লিখেছ। তোমার লেখা যখন দেখব তখনই ওই বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। সেই সঙ্গে আমাদের কাজেরও তুলনা করতে পারব—বিশেষ

করে কতখানি তুমি বামপন্থার আদর্শকে দুবছরে এগিয়ে নিয়ে গেছ এবং আমিই বা কতখানি এক বছরে নিয়ে গেছি।

যদি কোথাও আমি রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে থাকি অথবা তোমার মনে আঘোত দিই দয়া করে আমাকে মার্জনা ক'রো। তুমি নিজেই বল অকপট হওয়ার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না—তাই আমি অকপট হওয়ার চেষ্টা করেছি, হয়তো বা নির্মমভাবেই হয়েছি।

ধীরে হলেও আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত আছে। আশা করি ভাল আছ।

তোমার স্নেহাস্পদ

সুভাষ

বসু-গান্ধী পত্রালাপ

(মার্চ-মে, ১৯৩৯)

জিয়ালগোরা, ১লা এপ্রিল, ১৯৩৯। মহাত্মা গান্ধী, নূতন দিল্লী

ইতিপূর্বে বিঘোষিত গান্ধী সেবা সঙ্ঘ কনফারেন্স তারিখ এড়াইতে ২৮শে ওয়ার্কিং কমিটি এবং ৩০শে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করিব কি?

—সুভাষ

বিড়লা ভবন, নূতন দিল্লী
২রা এপ্রিল, ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৩১শে মার্চের এবং তার আগেকার পত্র পাইয়াছি। তুমি অকপটে সব কথা বলিয়াছ। তোমার মতামত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছ বলিয়া তোমার পত্রগুলি আমার ভালো লাগিয়াছে।

যে অভিমত তুমি ব্যক্ত করিয়াছ তাহা অন্য সবার এবং আমার মতের এতই বিপরীত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে যোগসাধনের কোনই সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না। আমি মনে করি একই ভাবনায় ভাবিত প্রতিটি দলের দেশের সম্মুখে অবিমিশ্রভাবে নিজ নিজ মত উপস্থাপিত করিবার সামর্থ্য থাকা উচিত। এবং ইহা যদি সততার সহিত করা হয় তাহা হইলে আমি বুঝি না কেন এমন তিক্ততা দেখা দিবে যার পরিণতি হইবে গৃহযুদ্ধে।

গলদ আমাদের মতপার্থক্যে নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাবে। সময়ে তার প্রতিকার হইবে, সময়ই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

আমাদের মধ্যে যথার্থ অহিংসা যদি থাকিয়া থাকে, গৃহযুদ্ধ কখনই হইতে পারে না। তিক্ততা তো নয়ই।

সব দিক বিবেচনার পর আমার এই অভিমত, তুমি পুরোপুরি তোমার মতাবলম্বীদের লইয়া অবিলম্বে তোমার নিজস্ব কেবিনেট গঠন কর, অতঃপর সুস্পষ্টভাবে তোমার কার্যক্রম স্থির করিয়া আসন্ন এ.আই.সি.সি'র নিকট উপস্থাপিত কর। কমিটি যদি তোমার কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সব কিছু সহজ হইয়া যাইবে এবং তুমি সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা ব্যাহত না হইয়া সেই অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। অপরপক্ষে যদি তোমার কাযক্রম গৃহীত না হয়, তখন তোমাকে পদত্যাগ করিতে হইবে, সেই অবস্থায় কমিটি নিজস্ব প্রেসিডেন্ট ঠিক করিবে। এবং তখন দেশকে তোমার স্বমতে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে তোমার কোন বাধা থাকিবে না। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের কথা বাদ দিয়াই আমি তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি।

এইবার তোমার প্রশ্নে আসা যাক। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব যখন রচিত হইয়াছিল আমি তখন শয্যাশায়ী। মথুরাদাস সেইসময় ঘটনাচক্রে রাজকোটে উপস্থিত ছিল। একদিন সকালে সে আমাকে খবর দিল যে প্রাচীনপন্থীদের উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব লওয়া হইতেছে। প্রস্তাবের বয়ান আমার নিকট ছিল না। আমি বলিয়াছিলাম, ইহা দ্বারা যতটা সম্ভব ভালোই হইবে, কারণ সেবাগ্রামে আমাকে জানানো হইয়াছিল। তোমার নির্বাচনে ততটা তোমার প্রতি আস্থা জানানো হয় নাই, যতটা জানানো হইয়াছিল প্রাচীনপন্থীদের প্রতি অনাস্থা, বিশেষ করিয়া সর্দারের প্রতি। ইহার পর, আমি যখন মৌলানা সাহেবের সহিত দেখা করিতে এলাহাবাদ যাই তখনই মূল প্রস্তাবটি আমি দেখি।

আমার মর্যাদা ধর্তব্য নয়। ইহার নিজস্ব স্বকীয় মূল্য নাই। যখন আমার উদ্দেশ্যে সন্দেহ পোষণ করা হয় অথবা আমার নীতি বা কার্যক্রমকে দেশ প্রত্যাখ্যান করে, মর্যাদাও চলিয়া যাইতে বাধ্য। ভারতবর্ষ উঠিবে বা পড়িবে তাহা নির্ভর করে তাহার বহু কোটি

জনমানবের সম্মিলিত চরিত্রের উপর। ব্যক্তি যতই উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন হোক, এই বহু কোটি জনসাধারণের যতখানি সে প্রতিনিধি ততখানি ছাড়া তাহার আর কোন মূল্য নাই। অতএব ইহা আমাদের বিবেচ্য হইতে পারে না।

এ দেশ এখন যেমন অহিংস পূর্বে কখনও তেমন হয় নাই তোমার এই মত আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যে বাতাসে আমি নিশ্বাস লইতেছি সেই বাতাসে আমি হিংসার আঘ্রাণ পাইতেছি। কিন্তু হিংসা সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়াছে। আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস হিংসারই একটা কদর্য রূপ। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ব্যবধান বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাও একই পদার্থের ইঙ্গিত করে। আমি আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

কংগ্রেসের ভিতরে দুর্নীতির পরিমাণ সম্পর্কেও মনে হয় আমাদের মতভেদ আছে। আমার ধারণা ইহা বাড়িতেছে। আমি অনেক মাস ধরিয়া সবকিছু বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কথা বলিয়া আসিতেছি।

এই পরিস্থিতির মধ্যে অহিংস গণ-আন্দোলনের পরিবেশ আমি দেখিতেছি না। কার্যকর প্রস্তুতি ছাড়া চরমপত্র কোনই কাজের নয়।

কিন্তু তোমাকে আগেই বলিয়াছি, আমি বৃদ্ধ, সম্ভবত ভীরু ও অত্যাধিক সাবধানী হইয়া উঠিতেছি এবং তোমার সামনে যৌবন ও যৌবনসুলভ বেপরোয়া আশাবাদ রহিয়াছে। আশা করি তুমিই ঠিক, আমিই ভুল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ কংগ্রেস যাহা হইয়াছে তাহাতে তাহার কাছ হইতে কিছু আশা করা যায় না, আইন অমান্য নামের যোগ্য কিছুই তার দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব তোমার বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয়, আমি তাহা হইলে অচল এবং সত্যাগ্রহের সেনাপতি হইবার পক্ষে অশক্ত।

তুমি যে ক্ষুদ্র রাজকোট ব্যাপারটি উল্লেখ করিয়াছ তাহাতে আমি খুশি হইয়াছি। ইহাতে আমাদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ

করিয়াছি তাহার কোনোটির জন্যই আমার আক্ষেপ নাই। আমার মনে হয় ইহার বিরাট জাতীয় গুরুত্ব আছে। আমি রাজকোটের জন্য অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করি নাই। কিন্তু রাজকোট আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। ইহা আমাকে পথ দেখাইয়াছে। আমি স্বাস্থ্যের জন্য দিল্লীতে নাই। প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে দিল্লীতে থাকিতে হইয়াছে। বড়লাট তাঁহার শেষ তারবার্তায় আমার নিকট যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা যথাযথ পুরণের জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা অবধি দিল্লীতে উপস্থিত থাকা আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি কোন ঝুঁকি লইতে চাই না। আমি যদি সর্বোচ্চ শক্তিকে তাহার কর্তব্য পালন করিতে আহ্বান করিয়া থাকি, সেই কর্তব্য সম্পূর্ণ পালিত হইয়াছে কিনা দেখিতে আমিও দিল্লীতে থাকিতে বাধ্য। যে দলিলের অর্থ সম্বন্ধে ঠাকোরসাহেব সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করায় আমি অন্যায় কিছু দেখি নাই। প্রসঙ্গত বলিযা রাখি, স্যার মরিস দলিলটি প্রধান বিচারপতি হিসাবে পরীক্ষা করিবেন না। তিনি তাহা পরীক্ষা করিবেন বডলাটের আস্থা-ভাজন কুশলী এক আইনজ্ঞ হিসাবে। বড়লাটের মনোনীত ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করিয়া, আমার মনে হয় আমি বুদ্ধি ও শালীনতা দুয়েরই পরিচয় দিয়াছি এবং ইহার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, আমি এ বিষয়ে বড়লাটের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি।

যদিও আমরা নিজেদের মধ্যকার তীব্র মতভেদ লইয়া আলোচনা করিলাম, আমি সুনিশ্চিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সামান্যও ক্ষুণ্ণ হইবে না। যদি তাহা আন্তরিক হয়, আমার বিশ্বাস তাহা আন্তরিকই, তবে তাহা এইসব মতভেদের ধাক্কা সহ্য করিতে পারিবে।

ভালোবাসা জানিও।

—বাপু

নূতন দিল্লী, ২রা এপ্রিল, ১৯৩৯

তোমার পত্রের সম্পূর্ণ জবাব পাঠাইলাম। তাহাতে আমার উপদেশ পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব নিরপেক্ষ এবং দুই মতাবলম্বীদের ধারণা একেবারে বিপরীত হওয়ায় তুমি সম্পূর্ণভাবে তোমার নীতিতে বিশ্বাসী লোকদের লইয়া নিজস্ব কেবিনেট গঠন কর। তোমার নীতি ও কার্যপদ্ধতি ঠিক করিয়া প্রকাশ করিবে এবং এ. আই. সি. সি'র নিকট পেশ করিবে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কর, বিনা বাধায় তোমার কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে সক্ষম হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলে, তোমার পদত্যাগ করা এবং এ. আই. সি. সি'কে নূতন প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিতে বলা উচিত হইবে। সততা ও সদিচ্ছা থাকিলে গৃহযুদ্ধের ভয় আমি করি না।

ভালোবাসা।

—বাপু

জিয়ালগোরা, ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৯

আমার পত্রের উত্তরে আপনার পত্র এবং টেলিগ্রাম। আমি তাহা বিবেচনা করিতেছি। ইতিমধ্যে মনে হয় পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে আমার বক্তব্য আপনি ও জনসাধারণের এক অংশ ভুল বুঝিয়াছেন। যদিও শেষ প্রকরণ সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্রবিরোধী, তবু তাহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলাম এবং আমি কংগ্রেসের রায় মানিতে বাধ্য। অবস্থাটি ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমি মনে করি সংবাদপত্রে ছোট একটি বিবৃতি প্রয়োজন। আপনার কোন আপত্তি আছে কিনা জানাইয়া দয়া করিয়া টেলিগ্রাম করিবেন।

প্রণাম।

—সুভাষ

নূতন দিল্লী, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৯

সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা আমাদের পত্রালাপ সম্পর্কে সর্বপ্রকার প্রশ্ন করিতেছে। আমি তাহাদের তোমার সহিত যোগাযোগ করিতে বলিয়াছি। আমার সহযোগী ও সহকর্মীদের নিকট ছাড়া কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করি নাই।

ভালোবাসা।

—বাপু

জিয়ালগোরা, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৯

ইউনাইটেড প্রেস পূর্বাভাস প্রকাশ করিতেছে বলিযা গতকাল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রামাণিক রিপোর্টের জন্য অনুরোধ করে। তাহাদের বলিয়াছি এখন কিছু প্রকাশ করা অসম্ভব, কাগজপত্র মাত্র একজনকে দেখাইয়াছি, এই সপ্তাহে আরও তিন বন্ধুকে দেখাইতে পারি। আমার মতে আমাদের উভয়ের সম্মতিতে পুরা প্রচারের ব্যবস্থা উচিত। নূতন দিল্লীর সংবাদপত্রের খবর, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ২৮শে স্থির, কিন্তু আপনার কাছ হইতে জবাব নাই।

—সুভাষ

নূতন দিল্লী

তোমার তার। এখান হইতে তারিখ জানান হয় নাই। তোমার টেলিগ্রাম স্বীকার করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মার্জনা। আজ খবর পাইলাম প্লেগের দরুণ গান্ধী সেবা সঙ্ঘ মুলতুবী। তোমার সুবিধামত যে কোন তারিখ স্থির কর। প্রকাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তোমার দায়িত্ব রহিল। ভালোবাসা।

—বাপু

জিয়ালগোরা

দিল্লী হইতে অমৃতবাজার পত্রিকা আমাদের পত্রালাপের এক রিপোর্ট আজ প্রকাশ করিয়াছে। যদিও ঠিকমত নয়, স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে ওখান হইতে খবর বাহির হইতেছে।

—সুভাষ

জিয়ালগোরা

আমার শেষ টেলিগ্রামের পর "লীডার" সমেত অন্যান্য কাগজ দেখিয়াছি। স্পষ্ট লক্ষণ আমাদের পত্রালাপের রিপোর্ট দিল্লী হইতে বাহির হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন।

—সুভাষ

নূতন দিল্লী, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৯

সংবাদপত্র সত্যগোপনের ফন্দী জানে। তাহারা উদ্ভবের স্থানের নাম তৈয়ারি করে এবং অনেক কিছু মনে মনে ঠিক করে। কী ঘটিয়াছে জানি না। তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি আমার জ্ঞানত এখানকার কেহ খবরের জন্য দায়ী নয়। তুমি আমাকে কী করিতে বল, জানাইও। ভালোবাসা।

—বাপু

জিয়ালগোরা,
৬ই এপ্রিল, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

মেজদাদাকে, আমার দাদা শরৎকে, লেখা কোন এক চিঠিতে আপনি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে মিলিতভাবে কাজ করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য উভয় পক্ষের নেতাদের মধ্যে খোলাখুলি কথা বলা দরকার। প্রস্তাবটি চমৎকার এবং অতীতে যাই ঘটুক না কেন এ বিষয়ে আমি আমার যথাসাধ্য করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অনুগ্রহ করে আমাকে কি জানাবেন এ সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু করতে বলেন কিনা, যদি বলেন, তা কী? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ঐক্যবদ্ধ করার এই প্রয়াসে আপনার প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব অনেক কিছুই করতে পারে। আমরা মেলবার সকল আশা ত্যাগ করার আগে আপনি কি আমাদের সবাইকে মেলাতে শেষবারের মত একবার চরম চেষ্টা করবেন না? সারা দেশ এখনও আপনাকে কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে আর একবার আপনাকে তা স্মরণ করতে অনুরোধ করি। আপনি কোন দলীয় নন, সেইজন্য দ্বন্দ্বরত সকলকে একত্রিত করবার জন্য জনসাধারণ এখনও আপনার উপরেই ভরসা রাখে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনি যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা করছি। আমার মনে হচ্ছে আপনার উপদেশ নৈরাশ্যের উপদেশ। এই উপদেশ একতার সব আশাকে ধূলিসাৎ করে। দ্বিখণ্ডিত হওয়া থেকে কংগ্রেসকে এ রক্ষা করবে না— অপরপক্ষে তা সেই সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একমতাবলম্বীদের নিয়ে কেবিনেট গঠনের উপদেশ দেওয়ার অর্থ দাঁড়াবে দলগুলিকে এখনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বলা। তা নিদারুণ দায়িত্বের ব্যাপার নয় কি? আপনি কি সুনিশ্চিত যে মিলিতভাবে কাজ করা অসম্ভব? আমাদের দিক থেকে আমরা কিন্তু তা ভাবি না। আমরা ভুলচুক সব মিটিয়ে ফেলে সাধারণ আদর্শের স্বার্থে হাতে হাত মেলাতে প্রস্তুত এবং সম্মানজনক একটি আপস মীমাংসার জন্য

আমরা আপনারই মুখাপেক্ষী। এর আগে আপনাকে বলেছি এবং লিখে জানিয়েছি, কংগ্রেসের গঠন এখন যেমন আছে—এবং নিকট ভবিষ্যতে তার লক্ষণীয় কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনাও নেই, তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হবে মিশ্র কেবিনেট গঠন, এমন কেবিনেট, যেখানে যতদূর সম্ভব সব দলেরই প্রতিনিধি থাকবে।

আমি জানি আপনি মিশ্র কেবিনেট গঠনের বিরোধী। আপনার বিরোধিতার কারণ কি মূলনীতিগত (যথা, আপনার মতে মিলিত-ভাবে কাজ করা অসম্ভব) অথবা যেহেতু আপনি মনে করেন, কেবিনেটে "গান্ধীবাদীদের" (যোগ্যতর কোন শব্দের অভাবে আমি এই শব্দটি ব্যবহার করছি, এইজন্য অনুগ্রহ করে আমাকে মার্জনা করবেন) আরও অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা উচিত ? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন যাতে বিষযটি পুনর্বিবেচনা করে দেখবার সুযোগ পাই। প্রথম ক্ষেত্রে, আমি এই চিঠিতে যা বলছি সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আপনি আগে যে উপদেশ দিয়েছেন অনুগ্রহ করে তার পুনর্বিবেচনা করবেন। হরিপুরায় যখন আমি কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সোশ্যালিস্টদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব করি, আপনি তখন আমাকে সুস্পষ্টভাবে জানান, আমার প্রস্তাবে আপনার সমর্থন আছে তখন থেকে পরিস্থিতির কি এতই মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে যার জন্য আপনাকে সমমতাবলম্বী কেবিনেটের জন্য জিদ করতে হচ্ছে ?

আপনি আপনার চিঠিগুলিতে দুইপক্ষ "একেবারে বিরুদ্ধভাবাপন্ন" বলে উল্লেখ করেছেন। আপনি এই বিষয়টি আরও বিশদ করে বলেননি এবং যে-বিরোধিতার আপনি উল্লেখ করেছেন, তার ভিত্তি কার্যক্রমে না ব্যক্তিগত সম্পর্কে, তাও স্পষ্ট নয়। আমার মতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। আমরা ঝগড়া বিবাদ করতে পারি এবং আমরা হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরোধ মিটিয়েও ফেলতে পারি। কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ইতিহাসে স্বরাজ্য দলের ঘটনায় এর দৃষ্টান্ত পেতে পারেন। যতদূর আমি জানি কিছুকাল বিরোধিতার পর দেশবন্ধু ও পণ্ডিত

মোতিলালজীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক যতদূর মধুর হওয়া সম্ভব তা হয়েছিল। গ্রেট ব্রিটেনে যখনই জরুরী অবস্থা দেখা দেয় প্রধান প্রধান দল তিনটি সর্বদা একই কেবিনেটে মিলিতভাবে কাজ করে। ফ্রান্সের মত ইওরোপের দেশগুলিতে কেবিনেট মাত্রই সাধারণত মিশ্র কেবিনেট। আমরা কি ফরাসী বা ইংরাজদের থেকে কম দেশপ্রেমিক ? যদি তা না হই তাহলে আমরাই বা কেন কার্যকর হতে পারে এমন মিশ্র কেবিনেট গঠন করতে পারব না ?

যদি আপনি মনে করেন আপনার বিরোধিতার মূলে কার্যক্রম ইত্যাদি যতটা আছে ব্যক্তিগত কারণ ততটা নেই, এই বিষয়ে আপনার অভিমত জানালে খুশি হব।

আমাদের কার্যক্রম কোন্‌খানে আলাদা বলে আপনি মনে করেন এবং তা কি এতই মৌলিক যে মিলিতভাবে কাজ করা অসম্ভব ? আমি জানি আমাদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু আমার মতে আমাদের মতভেদের দিকগুলি থেকে মতৈক্যের দিকগুলি অনেক বেশি, এই কথাই ওয়ার্কিং কমিটির আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের পদত্যাগ পত্রের জবাবে আমি বলেছিলাম। ত্রিপুরিতে যাই ঘটুক, আমি এখনও এইমত পোষণ করি।

আপনার কোন এক চিঠিতে, স্বরাজের প্রশ্নে আমার চরমপত্র দেবার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে অহিংস গণ-আন্দোলনের উপযোগী পরিবেশ নেই। কিন্তু রাজকোটে কি আপনি অহিংস গণ-আন্দোলনের আশ্রয় নেননি ? আরও কোন কোন দেশীয় রাজ্যেও কি আপনি তাই করবেন না ? এইসব দেশীয় রাজ্যের লোকেরা সত্যাগ্রহের প্রয়োগে তুলনায় কম দক্ষ। অন্তত তাদের তুলনায় ব্রিটিশ ভারতের আমরা বেশি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দাবি করতে পারি। যদি নাগরিক স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সরকারের জন্য সংগ্রামে দেশীয় রাজ্যের লোকদের সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিতে দেওয়া যেতে পারে, ব্রিটিশ ভারতের আমাদের তা দেওয়া যাবে না কেন ?

গান্ধীবাদীদের সমর্থনে ত্রিপুরি কংগ্রেসে যে জাতীয় দাবির

প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে তার কথাই ধরা যাক। যদিও এতে সুন্দর সুন্দর ধোঁয়াটে কথার বিন্যাস ও কিছু মামুলি সদুক্তি আছে, একদিক থেকে এর সঙ্গে আমি যে-চরমপত্রের কথা ও আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার কথা বলেছিলাম, তার অনেক মিল আছে। এখন, এই প্রস্তাব কি আপনি অনুমোদন করেন? যদি করেন, তাহলে কেনই বা আপনি আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না?

এইবার আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলব। তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের (মানে শেষের অংশটির) বক্তব্য দুটি। প্রথমত, ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনার আস্থাভাজন হতে হবে—এই আস্থা নির্বিবাদ আস্থা। দ্বিতীয়ত, আপনার ইচ্ছানুযায়ী তা গঠন করতে হবে। আপনি যদি একমতাবলম্বী কেবিনেটের উপদেশ দেন এবং সেইরূপ কেবিনেট গঠিত হয়, তাহলে হয়তো একথা বলা যেতে পারে যে তা "আপনার ইচ্ছানুযায়ী" গঠিত হয়েছে। কিন্তু তাকে আপনার আস্থাভাজন বলে কি দাবি করা যেতে পারে? এ আই.সি.সি'র মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে সদস্যদের কাছে একথা কি আমি বলতে পারব যে, আপনি সমমতাবলম্বী কেবিনেট গঠন করবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং নতুন কেবিনেট আপনার আস্থাভাজন হয়েছে? অপরপক্ষে, আপনার আস্থাভাজন নয় এইরকম কেবিনেট গঠন করবার যদি উপদেশ দেন, আপনি কি তাহলে পন্থ প্রস্তাবকে কার্যকর করছেন বলবেন এবং আপনার দিক থেকে বিচার করলেও আপনি কি ঠিক কাজ করবেন? আমি প্রশ্নটির এই দিক আপনাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। পন্থ প্রস্তাবকে আপনি যদি স্বীকৃতি দেন, নতুন ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে আপনার মনোগত ইচ্ছাই শুধু জানালে হবে না, সেইসঙ্গে এমন একটি কমিটি গঠনের জন্য আপনাকে উপদেশ দিতে হবে যা আপনার আস্থাভাজন হবে।

পন্থ প্রস্তাবের গুণাগুণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আপনি কিছু বলেননি। আপনি কি তা অনুমোদন করেন? অথবা আমরা যেভাবে

বলেছিলাম মোটের উপর সেইভাবে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোন প্রস্তাবে বিতর্কমূলক ধারাগুলি বাদ দিয়ে যদি আপনার নীতি ও নেতৃত্বের প্রতি নতুন করে বিশ্বাস ও আস্থাজ্ঞাপন করা হত, তাহলে কি তা আপনার বেশি মনোমত হত না ? তারপর, প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের অবস্থা কী দাঁড়ায় ? আমি আবার এই প্রশ্ন করছি কারণ বর্তমান গঠনতন্ত্রটি কার্যত আপনারই হাতে তৈরি এবং এ-বিষয়ে আপনার মতামতের মূল্য আমার কাছে অত্যধিক। এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন আছে যা আপনাকে বারেবারে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে। আপনি কি প্রস্তাবটিকে আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব বলে মনে করেন ? যদি তাই হয়, আমি এখনই পদত্যাগ করছি এবং তা বিনাশর্তে। সংবাদপত্রে দেওয়া বিবৃতিতে আমার এই প্রশ্ন কিছু কিছু পত্রিকা এই বলে সমালোচনা করেছে যে, প্রস্তাবটির কী তাৎপর্য আমার নিজেরই বুঝে ঠিক করা উচিত। নিজস্ব ব্যাখ্যা দেবার মত যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে, তা সত্ত্বেও এমন অনেক সময় আসে যখন নিজস্ব ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে চলা উচিত হয় না। খোলাখুলি ভাবে বলতে গেলে আমি মনে করি প্রেসেডেন্ট নির্ধারণের ফলাফল প্রমাণিত করেছে আমার পথ ন্যায্য। আমার এখন আসন দখল করে একদিনও থাকবার ইচ্ছা নেই যদি না তার দ্বারা সাধারণের স্বার্থ বলতে আমি যা বুঝি তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমার তরফে যে দ্বিধা বা বিলম্ব দেখা দিয়েছে তার কারণ সিদ্ধান্ত নেওয়া তেমন সহজ নয়। আমার সমর্থকদের মধ্যে দুই দলে দুভাবে ভাবছেন—একদলের বক্তব্য, কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া বৃথা, অতএব এখনই তা বন্ধ করে আমি যেন পদত্যাগপত্র দাখিল করি। এই দল আমার উপর অত্যধিক চাপ দিয়ে চলেছে, কিন্তু আমি তা প্রতিরোধ করছি। আমি আমার বিবেকের কাছে দ্বিধাহীন থাকতে চাই যে, আমি শেষ পর্যন্ত আমাদের দলের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। এছাড়াও, আমি জানি বর্তমান অবস্থায় আমার পদত্যাগের অর্থ কী দাঁড়াবে এবং

তার পারণাম কী হবে। এখানে আমি এ-কথাও বলতে চাই যে, প্রথম দলটি অর্থাৎ যাঁরা আপসের সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টা চালাবার জন্য আমাকে বলছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন আপনিই সব কিছু নির্দলীয় দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম এবং সেইজন্য দুই দলের মিলন ঘটাতেও পারেন।

আপনি যদি বলেন পন্থ প্রস্তাবের তাৎপর্য আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি পদত্যাগ করব—কেন আমি একথা বলেছি আমার তা আরও ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। আপনি ভালোমতই জানেন, আপনি যা বলেন, বা বিশ্বাস করেন আমার দেশবাসীর অনেকেই যেমন অন্ধভাবে তা অনুসরণ করে, আমি তা করি না। তাহলে আপনি যদি মনে করেন প্রস্তাবটি অনাস্থাজ্ঞাপক, আমি পদত্যাগ করব কেন? এর কারণ সহজ ও সরল। আজকের, ভারতে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব তিনি খোলাখুলি না বললেও যদি মনে করেন প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার ফলে আমার পদত্যাগ আপনিই আসে, তখন আসন দখল করে থাকা আমি মনে করি আমার বিবেকের বিরোধিতা করা। এই মনোভাবের মূলে হয়তো আছে আপনার প্রতি এবং এই বিষয়ে আপনার অভিমতের প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা।

কোন কোন সংবাদপত্র বলতে চাইছে, হয়তো আপনিও ভাবছেন যে পুরানো-পন্থীদের আবার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তাই যদি হয় আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি সক্রিয় রাজনীতিতে আবার ফিরে আসুন, কংগ্রেসের চার আনার সভ্য হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সরাসরি ভার নিন। আপনি ও আপনার পার্শ্বচরদের মধ্যে, এমনকি আপনি ও আপনার যাঁরা প্রিয়পাত্র তাঁদের মধ্যেও আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে—এই কথা বলার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন, কাউকে আক্রমণ করবার জন্য এ কথা বলছি না। এমন অনেক লোক আছে আপনার জন্য যারা সব কিছু করতে পারে—কিন্তু নিজেদের জন্য কিছুই পারে না। আমার এই কথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় কয়েকটি প্রদেশের কিছু কিছু গান্ধীপন্থীও প্রাচীনপন্থীদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমাকে ভোট দিয়েছিল? এই ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিত্বকে যদি

জড়ানো না হত, প্রাচীনপন্থীরা সত্ত্বেও আমাকে তাঁরা সমর্থন করে যেতেন। ত্রিপুরিতে প্রাচীনপন্থীরা কৌশল করে সরে পড়লেন এবং আরও কৌশল করে আমাকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। (কিন্তু আমার ও আপনার মধ্যে কোন বিবাদ ছিল না।) পরে তাঁরা বললেন ত্রিপুরিতে তাঁদের বিরাট জয় হয়েছে এবং আমার পরাজয় ঘটেছে। আসলে তাঁদেরও জয় হয়নি, আমারও পরাজয় ঘটেনি। জয় হয়েছিল আপনার (আপনার সঙ্গে লড়াইয়ের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও) তবে অনিশ্চিত জয়—কিছু পরিমাণে মর্যাদা খুইয়ে জয়লাভ।

কিন্তু আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আপনি যাতে এগিয়ে এসে সরাসরি ও খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের কার্যসমূহ পরিচালনা করেন, আমি আপনাকে সেই আবেদন করতে চেয়েছিলাম। তাতে সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে যে বিরোধিতা—এবং বিরোধিতা যে আছে তাতে সন্দেহ নেই—তার অনেকটাই আপনি চলে যাবে।

যদি আপনি তা না পারেন, আমার একটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। আমরা যা দাবি করে আসছি সেই অনুযায়ী অনুগ্রহ করে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম শুরু করে দিন এবং তার সূত্রপাত করুন ব্রিটিশ সরকারকে চরম পত্র দিয়ে। তা যদি করেন আমরা সকলে সানন্দে আমাদের পদাধিকার ছেড়ে চলে আসব। যদি চান আমরা ওই সব আসন আপনি যাঁকে বলবেন বা বিশ্বাস করবেন তাঁকেই ছেড়ে দেব। কিন্তু আমাদের একমাত্র শর্ত থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে হবে। আমার মত অনেকেই মনে করে যে আজ আমাদের যে সুযোগ এসেছে তা কোন জাতির জীবৎকালে দুর্লভ। এই কারণেই সংগ্রাম শুরু করতে সাহায্য করতে পারে এমন যে কোন আত্মত্যাগ করতে আমরা প্রস্তুত।

যদি শেষ পর্যন্ত আপনি বলতে থাকেন যে মিশ্র কেবিনেট অকার্যকর এবং সমমতাবলম্বী কেবিনেট ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই, এবং যদি আপনি চান আমি আমার পছন্দ মত কেবিনেট গঠন

করি, আমি তাহলে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত আপনি আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট আমাকে দিন। ইতিমধ্যে আমরা যদি আমাদের সেবা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারি, তাহলে কংগ্রেসের কাছে আমরা হব ধিককৃত এবং স্বাভাবিক ও সমুচিতভাবে আমাদের দায়িত্বের পদ থেকে বিতাড়িত হব। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের অর্থ এ.আই.সি.সি'র আস্থাজ্ঞাপক ভোট। আপনি যদি আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট আমাদের না দেন, এবং একই সঙ্গে আমাদের বলেন একমতাবলম্বী কেবিনেট গঠন করতে, আপনি তাহলে পন্থ প্রস্তাবকে কার্যকর করবেন না।

আরেকবার আমি আপনাকে জানাতে অনুরোধ করছি, মিশ্র কেবিনেট গঠনে আপনার বিরোধিতার কারণ নীতিগত, না ২৫শে মার্চ তারিখের আমার প্রথম চিঠিতে আমি কেবিনেটে প্রাচীনপন্থীদের যত সংখ্যক প্রতিনিধি রাখার কথা বলেছিলাম আপনি তার চাইতে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি রাখতে চান।

আমি এই চিঠি শেষ করবার আগে দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। আপনি একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন, আপনি আশা করেন, যাই ঘটুক "আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট থাকিবে।" আমিও মনেপ্রাণে সেই আশা পোষণ করি। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই, জীবনে যদি আমার গর্ব করবার মত কিছু থাকে তা এই যে, আমি ভদ্রলোকের সন্তান এবং সেই কারণে আমিও ভদ্রলোক। দেশবন্ধু দাশ প্রায়ই আমাদের বলতেন "জীবন রাজনীতি থেকে অনেক বড়।" এই শিক্ষা আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি একদিনের জন্যও থাকব না যদি থাকার ফলে ভদ্রতার মানদণ্ড থেকে আমার পতন ঘটে। এই ভদ্রতা বোধ শিশুকাল থেকে আমার মজ্জাগত এবং তা আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছে, আমি মনে করি। আমার জানার উপায় নেই মানুষ হিসাবে আপনি আমাকে কিভাবে দেখেন, আপনি আমাকে কতটুকুই বা দেখেছেন। তাছাড়া

আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার নামে কত না কাহিনী আপনার কানে তুলে চলেছে। কয়েক মাস হল আমি জানতে পেরেছি, কয়েক মাস থেকে আমার নামে মুখে মুখে সূক্ষ্ম অথচ দুরভিসন্ধিমূলক রটনা চলেছে। বহু আগেই আমি এই বিষয়টি আপনার নজরে আনতাম কিন্তু কে বলছে এবং কী বলা হচ্ছে তার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমি তা পারিনি। কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক কিছু আমি জানতে পেরেছি, যদিও রটনাকারী কারা সঠিকভাবে এখনও তা জেনে উঠতে পারিনি।

আবার আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি। একটি চিঠিতে আপনি আশা প্রকাশ করেছেন, আমি যাই করি না কেন, আমি "ভগবানের নির্দেশে যেন চালিত হই।" মহাত্মাজী, আপনি বিশ্বাস করুন, এই কদিন ধরে আমি কেবল একটি প্রার্থনা করে চলেছি—একটু আলোর প্রার্থনা—যে আলো আমায় দেখিয়ে দেবে আমার দেশ ও দেশের স্বাধীনতার পক্ষে কোন পথ শ্রেষ্ঠ। সেরকম প্রয়োজন ও কারণ দেখা দিলে যাতে নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারি তারজন্য শক্তি ও প্রেরণা কামনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটি জাতি বেঁচে থাকতে পারে, যতক্ষণ যে ব্যক্তিদের নিয়ে সেই জাতি গঠিত তারা যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে জাতির স্বার্থে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই নৈতিক (অথবা আত্মিক) হারাকিরি সহজ নয়। কিন্তু দেশের স্বার্থে যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে ভগবান যেন তা করবার মত শক্তি আমাকে দেন।

আশাকরি আপনার স্বাস্থ্যের যে-রকম উন্নতি হচ্ছে তা বজায় থাকবে। ধীরে ধীরে আমি সুস্থ হয়ে উঠছি।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

জিয়ালগোরা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯

আজ রাজেনবাবুর সহিত আপনার টেলিফোনে কথার সূত্র ধরিয়া আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই দিল্লী ছাড়িয়া রাজকোট রওনা হইবার পূর্বে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। ইহাতে খুব বেশি হইলেও আপনার তিন দিন দেরি হইবে। আমাদের পত্রালাপ মীমাংসার দিকে যাইতেছে না এবং আমার মনে হয় সামনাসামনি আলাপে ব্যাপারটা খুবই সহজ হইবে। সাক্ষাতের স্থান সম্পর্কে স্বাস্থ্যের কারণে আপনার এখানে আসা সম্ভব না হইলে আমি ত্রিপুরির ক্ষেত্রে যেরূপ করিযাছিলাম ডাক্তারদের অমান্য করিয়া দিল্লী আসিতে প্রস্তুত আছি। আমি মনে করি ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যা মীমাংসা করিতে এবং কংগ্রেস ঐক্য বজায় রাখিতে স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়াও আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করা আবশ্যক। পরবর্তী এ.আই.সি.সি. পর্যন্ত ব্যাপারটি অমীমাংসিত রাখিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিবে এবং অনিশ্চয়তা ও বিলম্ব সাধারণের মনে আরও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবে।

—সুভাষ।

নূতন দিল্লী, ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯

তোমার টেলিফোন বার্তা। রাজকোট-কাজের তাগিদে আজ রাতে রাজকোট যাইতেছি। অব্যবহিত কর্তব্যে অবহেলা হইবে বলিয়া স্থগিত রাখা গেল না, কিন্তু যে মুহূর্তে রাজকোট হইতে ছুটি পাইব তুমি যাহা বলিবে করিব। ইতিমধ্যে আমি বলিতেছি আমার উপদেশ মানিয়া কেবিনেট গঠন কর এবং তোমার কার্যক্রম জানাইয়া দাও। রবিবার প্রাতে রাজকোট পৌঁছাইতেছি। ভালোবাসা।

—বাপু।

তোমার তারবার্তা। আমি অসহায়। রাজকোট আমাকে যাইতেই হইবে। শরৎকে বা তোমার অন্য কোন প্রতিনিধিকে রাজকোট পাঠাইবার প্রস্তাব করি। সে বিমানে যাইতে পারে। দশদিনের আগে রাজকোট হইতে অব্যাহতি আশা করি না। ভালোবাসা।

—বাপু।

জিয়ালগোরা
১০ই এপ্রিল, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

সাধারণভাবে কংগ্রেসের ব্যাপারে এবং বিশেষ করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে অনেকগুলি টেলিগ্রাম ও ছোট ছোট চিঠি ছাড়াও আমি আজ অবধি ২৫শে মার্চ (২৬ তারিখে ডাকে দেওয়া হয়েছে), ২৯শে মার্চ, ৩১শে মার্চ ও ৬ই এপ্রিল তারিখে চারটি জরুরী চিঠি আপনাকে লিখেছি। এতদিন ধরে চিঠিপত্র চালাতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। একটি দীর্ঘ চিঠিতে সব কথা বলতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু তাতে দুটি অসুবিধা ছিল—প্রথমত, একটি দীর্ঘ বিস্তারিত চিঠি লেখার আনুষঙ্গিক পরিশ্রম, এবং দ্বিতীয়ত, আপনার চিঠিগুলিতে নতুন নতুন প্রসঙ্গ, যার উত্তর দেওয়া আমার দরকার। আশা করি এই পর্যায়ে এইটিই আমার শেষ চিঠি হবে। এটিতে আমি চেষ্টা করব এমন কিছু বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করতে যে সব বিষয়ে আমাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে, এবং সেইসঙ্গে আমার আগেকার চিঠিগুলির প্রধান প্রধান বক্তব্যের সারাংশ আরেকবার বলতে এবং আপনার কাছে আমার চূড়ান্ত আবেদন ও নিবেদন জানাতে।

(১) **প্রসঙ্গ : হিংসা ও দুর্নীতি :** যদি আপনাকে আমি ঠিকমত বুঝে থাকি, আপনি চরমপত্র দেবার এবং অবিলম্বে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার বিপক্ষে, যেহেতু আপনি মনে করেন আমাদের মধ্যে দুর্নীতি

ও হিংসার মনোভাব প্রবল। আমরা ওয়ার্কিং কমিটিতে গত কয়েকমাস ধরে দুর্নীতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে আসছি এবং আমার মনে হয় এই প্রশ্নটিতে আমরা সাধারণভাবে সবাই একমত—তবে একটু তফাত আছে, আমি মনে করি না তার মাত্রা এতখানি যে তার ফলে পূর্ণ স্বরাজের জন্য অবিলম্বে সংগ্রাম করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। অপর-পক্ষে নিয়মতান্ত্রিকতার স্রোতে যতই আমরা গা ভাসিয়ে দেব, যতই আমাদের লোকেরা সরকারী আয়েশ ও আরামের স্বাদ পাবে, তত বেশি দুর্নীতি বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। অধিকন্তু আজকের ইওরোপের রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছুটা জানি, হয়তো একথা আমি বলতে পারি এবং কোন প্রতিবাদের আশঙ্কা না করে আমি দাবি করতে পারি, নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে আমরা কোন অংশে তাদের চেয়ে হেয় নই, বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের স্থান তাদের উঁচুতে। অতএব দুর্নীতির ভূত আমার কাছে তেমন ভয়াবহ বলে মনে হয় না। বরঞ্চ দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আরও বেশি স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করার আহ্বানই হবে দুর্নীতির প্রতিবিধান এবং আমাদের দলের মধ্যে কোন দুর্নীতিকারী যদি অনুপ্রবেশ বা প্রাধান্য লাভ করে থাকে এরই মধ্যে দিয়ে জন-সাধারণের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। নজির হিসাবে বলা যেতে পারে, ইতিহাসে এমন অনেক বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদের দৃষ্টান্ত আছে যাঁরা ঘরের শত্রুকে উচ্ছেদ করবার জন্য বাইরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

প্রসঙ্গ : হিংসার মনোভাবের অস্তিত্ব : আমার আগের বিবৃতিতে যা বলেছি এখনও তাই বলছি। যাঁরা কংগ্রেসসেবী এবং কংগ্রেসের সমর্থক তাঁদের মধ্যে মোটের উপর আগের চাইতে এখন হিংসা কম। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতভেদের আমার দিক থেকে যা কিছু যুক্তি আমি এর আগেই আপনাকে বলেছি, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। হতে পারে, কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে আজ হিংসার মনোভাব রয়েছে যার ফলে দাঙ্গা হচ্ছে এবং কংগ্রেস সরকারগুলিকে

তা সবলে দমন করতে হচ্ছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং তা থেকে এই ধারণা পোষণ করা সমীচীন হবে না যে, কংগ্রেসসেবী বা তাদের সমর্থকদের মধ্যে হিংসার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য যে সকল সংগঠনের সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই—যেমন মুসলিম লীগ—তারা যতদিন পর্যন্ত মনোভাবে এবং কাজে অহিংস না হয়ে উঠছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে স্থগিত রাখতে হবে, এটা বাড়াবাড়ি নয় কি?

(২) **প্রসঙ্গ : পণ্ডিত পন্থ প্রস্তাব** : আমি জানতে চেয়েছিলাম, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি যে আকারে উত্থাপন করেছিলেন এবং যে আকারে তা শেষপর্যন্ত গৃহীত হয়েছে আপনি কি তা অনুমোদন করেন, না, আমরা যেমন বলেছিলাম, যেমন হলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হত, কমবেশি সেই আকারে প্রস্তাবটি হলে আপনি বেশি পছন্দ করতেন। আমি আরও জানতে চাই, আপনি প্রস্তাবটিকে আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট বলে গণ্য করেন কিনা। আপনার সুবিধার জন্য প্রস্তাবটির মূল রূপ এবং তার একটি সংশোধিত রূপ নিচে দিচ্ছি।

মূল রূপ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী লইয়া বাদ-প্রতিবাদের দরুন কংগ্রেসে এবং দেশের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা

(১) বিগত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মৌলিক নীতি কংগ্রেসের কার্যক্রম পরিচালিত করিয়াছে কংগ্রেস তাহার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুনিশ্চিত অভিমত পোষণ করিতেছে যে এইসব মূলনীতি হইতে সরিয়া যাওয়া কখনই উচিত

হইবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম তাহার দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কংগ্রেস গত বৎসর যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্যরত ছিল তাহার কাজে আস্থা প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হইয়া থাকিলে দুঃখিত।

(২) আগামী বৎসরে যে সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং এইরূপ সঙ্কটে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই দেশকে ও কংগ্রেসকে জয়লাভের পথে চালিত করিতে পারেন। ইহাও স্মরণে রাখিয়া কংগ্রেস আবশ্যিক বলিয়া মনে করে যে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক অঙ্গ তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হওয়া দরকার এবং প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছে, তিনি যেন গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করেন।

সংশোধিত রূপ

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী লইয়া বাদ-প্রতিবাদের দরুণ কংগ্রেসের এবং দেশের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়।

(১) বিগত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মৌলিক নীতি কংগ্রেসের কার্যক্রম পরিচালিত করিয়াছে কংগ্রেস তাহার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুনিশ্চিত অভিমত পোষণ করিতেছে যে এইসব মূলনীতি হইতে সরিয়া যাওয়া কখনই উচিত হইবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম তাহার দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কংগ্রেস গতবৎসর যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্যরত ছিল তাহার কাজে আস্থা প্রকাশ করিতেছে।

(২) আগামী বৎসরে যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেস অতীতের মত ভবিষ্যতেও

মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনা ও সহযোগিতা অপরিহার্য বলিয়া মনে করে।

(৩) **প্রসঙ্গ : কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি :** ৩১শে মার্চ তারিখের আমার চিঠিতে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সম্পর্কে যে মন্তব্য ছিল তা সেই সময়কার সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও মতামত থেকে আমার যা ধারণা হয়েছিল তারই ভিত্তিতে করেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল সি.এস.পি'র পদস্থ নেতারা তাদের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি চালিয়ে যাবে এবং তার ফলে ভবিষ্যতে তাদের নতুন এক নীতি গ্রহণ করতে হতে পারে, যথা, প্রাচীনপন্থীদের সমর্থন করার নীতি। আমি মনে করেছিলাম, আপনি হয়তো ভুল বুঝে ভাবতে পারেন, সম্পূর্ণ সি.এস.পি দলত্যাগ করে প্রচীনপন্থীদের আওতায় চলে যাবে। এইজন্যই আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম, উপরকার নেতৃত্ব যাই করুক তৎসত্ত্বেও সি. এস. পি'র একটি বিরাট অংশ আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমি একথা বলতে পেরেছিলাম তার কারণ ত্রিপুরিতে নেতাদের নিরপেক্ষ নীতির কী ফল তাদের অনুগামীদের উপর ফলেছিল আমি তা শুনেছিলাম। কয়েকটি প্রদেশ বিদ্রোহ করেছিল—সাধারণ কর্মীরাও তাতে ছিল—তাদের মধ্যে অনেককেই নৈতিক চাপে পড়ে অথবা নিয়মশৃঙ্খলাবোধে নেতাদের ফতোয়া মেনে নিতে হয়েছিল। আপনাকে চিঠি লেখার পরে আমার কাছে যে খবর এসে পৌঁছিয়েছে তাতে সি.এস.পি'র পদস্থ নেতাদের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে খবরের কাগজ থেকে আমি যে ধারণা করেছিলাম, তা আর টেকে না এবং তাহলে পার্টির ভিতরে ফাটলের প্রশ্ন একেবারেই ওঠে না।

(৪) **প্রসঙ্গ : সমমতাবলম্বী বনাম মিশ্র কেবিনেট :** এই বিষয়ে আপনার যুক্তিগুলি আমি সযত্নে পড়েছি এবং বিবেচনা করে দেখেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি আপনার কথা মেনে নিতে পারিনি। সম্ভবত আপনার অন্য আরও যুক্তি আছে যা আপনার কথা মেনে নিতে আমাকে সাহায্য করত। আপনার প্রধান বক্তব্য, মৌলিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে এত বেশী প্রভেদ যে মিলিতভাবে কাজ করা

অসম্ভব। হরিপুরা কংগ্রেসে আপনার মত আমাদেরই মতো ছিল এবং প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আগে পর্যন্ত মিলিতভাবে কাজ করা সম্ভবপর ছিল। তারপর কী এমন ঘটেছে যার দরুণ তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল? এবং আপনার মতে মৌলিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে প্রভেদই বা কিসে?

আমি আরও জানতে চাই, মিশ্র কেবিনেট সম্পর্কে আপনার আপত্তির কারণ কি সম্পূর্ণ নীতিগত, না, গত ২৫শে মার্চ তারিখে আপনাকে লেখা আমার প্রথম চিঠিতে যে আধাআধি ভাগের কথা বলেছিলাম, তাও। সেই চিঠিতে আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আপনার অনুমোদনের জন্য আমি সাতজনের নাম দিই, সর্দার প্যাটেলও সাতজনের নাম দিন। ঐ অনুপাত যদি আপনি মেনে নেন, পুরোপুরি চোদ্দজনের নামও আপনি প্রস্তাব করতে পারেন। যদি আপনি ঐ অনুপাত মানতে না পারেন এবং তাই যদি সর্বসম্মত মিশ্র কেবিনেট গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, অনুগ্রহ করে তা আমাকে জানালে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবার আমি একটা সুযোগ পাই।

(৫) **প্রসঙ্গ: শ্রীশরৎ বসুকে দেওয়া উপদেশ:** গত ২৪শে মার্চ তারিখে আপনি আমার দাদাকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন: "অতএব আমি প্রস্তাব করি হয় তোমরা সকলে একটি বৈঠকে মিলিত হও যাহাতে নিজেদের মনে যাহা কিছু আছে পরস্পরের কাছে খুলিয়া বলিয়া একটা বোঝাপড়ায় আসিতে পার, অথবা বিভেদের বিষ যদি এতই গভীরে যাইয়া থাকে যে তাহা দূর করা অসম্ভব তাহা হইলে..." আপনার পরবর্তী চিঠিগুলিতে এই নিয়ে আর কিছু বলেননি। আমি একাধিকবার আপনাকে লিখে জানিয়েছি যে, কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে চরম প্রয়াস করতে আমাদের দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি আরও বলেছি, আমাদের দিকে আমি ছাড়া আরও অনেকে আছে যারা আপনাকে কোন দলীয় বলে মনে করে না এবং দ্বন্দ্বরত দলগুলিকে মেলাবার জন্যে আপনার উপরেই ভরসা করে। আমি আরও একটু বাড়িয়ে বলতে পারি,

কেবল প্রাচীনপন্থী ও তাঁদের অনুগামীদের গান্ধীবাদী মনে করার কোন কারণ আপনার নেই। সমস্ত কংগ্রেসকেই আপনি গান্ধীবাদী বলে মনে করতে পারেন, শুধু যদি আমাদের কিছু কিছু পরিকল্পনা ও ধারণাকে আপনি মেনে নেন।

(৬) **প্রসঙ্গ : আমার বিকল্প প্রস্তাব :** (ক) আমার প্রথম প্রস্তাব আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম পুনরায় শুরু করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সে অবস্থায় আমরা এখন যে যে-পদাধিকারে আছি তা ত্যাগ করা ছাডাও আমাদের যে-কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন বোধ করবেন, আপনি তা দাবি করতে পারেন। সংগ্রাম যদি আবার শুরু হয় বিনাশর্তে আমরা তা সমর্থন করব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

(খ) যদি আপনি মনে করেন সংগ্রাম শুরু করা সম্ভব নয় এবং যদি আপনি প্রাচীনপন্থীদের গদিতে বসাতে চান—আমি তবে বলব আপনি আবার কংগ্রেসের চার আনার সদস্য হয়ে ওয়ার্কিং কমিটির ভার প্রত্যক্ষভাবে নিজে গ্রহণ করুন। তাতে অনেক অসুবিধার লাঘব হবে। আপনি যদি নিজেকে বাইরে রেখে কেবলমাত্র প্রাচীন-পন্থীদের আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন তাহলে ঐ অসুবিধাগুলি থেকে যেতে বাধ্য।

(গ) এই প্রস্তাবও যদি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় এবং আপনি আমাকে এ-সত্ত্বেও যদি সমমতাবলম্বী কেবিনেট গঠন করবার উপদেশ দিতে থাকেন তাহলে পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত আমাকে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব। আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের ফলে এ.আই.সি.সি-তে আপনার 'গোঁড়া' অনুগামীদের সমর্থন পাওয়া সুনিশ্চিত হবে। তাতে ভাঙন রোধ করা যাবে এবং অবাধে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে। এই প্রসঙ্গে ৬ই এপ্রিল তারিখে লেখা আমার শেষ চিঠিতে আমি আপনাকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটিকে কেবলমাত্র আপনার ইচ্ছানুসারেই গঠন

করলে হবে না, তা এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে তা আপনার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হয়। এই প্রস্তাব একবার যদি গ্রাহ্য করেন, আপনার পক্ষে এমন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া চলে না যা আপনার সম্পূর্ণ অস্থাভাজন হবে না।

(ঘ) এই তিনটি প্রস্তাবই যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনার একটি মাত্র পথই খোলা রইল—ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নেওয়া। আপনার সিদ্ধান্ত জানবার পর আমাকেই তখন আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিতে হবে।

(৭) **প্রসঙ্গ: আপনার মৌনতা:** আপনি আপনার কোন এক চিঠিতে বলেছেন, আপনি মৌন অবলম্বন করছেন, যেহেতু আমি তা করতে আপনাকে অনুরোধ করেছি। কেন অনুরোধ করেছিলাম আমার বুঝিয়ে বলা প্রযোজন। ত্রিপুরিতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল, একজন কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে আর একজন কংগ্রেসকর্মীর ব্যবধান এত বিরাট হয়েছিল যে তখন আমি বোধ করছিলাম সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার একমাত্র ভরসা আপনি। সে-সময় আমার মনে হয়েছিল, সমগ্র পরিস্থিতিটা নিরাবেগ ও নিরপেক্ষভাবে দেখা আপনার পক্ষে প্রয়োজন। পন্থ প্রস্তাবের সমর্থকদের নতুন দিল্লীতে যাবার তাড়া দেখে স্বভাবত আমি ভেবেছিলাম ত্রিপুরির ঘটনাবলীর একতরফা বিবরণ দিয়ে তারা আপনাকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে। সেই কারণে আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম ত্রিপুরির সম্পূর্ণ ব্যাপারটা—অর্থাৎ যা ঘটেছে তার বিভিন্ন ভাষ্য—শোনার আগে কোন প্রকাশ্য বিবৃতি যেন না দেন কিংবা প্রকাশ্য উক্তি না করেন। আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন বলে আমি আপনার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এর ফল হয়েছে এই যে, সারা দেশ এখনও আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে যাতে আপনি কোনক্রমে আমাদের কর্মীদের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনেন এবং কংগ্রেসকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করেন। ভগবান না করুন, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেই সময় আসে

যখন আপনি সব কিছু দলীয় দৃষ্টিতে দেখে বিচার করছেন, তাহলে ঐক্যের সব আশা ধূলিসাৎ হবে এবং যতদূর মনে হয় আমরা এক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব।

কিন্তু এখন আমার বোধ হচ্ছে আপনার মুখ বন্ধ করে রাখা আমার উচিত হচ্ছে না। অতএব, যদি আপনি বোঝেন আপনার মুখ খোলা উচিত—অথবা আপনি মনে করেন ত্রিপুরির ঘটনা সম্পর্কে সবার বক্তব্য আপনার শোনা হয়ে গেছে—আপনার ইচ্ছামত প্রকাশ্যে যে কোন বিবৃতি দিতে বা উক্তি করতে পারেন। আমি কেবলমাত্র আপনাকে অনুরোধ করব, সকল পর্যায়ের কংগ্রেসকর্মীরা (কেবলমাত্র প্রাচীনপন্থীরাই নয়) আপনাকে কী ভাবে দেখে এবং আপনার কাছ থেকে কী আশা করে তা মনে রাখবেন।

পরিশেষে, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ৭ তারিখে হঠাৎ আপনার রাজকোটে যাত্রার ঠিক আগে দিল্লী থেকে আপনার টেলিগ্রামগুলি পেয়ে আমি অত্যন্ত নিরাশ হই। আমার মনে হয়েছিল আমাদের মধ্যে পত্রালাপ কোন মীমাংসার দিকে যাচ্ছে না এবং খোলাখুলি কথাবার্তা বলা দরকার। এই কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হই। আমার এই অবস্থা আপনাকে জানাতে ৭ই সকালে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমার পক্ষ থেকে বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন। ঐ দিনই আরও বেলায় আমার ডাক্তারও বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন এবং অপর প্রান্ত থেকে শ্রীমহাদেব দেশাই তাঁকে বলেন আপনি এখানে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এবং যাই হোক না কেন, পরের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ তারিখের আগে আপনি দিল্লী ত্যাগ করছেন না। কিন্তু রাজকোট আপনাকে নিয়ে গেল দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি। আমি শুধু এইটুকু কামনা করতে পারি, রাজকোটের পক্ষে যা আশীর্বাদ হবে তা কংগ্রেসের পক্ষে অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারিতে রাজকোট যদি হঠাৎ আপনাকে না নিয়ে যেত, তাহলে ত্রিপুরি কংগ্রেসের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হত। সেই পরিস্থিতিতে সব দিক রক্ষা করবার ক্ষমতা আপনারই ছিল, কিন্তু

আমার ও রিসেপ্‌শন কমিটির বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনাকে পাওয়া গেল না। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি যখন ঠাকোর সাহেবকে চরমপত্র পাঠালেন, সারা দেশ তখন স্বভাবত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাকে সমর্থন জানিয়েছিল, ঠিকই, তবু কিন্তু আপনার দেশবাসীর একটি বড় অংশ তখন ভেবেছিল এবং এখনও ভাবে, রাজকোট রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থের কোন ক্ষতি না করেই আপনি রাজকোট সংগ্রামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখতে পারতেন।

স্যার মরিস গয়ারের রায় সম্পর্কে একটি বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্যে রায়টি সই করেন নি। করেছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে।

আমার চিঠি এরই মধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে; অতএব এখানেই আমার থামা উচিত। আশা করি, পথের কষ্ট আপনি সহ্য করতে পেরেছেন এবং আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত আছে। আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছি।

প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

রাজকোট
১০ই এপ্রিল, ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৬ তারিখের পত্র এখানে ফেরত পাঠানো হইয়াছে। আমি চাহিয়াছিলাম প্রতিবাদীরা মিলিত হইয়া খোলাখুলিভাবে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া নিক। কিন্তু ইত্যবসরে এত কিছু ঘটিয়া গিয়াছে যে ইহাতে কোন ফল হইবে কিনা আমি জানি না। তাহারা কেবল পরস্পরকে কটুকাটব্য করিবে এবং তিক্ততা যাহা আছে তাহা আরও তিক্ত হইয়া উঠিবে। ব্যবধান খুবই বিস্তৃত, সন্দেহ

অত্যন্ত গভীর। সকলকে এক করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। আমার নিকট একমাত্র পন্থা মনে হইতেছে বিভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া এবং প্রতিটি দলকে নিজ মতে কাজ করিতে দেওয়া।

মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্য বিবদমান সকলকে একত্রিত করার পক্ষে নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হইতেছে। সমুচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহারা তাহাদের নীতিকে কার্যকর করুক আমার এইমাত্র আশা করাই উচিত। যদি তাহারা তাই করে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমি ব্যাখ্যা করিতে পারিব না। যতই তাহা পড়িতেছি ততই তাহা খারাপ লাগিতেছে। যাহারা রচনা করিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য ভালোই ছিল। কিন্তু তাহা বর্তমান সঙ্কটের উপযোগী নয়। অতএব তুমি ইহাকে নিজের মত ব্যাখ্যা করিও এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সেইমত কাজ করিয়া যাও।

আমি তোমার উপরে একটি কেবিনেট চাপাইয়া দিতে পারি না, দিবও না। আরোপিত কেবিনেট অবশ্যই তুমি মানিয়া লইবে না, তোমার কেবিনেটকে এবং নীতিকে এ.আই.সি.সি অনুমোদন করিবে এরূপ নিশ্চয়তাও আমি দিতে পারি না। তাহাতে অপরের মত দমন করা হইবে। সদস্যরা তাঁহাদের নিজেদের বিবেচনা বোধে চালিত হোন। তুমি যদি ভোট না পাও, সংখ্যাগরিষ্ঠকে যতদিন না স্বমতে আনিতে পারিতেছ ততদিন বিরোধীপক্ষকে পরিচালিত কর।

তুমি কি জানো না, যেখানে আমার প্রভাব আছে, আমি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছি ? জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত ত্রিবাঙ্কুর এবং জয়পুর। এমন কি রাজকোটের (আন্দোলনও) আমি এখানে আসিবার পুর্বে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আমি আবার বলিতেছি, বাতাসে আমি হিংসার আঘ্রাণ পাইতেছি। অহিংসভাবে কিছু করিবার পরিবেশ আমি দেখিতেছি না। রামপুরের শিক্ষা কি তুমি পাও নাই ? আমার মতে তাহাতে আদর্শের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাহা ছিল পূর্বকল্পিত। তাহার জন্য কংগ্রেসকর্মীরাই দায়ী,

ওড়িশ্যার রামপুরেও যেমন তাহারাই দায়ী ছিল। দেখিতেছ না আমরা দুইজনে অকপটভাবে একই বস্তু ভিন্নরূপে দেখিতেছি, এমনকি ভিন্ন সিদ্ধান্তেও আসিতেছি? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কী উপায়ে আমরা মিলিত হইতে পারি? ওই ক্ষেত্রে আমাদের মতপার্থক্য আমাদের মানিয়া লওয়াই উচিত। আমরা সামাজিক, নৈতিক ও পৌরক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আমি যোগ করিতে পারিলাম না, কারণ সে ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-সব বিষয়ের মধ্যে আপস অসম্ভব, জোর করিয়া তাহা হইতে সাধারণ একটি নীতি ও কার্যক্রম খাড়া করিয়া বিভিন্ন দলকে সেইভাবে কাজ করিতে বলিবার চাইতে আমরা যদি আমাদের নিজস্ব মতে নিজ নিজ ধারায় কাজ করিয়া যাই, তাহা হইলে আরও ভালোভাবে দেশের সেবা করতে পারিব।

ধানবাদ যাইতে যে আমি একেবারেই অক্ষম—দিল্লী হইতে তাহা তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছি, রাজকোটকে অগ্রাহ্য করিবার আমার উপায় নাই।

আমি ভালো আছি। বা ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। আজ পঞ্চম দিন। আমি তাঁহাকে আমার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আসার আগেই জ্বর শুরু হইয়াছে।

আমি কামনা করি, স্থির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিয়া তুমি তোমার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে। ফলের ভাবনা ভগবানের উপর ছাড়িয়া দাও। তোমার পিতার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছ তাহা মর্মস্পর্শী। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একটি জিনিস আমি ভুলিয়া যাইতেছি। কেহ আমাকে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করায় নাই। আমি সেবাগ্রামে তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহা আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য। যদি তুমি মনে কর, প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে তোমার ব্যক্তিগত শত্রু একজনও আছে, তাহা হইলে তুমি ভুল করিবে।

ভালোবাসা জানিও। —বাপু

পোঃ জিয়ালগোরা
জেলা মানভূম
১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

ভেবেছিলাম আমার ১০ তারিখের চিঠিই শেষ চিঠি হবে, কিন্তু হবার নয়। আজ আমি অনেক ভোরে উঠেছি এবং যেহেতু ঘুম আমাকে ত্যাগ করেছে ভোরের আলো-আধারি নিস্তব্ধতায় আমাদের সাধারণ সমস্যাগুলির কথা মনে আসছে। আমাদের সমস্ত চিঠিপত্র আবার আমি পড়ে দেখলাম। দেখছি আরও কয়েকটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

৩০শে মার্চ তারিখের আপনার চিঠিতে আপনি বলেছেন যে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি সেবাগ্রামে আমরা মেনে নিয়েছিলাম মৌলিক প্রশ্নে আমাদের মতভেদ আছে। আমাদের আলোচনা সূত্রে কিছু কিছু মতপার্থক্য আমরা আবিষ্কার করি ঠিকই, তবে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না তাকে মৌলিক প্রশ্নে মতভেদ বলা যায় কিনা। আপনি এখন আপনার চিঠিগুলিতে যে বিষয়গুলির কথা বলেছেন তার অধিকাংশ বা অনেকগুলি আপনি তখন বলেছিলেন। যেমন, দুর্নীতি, হিংসা, ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার যা মত তখন তা বলেছিলেন এবং চরমপত্র দেওয়া ও স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করা বিষয়ে আমার বক্তব্যকে আপনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন—যেহেতু আপনার মনে হয়েছিল অহিংস গণ-আন্দোলনের উপযোগী পরিবেশ নেই। কিন্তু এই মতপার্থক্যগুলি কি মৌলিক এবং সেগুলি কি এমনই যার দরুণ আমাদের মিলিতভাবে কাজ করবার সব আশা ত্যাগ করতে হবে? কার্যক্রমের প্রশ্নে কংগ্রেসই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের ধারণা ও পরিকল্পনা পেশ করতে পারি—তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কংগ্রেসের। চরমপত্র দেওয়া ও স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করা বিষয়ে আমার আসল প্রস্তাবটি ত্রিপুরি কংগ্রেসেই নাকচ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই কারণে আমার কোন আক্ষেপ নেই। এই

প্রকার বিলম্ব গণতন্ত্রের সহজাত। আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমি ঠিকই করেছিলাম এবং কংগ্রেস একদিন তা উপলব্ধি করবে। আমি কেবল এইটুকু আশা করি, তখন বড় বেশী দেরি না হয়ে যায়। এই সব মতপার্থক্য রয়েছে স্বীকার করেও কেন আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব না ? এই মতপার্থক্যগুলি আজ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। সেগুলি কিছুকাল থেকেই আছে, তা সত্ত্বেও আমরা মিলেমিশে কাজ করেছি। এইসব বা এইরকম মতপার্থক্য ভবিষ্যতেও থাকবে এবং তখনও আমাদের একইভাবে চলতে হবে (অর্থাৎ সাধারণ স্বার্থে মিলেমিশে কাজ করতে হবে)।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, সেবাগ্রামে আমরা প্রায় একঘণ্টা ধরে কেবলমাত্র মিশ্র বনাম সমমতাবলম্বী কেবিনেট প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের মতের মিল হয়নি তা মেনে নিতে হয়েছিল। আমাদের তিনঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার শেষের দিকে আমি বলেছিলাম, সব সত্ত্বেও সর্দার প্যাটেল ও আর সবার সঙ্গে পরে যখনই আমার দেখা হবে তাঁদের সহযোগিতা লাভের জন্য আমি একবার শেষ চেষ্টা করব। আমি যদি অসুস্থ হয়ে না পড়তাম এবং ১২শে ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমাদের যদি দেখা হত তাহলে মিলিতভাবে কাজ করা হয়তো অনেক সহজসাধ্য হত।

আপনার ৩০শে মার্চ তারিখের চিঠিতে আরও একটি মন্তব্য আছে যার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আগে সে সম্পর্কে উল্লেখ করতে আমি ভুলে গেছি। আপনি কার্যত এই কথাই বলেছিলেন যে, আমার নীতি যদি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশের সমর্থন লাভ করে থাকে, যারা সেই নীতিতে বিশ্বাসী, কেবলমাত্র তাদেরই নিয়ে আমার ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত কিন্তু এ.আই.সি.সি'তে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও আমাদের মিশ্র কেবিনেট থাকা উচিত, কারণ কেবিনেটের গঠন যতদূর সম্ভব সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের গঠনের মতই হওয়া বিধেয়,

এবং তা যত বেশী সম্ভব কংগ্রেসের ভিতরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন হওয়া উচিত। আজ ভারতের ভিতরে এবং বাইরে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আমাদের মতে, কংগ্রেসের পক্ষে সমমতাবলম্বী কেবিনেট গঠনের নীতি মূলত ভুল। এই সময় আমাদের উচিত জাতীয় ভিত্তিকে বিস্তৃত করা। আমরা কি তার সূত্রপাত করব আমাদের জাতীয় কার্যনির্বাহক সংস্থা—ওয়ার্কিং কমিটিকে সংকীর্ণ দলীয় ভিত্তিতে গঠন করে ?

দুর্নীতির প্রশ্নে সাধারণভাবে আমরা একমত, তবে আমি মনে করি আপনি ব্যাপারটিকে কিছুটা বড় করে দেখছেন। আমি জানি না ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে দেখলে দুর্নীতির মাত্রা লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে কিনা। যতই হোক, আমি কিন্তু মনে করি, যদি তা বেড়েও থাকে তার ফলে, জাতীয় সংগ্রাম করবার সামর্থ্য আমাদের এখনও লোপ পায়নি। এবং দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান করার সময় আমাদের ভেবে দেখতে হবে, সংগ্রাম স্থগিত রাখার এবং সেইসঙ্গে সরকারি নানারূপ আয়েশ ও আরাম ভোগ করার ফলে প্রধানত তা হয়েছে কিনা। আগের চিঠিতে যা বলেছি তারই পুনরুক্তি করে বলছি, হয়তো আরও বেশী স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ বরণ করার আহ্বান এর যথার্থ প্রতিষেধক হবে এবং জাতিকে উচ্চতর এক নৈতিক স্তরে উন্নীত করবে।

৬ই তারিখে রাজেনবাবু অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমাদের উভয়ের আগ্রহের বিষয় শ্রমিক প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা করি—পরে কংগ্রেস প্রসঙ্গে আসি। আপনার সঙ্গে প্রথমে যখন আমি চিঠিপত্র লিখতে শুরু করি, আমার আশা ছিল চিঠিপত্রের মারফৎই আমরা ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যাটি মীমাংসা করতে পারব এবং বৃহত্তর সমস্যাগুলি আমাদের পরবর্তী বৈঠকের জন্য আমরা স্থগিত রাখতে পারি। কিন্তু পত্রালাপ যতই চলতে থাকল আমি বুঝতে পারলাম কোন সমাধানের দিকে তা যাচ্ছে না। যখন রাজেনবাবু এলেন আমার তখন মনে হচ্ছিল যেমন করে হোক ডাক্তারি নির্দেশ অমান্য করেও আপনার সঙ্গে দেখা করি, হয়তো তাতে আমাদের মধ্যে

একটা মিটমাটে আসা যেতে পারে। সেই জন্যেই রাজেনবাবু আমার অনুরোধে বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন এবং একটি বৈঠকের প্রস্তাব করেন। রাজেনবাবুর কাছ থেকে উৎসাহজনক সংবাদ না পেয়ে আমি ভাবলাম, আমার আর একবার চেষ্টা করা উচিত। তাই আমার ডাক্তার বিকেলে আবার বিড়লা ভবনে টেলিফোন করেন এবং আমি নিজে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করি—দুই ক্ষেত্রেই আপনি জবাবে জানান যে রাজকোটের ব্যাপারে আপনাকে অবিলম্বে বাধ্য হয়ে দিল্লী ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার তখন মনে হয়েছিল এবং এখনও আমি মনে করি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষতিসাধন করে, হয়তো কংগ্রেসের অশেষ দুর্ভাগ্য, তাই রাজকোট আপনার উপর ভর করেছিল। আমার মত লোকদের কাছে কংগ্রেসের প্রয়োজন—বিশেষ করে সেই সঙ্কটের সময়ে—রাজকোটের ডাকের থেকে ছিল হাজারগুণ বেশি জরুরী। একথা স্বভাবত মনে আসে যে, স্যার মরিস গয়ারের রায়ের পর সর্দার প্যাটেলকে দিয়েই রাজকোট পরিস্থিতি সামলানো যেত, তার জন্য সেখানে এত দীর্ঘকাল আপনার ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। যাইহোক, আপনি যখন ইতিকর্তব্য স্থির করে যা করবার তা করেছেন এখন আপসোস করে লাভ নেই।

৭ই এপ্রিল আপনার এক টেলিগ্রামে আপনি প্রস্তাব করেছিলেন আমার দাদা শরৎ বা অন্য কোন প্রতিনিধি রাজকোটে প্লেনে বা অন্য উপায়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সসঙ্কোচে আমাকে বলতে হচ্ছে প্রস্তাবটি কাজের ছিল না। সরাসরি চিঠিপত্রে যদি সন্তোষজনক কোন মীমাংসায় পৌঁছানো না যায়, প্রতিনিধি মারফৎ কথাবার্তা চালিয়ে কী ফল লাভ হতে পারে, বিশেষ করে সমস্যাটি যখন এত কঠিন ও জটিল? না, আমি মনে করি রাজকোটে প্রতিনিধি পাঠিয়ে অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। তা হতে পারে একমাত্র আমাদের মধ্যে সরাসরি আলোচনাতেই।

আপনার ১০ তারিখের চিঠি এইমাত্র পেলাম, সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে হচ্ছে,

বেশীর ভাগ প্রশ্নের যে জবাব আপনি দিয়েছেন তা আমাকে নিরাশ করেছে। সমস্ত চিঠিটিতে হতাশার ভাব ছড়িয়ে আছে, আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সসঙ্কোচে আমাকে এ কথাও বলতে হচ্ছে যে, আপনি ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলির উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় সঙ্কট দেখা দিলে আমরা এইসব প্রশ্ন কাটিয়ে উঠতে পারব, এই ভরসাটুকু রাখবার জন্যে আমাদের দেশাত্মবোধের উপর আপনার যথেষ্ট আস্থা রাখা উচিত ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে একতা যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে না পারি, দেশের একতা আমরা কি করে আশা করতে পারি। পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে কার্যত আপনি আমাকে কোনই উপদেশ দেননি।

দেশীয় রাজ্যগুলিতেও অহিংস গণ-আন্দোলন সম্পর্কে আপনি যদি এতই নিরাশ হন তাহলে কি করে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের জন্য নাগরিক স্বাধীনতা ও দায়িত্বপূর্ণ সরকারের দাবি আদায় করার আশা করেন? যতই বলুন আমাদের একমাত্র অস্ত্র অহিংস গণ-আন্দোলন বাদ দিলে বিশুদ্ধ নরমপন্থী নীতি বা আপনার পরার্থে আত্মদান নীতি ছাড়া আমাদের আর কিছু সম্বল থাকে না। আপনি বলেছেন, যেখানে আপনার প্রভাব আছে সেখানেই আপনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা জানি আপনি রাজকোটে তাই করেছেন এবং সেখানে সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে এই কারণে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। আপনার দেশবাসীর বা রাজকোট রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি কি তাই করে সুবিচার করেছেন?

আপনার ইচ্ছামত আপনার জীবন বিপন্ন করবার অধিকার আপনার নেই। রাজকোট থেকে আরও বড় ক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব ও সাহায্য আপনার দেশবাসী ন্যায়সঙ্গতভাবে আপনার কাছে দাবি করতে পারে। এবং রাজকোটের জনগণ সম্পর্কেও একথা সত্য যে, যদি তারা নিজেদের চেষ্টায় স্বরাজ অর্জন না করে, করে আপনার আত্মনিগ্রহের ফলে, রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে তারা অপরিণতই

থেকে যাবে এবং যে স্বরাজ আপনি তাদের জন্য অর্জন করে দেবেন তাও তারা রক্ষা করতে পারবে না। সবার শেষে এত দিকে এবং এতগুলি লড়াই যখন চালাতে হবে, কতবার এইভাবে আপনার মূল্যবান জীবন বিপন্ন করতে পারবেন ?

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন। অর্থনৈতিক কথাটি আপনি যোগ করেছেন সম্ভবত এই কারণে যে, আপনি আমাদের সর্ব-ভারতীয় শিল্প পরিকল্পনার চিন্তা অনুমোদন করেননি, যদিও আমরা শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী কুটীরশিল্পকে উৎসাহ দেবার কথা বলেছি। রাজনৈতিক মতভেদের বিষয়ে আমি এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না এমন কী মতভেদ আছে যা ঐক্যের ও সম্মিলিত-ভাবে কাজ করার পথে মৌল ও অলঙ্ঘনীয় বাধা বলে মনে করেন। আপনার যদি এখনও এই ধারণা থাকে যে এইভাবে কাজ করা অসম্ভব, তাহলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ—অন্তত আসন্ন ভবিষ্যৎ—বাস্তবিকই অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতদিন ধরে আমি আশা করে আসছিলাম যে আপনার মারফৎ এই বিভেদ কোনরকমে জোড়া লাগবে এবং তার ফলে নিদারুণ এক জাতীয় সঙ্কটকে এড়ানো যাবে।

আপনি যাদের অশমনীয় বলেছেন, তারা ভালো হোক, মন্দ হোক, ভালোমন্দ কিছুই না হোক, তারা টিকে থাকবে। অতএব মিলিত আন্দোলন আজ যদি অসম্ভব হয়, তাহলে সব সময়েই তা অসম্ভব হবে। তার অর্থ ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে শূন্য হতাশা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের মধ্যে যখন তারুণ্যের বলিষ্ঠ আশাবাদ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনির্বাণ বিশ্বাস আছে আমরা কি করে এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারি ?

আপনি কয়েকটি চিঠিতে আমাকে বলেছেন, আমার নীতি ও কার্যক্রম প্রণয়ণ করে অবিলম্বে তা যেন এ.আই.সি.সি'র কাছে পেশ করি। কিন্তু কংগ্রেসের কাছ থেকে আমি যে নির্দেশ পেয়েছি তাতে একটি বিশেষ প্রণালীতে আমাকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে

এবং তাই আমার আশু কর্তব্য। ত্রিপুরি কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্টের ভাষণে আমার কার্যক্রম উপস্থাপিত হয়েছিল কিন্তু তা গৃহীত হয় নি। ঠিক এই মুহূর্তে ওয়ার্কিং কমিটির বিষয়টি যখন অমীমাংসিত রয়েছে আমি এ.আই.সি.সি'র কাছে কোন কার্যক্রম পেশ করবার তাগিদ বোধ করছি না।

আপনি আপনার প্রথম চিঠিতে বলেছিলেন, আমাকেই উদ্যোগী হতে হবে। সেই অনুযায়ী আপাতত আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সে সম্পর্কে আমার সমাধান এবং আমার যা কিছু ধারণা আমি আপনাকে জানিয়ে আসছি। আমি দেখছি আমার সব প্রস্তাব বা তার অধিকাংশই আপনার অনুমোদন লাভ করেনি। অতএব এবার আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হবে সে সম্পর্কে আপনার অভিপ্রায় জানাবার সময় এখন এসেছে। পন্থ প্রস্তাবের নির্দেশ ছিল, ওয়ার্কিং কমিটি কেবল আপনার ইচ্ছানুযায়ীই গঠিত হবে না, তাকে আপনার আস্থাভাজনও হতে হবে।

আপনার বিবেচনার জন্য আমি কিছু বিকল্প প্রস্তাব পেশ করছি। প্রথমত আমি জাতীয় সংগ্রাম আবার শুরু করবার কথা বলেছিলাম, তাতে আমাদের বর্তমান বাধাবিপত্তির অধিকাংশ নিরসিত হত। এই প্রস্তাব আপনার গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আপনার উপদেশ মত আমি যদি সমমতাবলম্বী একটি কেবিনেট গঠন করি, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট আমাকে দেবেন। এও সম্ভব নয় আপনি বলেছেন। তৃতীয়ত, আমি প্রস্তাব করেছিলাম, আপনি নিজে এগিয়ে এসে ওয়ার্কিং কমিটির সরাসরি পরিচালনভার গ্রহন করুন, এতেও অনেক বাধা অপসারিত হত এবং অনেক কিছু সহজ হয়ে যেত। আপনি আমার এই প্রস্তাবের কোন জবাব দেন নি। আপনি যদি এটাও নাকচ করে দেন তাহলে আমার আর করবার কিছু নেই, আমার জায়গায় আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে এবং ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

আমার ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার স্পষ্ট। আপনার উপদেশমত আমার দিকের সদস্যদের নিয়ে সমমতাবলম্বী কেবিনেট গঠন করা পারতপক্ষে আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেইজন্য আমি দুঃখিত। আপনার উপদেশ কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যায়। সেই প্রস্তাবে বলা আছে, ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হতে হবে। তা ছাড়া, আমার বিনীত অভিমত এই যে, বর্তমান অবস্থায় সমমতাবলম্বী কেবিনেট দেশের সর্বাধিক স্বার্থের প্রতিকূল হবে। সাধারণ ভাবে তা কংগ্রেস সংস্থার যথার্থ প্রতিনিধি স্থানীয় হবে না তো বটেই, অধিকন্তু, এর ফলে তীব্র কলহের সূত্রপাত হবে এবং সম্ভবত আমাদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে।

আশা করি, ত্রিপুরি কংগ্রেস আপনার উপর যে কাজের ভার অর্পন করেছে আপনি এখন তা পালন করবেন। আপনি যদি তাও করতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমি তখন কী করব? বিষয়টি কি তখন আমি এ. আই. সি. সি'র কাছে জানাব এবং তাদেরই বলব ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচন করতে? অথবা আমাকে বলবার অন্য কোন নির্দেশ আপনার আছে কি?

আশা করি বা এখন আগের থেকে ভালো আছেন এবং শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপনার স্বাস্থ্য, বিশেষ করে আপনার ব্লাড প্রেসার এখন কীরকম? আমার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।

সশ্রদ্ধ প্রণাম সহ

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

পুনশ্চ আপনার যে চিঠির (১০ তারিখের) জবাব দিচ্ছি তাতে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের জন্য আমার অনুরোধের জবাবে আপনি বলেছেন যে, আমি যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করব সে সম্পর্কে এ. আই. সি. সি'র উচিত হবে আপনার নির্দেশ বা মতামতে চালিত

না হয়ে, নিজস্ব বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করা। অনেক বেশী ভালো হত যদি ওয়ার্কিং কমিটিকে গঠন করা নিয়েই নিজেদের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী তাদের কাজ করতে দেওয়া হত। আমি যদি আপনার উপদেশ কার্যকর করতে না পারি, কার্যকর করলে পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হবে, এবং আপনি নিজে যদি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন না করেন, তাহলে এ. আই. সি. সি'কে ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত করবার দায়িত্ব নিতেই হবে। আপনি অন্য কোন উপায়ের কথা কি বলতে পারেন ?

জিয়ালগোরা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৯

[টেলিগ্রাম]

নিয়মিত সংবাদপত্র রিপোর্টে উদ্বিগ্ন যে কলিকাতায় এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ে আসিতেছেন না এবং গান্ধী সেবা সঙ্ঘ কনফারেন্স মে'র দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুলতুবি থাকিতেছে। এ. আই.সি.সি মিটিংয়ের সময় আপনার উপস্থিতি একান্ত দরকার। এ. আই. সি. সি মিটিং মে'র প্রথম সপ্তাহে কি আপনার সুবিধা হইবে ? অনুগ্রহ, টেলিগ্রাম করিবেন

—সুভাষ

রাজকোট, ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৯

তোমার চিঠি আমার চিঠিকে পথে অতিক্রম করিয়াছে। সুরাহা হইতে পারে এমন কিছুই যোগ করিবার নাই। দৃঢ়নিশ্চিত, জাতীয় স্বার্থে তোমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তোমার অবাধ পছন্দমত কেবিনেট গঠন এবং কার্যক্রম প্রণয়ণ করা। ভালোবাসা

—বাপু।

রাজকোট
১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৯

[টেলিগ্রাম]

তোমার টেলিগ্রাম। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ ৩রা হইতে ১০ই মে। ভালো হয় ওয়ার্কিং কমিটি ২৮শে, এ.আই.সি.সি ২৯শে হইলে। যাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বা'র জ্বর কম, বিপদ নাই।

ভালোবাসা
—বাপু

জিয়ালগোরা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৯

গতকালের দুইটি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। আপনার কলিকাতায় আসা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতেছি না বলিয়া দুঃখিত। এ. আই. সি. সি. মিটিংয়ের সময় আপনার উপস্থিতি একান্ত দরকার। আপনার সুবিধার জন্য প্রয়োজন হইলে মিটিং স্থগিত থাকিবে। সমমতাবলম্বী কেবিনেট সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কার্যকর করিতে পারিতেছিনা—দুঃখিত। অগত্যা, একমাত্র বিকল্প আপনি কেবিনেট মনোনীত করিবেন। ১৩ই আপনাকে চিঠি দিয়াছি। আজ আবার লিখিতেছি। কোন কারণে মনোনীত যদি না করেন, বিষয়টি এ.আই.সি.সিতে পেশ হইবে। আমি অনিশ্চিত। তাহার পূর্বে ব্যক্তিগত আলাপের মধ্য দিয়া মীমাংসার শেষ চেষ্টা আমাদের করা উচিত। আপনার সুবিধার্থে ইহার জন্য এ. আই. সি. সি মুলতুবি থাকিতে পারে। ১৩ ও ১৫ তারিখের আমার চিঠি বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ করিয়া টেলিগ্রাম করিবেন।

প্রণাম
—সুভাষ

জিয়ালগোরা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

আজ আপনাকে আমি টেলিগ্রাম করে জানিয়েছি যে, এ. আই.সি.সি মিটিংয়ের সময় কলকাতায় আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এটি এতই জরুরী যে, আপনার সুবিধার জন্য প্রয়োজন হলে এ.আই.সি.সি মিটিং স্থগিত রাখা হবে। অনুগ্রহ করে সুনিশ্চিত ভাবে আমাকে জানাবেন, নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে আপনি আসতে পারবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, এ. আই. সি. সি'র মিটিংয়ের আগেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। এ বিষয়ে তাঁরা এতই দৃঢ়মত পোষণ করেন যে তাঁরা বলছেন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত না হলে এ. আই. সি. সি'র মিটিং ডেকে কোন লাভ নেই। তাঁদের আরও ধারণা, চিঠিপত্রের মারফৎ যদি মীমাংসায় না পৌছানো যায়, ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা মারফৎ আমাদের একবার শেষ ও চরম চেষ্টা করা উচিত। আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্ভবপর করার জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, এ. আই. সি. সি'র মিটিং পিছিয়ে দিতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে পিছিয়ে দেওয়ায় আমার ভয় আছে, (কারণ আমার উপর কালাপহরণের অভিযোগ আসতে পারে) যদি না আপনি অনুমোদন করেন। আমি কিন্তু গভীরভাবে উপলব্ধি করছি, চিঠিপত্রে যদি সন্তোষজনক ফল না পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের সাক্ষাৎ করতেই হবে এবং এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা এ.আই.সি.সি মিটিয়ের আগে করতে হবে। ব্যক্তিগত আলোচনার ফলেও যদি মীমাংসায় পৌছান না যায়, তখন অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল।

এখন একেবারে সাম্প্রতিক অবস্থাটা সংক্ষেপে বলছি। সমমতাবলম্বী কেবিনেট গঠন সম্পর্কে আপনার উপদেশ পালন করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। (আমি কারণগুলি বলছিনা, তা আমার

আগেকার চিঠিগুলিতে বিশদভাবে বলেছি)। অতএব পন্থ প্রস্তাবের ফলে আপনার উপর যে দায়িত্ব বর্তিয়েছে তা আপনাকে নিতেই হবে। অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম আপনাকে ঘোষণা করতে হবে। আপনি যদি তা করেন, তাহলে অচলাবস্থার অবসান হবে— ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পর এ.আই.সি.সিও বসবে। আশা করা যায় তারপর সবই ঠিক হয়ে যাবে এবং অন্য কোন আপদ দেখা দেবে না।

যদি কোন কারণে আপনি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে নারাজ হন, আমাদের তখন হবে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। বিষয়টিকে তাহলে অনিশ্চিত অবস্থায় এ.আই.সি.সি'র নিকট উপস্থাপিত করতে হবে। আমি মনে করি, সবাই স্বীকার করবেন যে, এ.আই.সি.সি বৈঠকের আগেই ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত, যাতে ত্রিপুরির মত এ.আই.সি.সি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয়।

বর্তমানে আপনি কিভাবে চিন্তা করছেন আমার জানা নেই, তবে আমি আশা করছি আপনি এবারে ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের নাম ঘোষণা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং তাই করে অচলাবস্থার অবসান ঘটাবেন। আপনি যদি অন্যপ্রকার ভাবেন, ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যা সমাধান না করে কলকাতায় এ.আই.সি.সি'র বৈঠক বসলে কী সাংঘাতিক পরিনাম দেখা দেবে তা আপনাকে অনুমান করতে অনুরোধ করি। যদি এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, প্রয়োজন হলে আমাদের সাক্ষাৎ করতে হবে এবং যাতে আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, এ.আই.সি.সি মিটিংকে মুলতুবি রাখতে হবে।

সম্প্রতি আমার একটি কথা মনে হচ্ছে। সমমতাবলম্বী কেবিনেট নিয়ে আমরা প্রচুর আলোচনা করছি—কিন্তু সমমতাবলম্বী কেবিনেট বলতে আমরা যথার্থ কী বুঝি সে বিষয়ে কি আমরা নিশ্চিত? যেমন, লক্ষ্মৌ, ফৈজপুর এবং হরিপুরা কংগ্রেসের পর যে ওয়ার্কিং কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল—আপনি কি সেগুলিকে সমমতাবলম্বী বলবেন— তাহলে সমমতাবলম্বী বনাম মিশ্র কেবিনেটের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক

করবার কোনই যুক্তি নেই। আপনি যদি তাদের মিশ্র বলেন তাহলে তিন বছর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে আসার পর এই বছর মিশ্র কেবিনেট কাজ চালাতে পারবে না কেন ? আমার মনে হচ্ছে সম-মতাবলম্বী ও মিশ্র কেবিনেটের তাত্ত্বিক আলোচনা বাদ দিলে এমন কয়েকজনের নাম আমরা মেনে নিতে পারি যারা সর্বতোভাবে এ.আই.সি.সি'র এবং সাধারণভাবে কংগ্রেস ডেলিগেটদের মোটামুটি আস্থাভাজন হবেন। অনুগ্রহ করে সমস্যার এই দিকটি বিবেচনা করবেন।

এর পরে দুর্নীতি, হিংসা ইত্যাদির মত সমস্যা নিয়ে আপনি গভীর-ভাবে উদ্বিগ্ন। সম্ভবত আপনি এই প্রশ্নগুলিকে মৌলিক বলে মনে করেন। এখন কতখানি দুর্নীতির প্রসার হয়েছে অথবা কী পরিমাণে হিংসার মনোভাব ছড়িয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কি সবাই একমত নই যে, দুর্নীতি, হিংসা ইত্যাদির অবসান দরকার এবং সেই উদ্দেশ্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ? যদি তাই হয়, তবে আপনি কেন একথা ভাববেন যে, কাজের সময় আমরা একসাথে কাজ করব না কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা একমত হতে পারব না ?

চিঠি আর দীর্ঘ করব না। আমার মনে যা ছিল সব আপনাকে খুলে বলেছি। আমি আবার শুধু বলতে চাই, যতদূর মনে হয় সামনা-সামনি আলোচনার পর আমরা দেখতে পাব, কেবিনেটের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বগত অভিমত যাই হোক না কেন, তাতে কার কার নাম থাকবে সে সম্পর্কে আমরা একমত হতে পারব—এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বগত মতভেদ যতই হোক, কর্মক্ষেত্রের ডাক এলে আমরা একমত হতে সক্ষম হব।

আশা করি বা দ্রুত উন্নতির পথে যাচ্ছেন এবং অত্যধিক পরিশ্রম সত্ত্বেও আপনার স্বাস্থ্য সন্তোষজনক আছে। আমি ধীরগতিতে উন্নতি-লাভ করছি। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

আপনার স্নেহাস্পদ

সুভাষ

রাজকোট
১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯

[টেলিগ্রাম]

তোমার চিঠি এবং টেলিগ্রাম। এ.আই.সি.সি মিটিংয়ের তারিখ ২৮শে ঠিক রাখিও, উপস্থিত থাকিব। তোমার উপর কমিটি চাপাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি নিজে গঠন না করিলে, এ.আই.সি.সি বুঝিবে। মিশ্র কেবিনেট আমার কাছে অকার্যকর মনে হয়। যেহেতু তোমার আপত্তি নাই, সময় পাইলে আমি সাধারণ বিবৃতি দিবার চেষ্টা করিব। ভালোবাসা।

—বাপু

জিয়ালগোরা

যদি আপনি বিবৃতি দেন, চিঠিপত্র প্রকাশ করিবার অনুমতি দয়া করিয়া দিবেন আমার শেষ চিঠি ১৫ই ডাকে দিয়াছি।

—সুভাষ

রাজকোট

অবশ্যই চিঠিপত্র প্রকাশ করিবে, তাহাতে বিবৃতি দান প্রয়োজন হইবে না। ভালোবাসা।

—বাপু

রাজকোট
১৯শে এপ্রিল ১৯৩৯

[টেলিগ্রাম]

২৪শে যাত্রা ঠিক। ২৭শে সকালে কলিকাতা পৌঁছিতেছি। সোদপুরে থাকিতে পারি। হেমপ্রভা দেবীর বরাবরকার ইচ্ছা। চিকিৎসার দিক হইতে ডাক্তার রায়ের আর একটি প্রস্তাব ছিল। গতকাল হইতে জ্বরে শয্যাশায়ী এবং জ্বর বাড়িতেছে। যাত্রার পূর্বে ইহা আয়ত্তে আসিবে আশা করি। তোমার চিঠিগুলিতে অনেক প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহের পরিবেশে এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদের মধ্যে পন্থ প্রস্তাব পালন করিতে নিজেকে অসহায় বোধ করিতেছি। আমি এখনও আশা করি সাহসের সহিত তুমি কমিটি গঠন করিবে। তুমি যে মত পোষণ কর তাহাতে অন্য কিছুতে তোমার প্রতি অবিচার হইবে। ভালোবাসা।

—বাপু

জিয়ালগোরা

[টেলিগ্রাম]

আপনি ২৭শে কলিকাতায় আসিতেছেন জানিয়া অত্যন্ত খুশী। আপনার যেখানে ইচ্ছা থাকিবেন, কোনই আপত্তি নাই। আপনার ব্যক্তিগত আরাম এবং সাধারণের সুবিধার জন্য শহরের প্রান্তে নদীতীরে কোন বাগানবাড়ীতে আপনি থাকুন, আমার ইচ্ছা। যাহাই হোক সতীশবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতা হইতে আবার আপনাকে টেলিগ্রাম করিব। জওহরলালজী গতকাল এখানে আসিয়াছিলেন। আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি, কলিকাতার নিকটবর্তী এমন কোন স্থানে একদিনের জন্য আপনি যাত্রভঙ্গ করুন যেখানে ব্যক্তিগত আলাপের জন্য দুজনে আপনার সহিত

দেখা করিতে পারি। ইহা যদি অনুমোদন করেন এবং আপনি কোন পথে আসিবেন জানান, সুবিধাজনক মধ্যবর্তী কোন স্টেশনে আপনার থাকিবার ব্যবস্থা করিব। ২১শে কলিকাতা যাত্রা করিতেছি।

—সুভাষ

আপনার জ্বরের জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শীঘ্র নিরাময় প্রার্থনা করি। জওহরলালজী এবং আমি ঐকান্তিক আশা করি আমাদের বৈঠকে সুফল ফলিবে এবং সাধারণ স্বার্থে সকল কংগ্রেস কর্মীর সহযোগিতা সম্ভব করিবে। কলিকাতায় শীঘ্রই আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে বলিয়া উভয়েই মনে করি বৈঠকের পূর্বে পত্রালাপ প্রকাশ করা অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত। প্রণাম।

—সুভাষ

পোঃ জিয়ালগোরা
জেলা মানভূম, বিহার
২০শে এপ্রিল, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

আজ আপনাকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করেছি :

মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট। আপনার জ্বরের জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শীঘ্রই নিরাময় প্রার্থনা করি। জওহরলালজী এবং আমি ঐকান্তিক আশা করি আমাদের বৈঠকে সুফল ফলিবে এবং সাধারণ স্বার্থে সকল কংগ্রেস কর্মীর সহযোগিতা সম্ভব করিবে। কলিকাতায় শীঘ্রই আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে বলিয়া উভয়েই মনে করি বৈঠকের পূর্বে পত্রালাপ প্রকাশ করা অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয়। প্রণাম।

গত তিন সপ্তাহ ধরে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ-পত্রালাপ হয়েছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত এই পত্রালাপ থেকে প্রত্যক্ষ কোন ফল লাভ হয়নি। তা সত্ত্বেও ভিন্নভাবে হয়তো এ ফল-প্রসূ হয়েছে, আমাদের ধারণাগুলিকে পরিচ্ছন্ন করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু আপাতত এখনকার প্রশ্নটির মীমাংসা করা দরকার, কারণ আমাদের এখন ওয়ার্কিং কমিটি আর না হলেই নয়। দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে কংগ্রেস কর্মীদের পক্ষে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলে মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিনে দিনে কিভাবে অবনতি ঘটেছে তা আপনার সম্পূর্ণ জানা আছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় যে সংশোধনী বিলটি রয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাদেশিক সরকারগুলির যতটুকু ক্ষমতা আছে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার তা কেড়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে আমরা যে অভূতপূর্ব এক সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছি তা সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট। আমরা এই অবস্থার সঙ্গে একমাত্র তখনই যুঝতে পারব বলে আশা করতে পারি যদি আমরা নিজেদের মধ্যে যা কিছু মতান্তর সব কিছু এখনই ভুলে গিয়ে একতা ও নিয়মনিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করি। একমাত্র আপনি যদি এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তবেই তা সম্ভব হবে। যদি তা করেন, আপনি দেখতে পাবেন আমরা সকলে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং আপনার নির্দেশমত চলতে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি। আপনি আরও দেখবেন, দুর্নীতি নির্মূল করার এবং হিংসার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনের দিক থেকে, আমাদের মতের মিল রয়েছে, যদিও আজ কতখানি দুর্নীতি রয়েছে অথবা হিংসার মনোভাবের মাত্রা কতটা সে সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে। কার্যক্রমের বিষয়ে, তা স্থির করার ভার কংগ্রেসের বা এ.আই.সি.সি'র—যদিও এই সংস্থাদুটির কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা উপস্থাপিত করবার অধিকার নিঃসন্দেহে আছে। কার্যক্রম সম্পর্কে আমার মনে

হচ্ছে, যে সঙ্কট আমাদের উপর শীঘ্রই এসে পড়ছে মুখ্যত তাই তা নির্ধারণ করবে এবং এর পরে এই বাবদে যথার্থ কোন বিরোধের অবকাশ থাকবে না।

এ.আই.সি.সি মিটিংয়ের আগে কলকাতায় বা কলকাতার আশে-পাশে কোথাও আমাদের মধ্যে যে বৈঠক স্থির আছে আমি সাগ্রহে ও অত্যন্ত আশার সঙ্গে তার প্রতীক্ষা করছি। অন্যান্য প্রদেশেও যেমন বাংলাদেশেও তেমনই দিনে দিনে এই জনমত গড়ে উঠছে যে, তত্ত্বগত বিভেদ যাই থাক না কেন এবং অতীতে যতই ভুল বোঝাবুঝি বা মতবিরোধ হোক না কেন ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যা পারস্পরিক মতৈক্য দ্বারা সমাধান করা আবশ্যক। পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব আপনার এবং আপনি যখন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, আপনি দেখতে পাবেন আমরা আমাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করছি।

জওহর গতকাল এখানে এসেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমি দেখে খুশী হলাম যে আমাদের মধ্যে মতের মিল আছে।

আমাদের মতে কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় এমন কোন স্থানে একদিনের জন্য যাত্রা ভঙ্গ করে নিরিবিলিতে আলোচনা করলে ভালো হয়। আপনি যদি নাগপুর হয়ে আসেন তাহলে মেদিনীপুর (খড়গপুর) হবে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। আপনি যদি চেওকি হয়ে আসেন তাহলে বর্ধমানের কাছাকাছি জায়গার কথা আমাদের ভাবতে হবে। এই বিষয়ে আমি আপনাকে একটি টেলিগ্রাম করেছি এবং আপনার জবাবের জন্য অপেক্ষা করছি। যদি তা না হয়, কলকাতায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে। আমি জওহরকে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে বলেছি এবং তিনি তাতে রাজী আছেন।

আপনার জ্বর সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি। প্রার্থনা করছি যাতে তা শীঘ্র দূর হয়।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন। আপনার স্নেহাস্পদ

—সুভাষ

কলিকাতা
২২শে এপ্রিল ১৯৩৯

[টেলিগ্রাম]

সতীশবাবুর সহিত আলোচনা করিয়াছি। সেখানকার নিরিবিলি পরিবেশে আপনার থাকা অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব পথে যাত্রাভঙ্গ অনাবশ্যক। সংবাদপত্রে জানিতেছি আপনি দিল্লী হইয়া আসিতেছেন কিন্তু আপনার টেলিগ্রামে জানিয়াছিলাম নাগপুর হইয়া। কোন পথে, টেলিগ্রামে দয়া করিয়া জানাইবেন।

—সুভাষ

উল্লিখিত পত্রালাপ এবং নিম্নস্থ শেষ টেলিগ্রাম বিনিময়েব মধ্যবর্তী সময়ে নিখিল ভাবত কংগ্রেস কমিটিব সভা কলিকাতায় নির্দিষ্ট তারিখে বসে। সেই সভায় নেতাজী তাঁব পদত্যাগপত্র দাখিল কবেন। এ.আই.সি.সি-তে প্রদত্ত তাঁর মূল বিবৃতিটি পবে দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা ৫ই মে, ১৯৩৯

আমাদের পত্রালাপ প্রকাশ করিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া মতামত জানাইবেন।—

—সুভাষ

বৃন্দাবন (চম্পারণ) ৬ই মে ১৯৩৯

পত্রালাপ প্রকাশ কর। ভালোবাসা।

—বাপু

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থেকে পদত্যাগের বিবৃতি

১৯৩৯-এর মে মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে প্রদত্ত বিবৃতি।

বন্ধুগণ,

নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে ত্রিপুরি কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আপনারা তা অবগত আছেন। সেই প্রস্তাবটি ছিল এইরকম :

"প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী লইয়া বাদ-প্রতিবাদের দরুন কংগ্রেসে এবং দেশের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়।

"বিগত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মৌলিক নীতি কংগ্রেসের কার্যক্রম পরিচালিত করিয়াছে কংগ্রেস তাহার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুনিশ্চিত অভিমত পোষণ করিতেছে যে, এইসব মূলনীতি হইতে সরিয়া যাওয়া কখনই উচিত হইবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম তাহা দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কংগ্রেস গত বৎসর যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্যরত ছিল তাহার কাজে আস্থা প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হইয়া থাকিলে দুঃখিত।

"আগামী বৎসর যে সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং এইরূপ সঙ্কটে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই দেশকে ও কংগ্রেসকে জয়লাভের পথে চালিত করিতে পারেন ইহাও স্মরণে রাখিয়া কংগ্রেস আবশ্যিক বলিয়া মনে করে যে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক অঙ্গ তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হওয়া দরকার এবং

প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে, তিনি যেন গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করেন।"

আমি খুবই দুঃখিত যে ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর থেকে নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম আমি ঘোষণা করতে পারিনি। কিন্তু যে অবস্থার দরুন পারিনি তা আমার আয়ত্তাধীন ছিল না। আমার অসুস্থতার দরুন আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি। তার বদলে তাঁর সঙ্গে চিঠিতে কথাবার্তা চালাতে শুরু করি। তার ফলে আমাদের নিজেদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিচ্ছন্ন হয় বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন মীমাংসা হয় না। যখন আমি বুঝলাম যে চিঠিপত্রে কিছুই ফল হয়নি আমি তখন দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

মহাত্মাজীর কলকাতায় আসার পর আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাতে কোন সমাধানে পৌঁছনো যায়নি। মহাত্মাজী আমাকে উপদেশ দেন, আগেকার ওয়ার্কিং কমিটি থেকে যে সদস্যরা পদত্যাগ করেছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে নিজে যেন, একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি। কয়েকটি কারণে আমি এই উপদেশ মানতে পারি না। তার মধ্যে দুটি প্রধান কারণ, এইভাবে কাজ করলে পন্থ প্রস্তাবে যে নির্দেশ দেওয়া আছে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। পন্থ প্রস্তাবে বলা আছে গান্ধীজীর ইচ্ছানুক্রমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটিকে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হতে হবে। এ ছাড়াও ভারতে ও ভারতের বাইরে আমাদের সামনে যে সঙ্কট আসছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের একটি মিশ্র কেবিনেট থাকা দরকার, যে কেবিনেট যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কংগ্রেসকর্মীর আস্থাভাজন হবে এবং যাতে কংগ্রেসকর্মীদের সাধারণ সংস্থার গঠন প্রতিফলিত হবে।

যেহেতু মহাত্মাজীর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি আমি শুধু এই অনুরোধই করেছি, ত্রিপুরি কংগ্রেস তাঁর উপর যে দায়িত্বভার দিয়েছে তিনি তা গ্রহণ করে ওয়ার্কিং কমিটি

গঠন করুন। এবং তাকে আমি বলি তিনি যে কমিটিই নিয়োগ করুন না কেন, তা মেনে নিতে আমি বাধ্য থাকব, কারণ পন্থজীর প্রস্তাব কার্যকর করাই ছিল আমার সংকল্প।

আমাদের দুর্ভাগ্য, মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করতে অক্ষম বোধ করেছেন।

শেষ ব্যবস্থা হিসেবে, উল্লিখিত সমস্যার যাতে একটা ঘরোয়া সমাধানে আসা যায় সেইজন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। মহাত্মাজী আমাকে বলেন আগেকার ওয়ার্কিং কমিটির প্রধান প্রধান সদস্যদের সঙ্গে আমি একসঙ্গে বসে যেন আলোচনা করে দেখি একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় কিনা। আমি রাজী হই এবং আমরা সেইমত প্রয়াসও করি। আমরা যদি একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারতাম তাহলে আমাদের ঘরোয়া মীমাংসাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেবার জন্যে এ.আই.সি.সি'র কাছে হাজির হতাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ, যদিও আমরা বিষয়টি আলোচনার জন্যে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি, আমরা কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারিনি। অতএব গভীর অনুতাপের সঙ্গে আপনাদের কাছে আমাকে নিবেদন করতে হচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম আমি ঘোষণা করতে পারলাম না।

এ.আই.সি.সি'র সামনে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানে আমি কি করে সাহায্য করতে পারি সেই কথা আমি গভীর-ভাবে ভাবছি। আমার মনে হচ্ছে তার যাত্রাপথের এই সন্ধিস্থলে প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আমার উপস্থিতি সম্ভবতঃ বাধাস্বরূপ হতে পারে—যেমন, এ.আই.সি.সি. এমন একটি ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করতে পারে যেখানে আমি বেমানান হব। আমি আরও মনে করি, এ.আই.সি.সি. যদি একজন নতুন প্রেসিডেণ্ট পায় তাহলে তার পক্ষে ব্যাপারটি মীমাংসা করা সম্ভবতঃ আরও সহজ হবে। অতএব গভীরভাবে বিচার-বিবেচনার পর এবং সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমি আপনাদের কাছে আমার পদত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি।

আমার হাতে সময় অত্যন্ত অল্প থাকাতে আমি খুব ছোট একটি বিবৃতি প্রস্তুত করতে পেরেছি। তা সত্ত্বেও আশা করি এই ছোট বিবৃতিটিই এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা বিশদভাবে বোঝাতে সহায়তা করবে। বন্ধুগণ, এবারে আমি এই সভার কার্যক্রম পরিচালনের জন্যে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে আপনাদের অনুরোধ করছি।

নেতাজীর পদত্যাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী

অসম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে থেকেও তুমি আত্মমর্যাদা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছ। তোমার নেতৃত্বকে আমি অভিনন্দন জানাই, তাতে আমার আস্থা বাড়ল। ত্রুটিহীন এই শালীনতা বাংলাকে তার নিজস্ব আত্মসম্মানের জন্যেই বজায় রাখতে হবে এবং এই উপায়েই তোমার আপাত পরাজয় থেকে স্থায়ী জয়ের সূচনা দেখা দেবে।

প্রথম খণ্ড শেষ